আর্থিক জগৎ

১৩৫৫ — শারদীয়া সংখ্যা

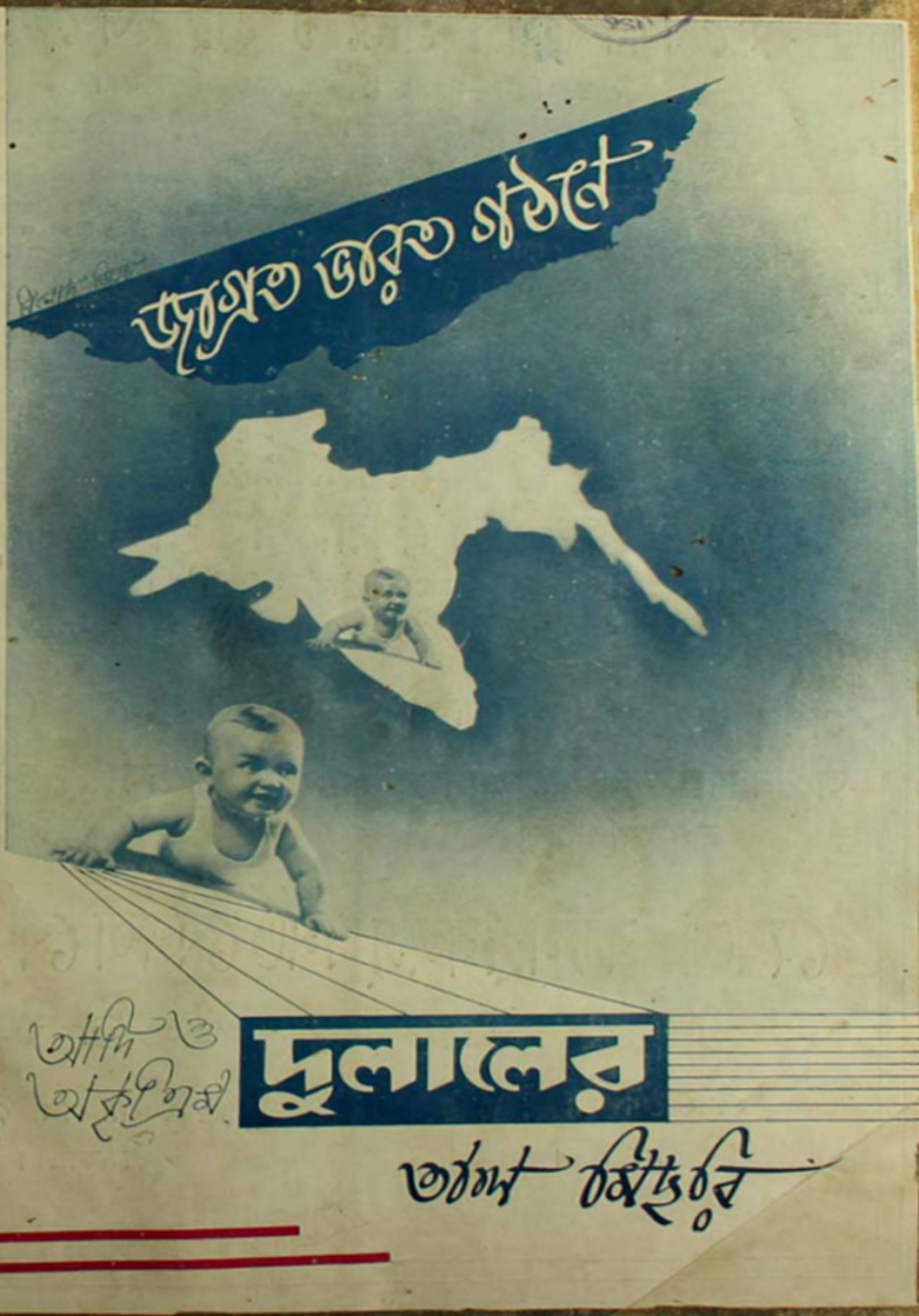

আমাদের পলিসি-হোল্ডারগণকে বিশেষভাবে জানান যাইতেছে যে, অন্যূন দুই বৎসর যাবৎ চাঁদা অনাদায়ে যাঁহাদের পলিসি বাতিল হইয়া গিয়াছে তাঁহারা আমাদের "বাতিল পলিসি পুনরুদ্ধারের বিশেষ সর্ত্ত" অনুযায়ী কিঞ্চিদধিক এক কিস্তির চাঁদা প্রদান করিয়াই তাঁহাদের বাতিল পলিসি পুনর্জীবিত করিতে পারেন।

দি সেন্ট্রাল এশিয়া প্রভিডেণ্ট ইনস্যুরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস—২৫, সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

শ্রীসুশীলকুমার দে
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

শ্রীসুরেশচন্দ্র মিত্র
জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী এইচ, চক্রবর্ত্তী, বি-এ
সেক্রেটারী

আপনি আমাদের কো-অপারেটিভ ইনভেষ্টমেণ্ট ডিপোজিট স্কিমে খাটাইয়া মাসিক ২৩০৲ টাকা ও তদূর্দ্ধ উপায় করিতে পারেন।

আমরা বিভিন্ন চা কোম্পানি, কোলিয়ারি, কটন মিল কেমিক্যালস্ ও সর্ব্বপ্রকার বাজার চলতি শেয়ার উপযুক্ত মূল্যে ক্রয়বিক্রয় করিয়া থাকি।

আপনি আমাদের কো-অপারেটিভ ইনভেষ্টমেণ্ট ডিপোজিট স্কিমে ১০০৲ একশত বা তদূর্দ্ধে টাকা জমা রাখিয়া প্রতি বৎসরে নিম্নলিখিত হারে সুদ পাইতে পারেন।

১ বৎসরের জন্য	৫%
২ ,, ,,	৬%
৩ ,, ,,	৭%
৪ ,, ,,	৭½%
৫ বৎসরের জন্য	৮%
৬ ,, ,,	৮½%
৭ ,, ,,	৯%
৮ ,, ,,	৯½%
১০ ,, ,,	১০%

হিন্দুস্থান ষ্টক এণ্ড শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট

২৫নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

স্বাধীন ভারতে 'দেশশ্রী' আপনাদের পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করে

দেশশ্রী কটন মিলস্

—লিমিটেড—

২৫নং সোয়ালো লেন,
কলিকাতা।

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক।

দি নিউ বেঙ্গল কেমিক্যাল

ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

২৫নং সোয়ালো লেন,
কলিকাতা।

পূজার প্রীতি সম্ভাষণ

এই উৎসবের দিনে আমরা
আপনাদের সুখ ও সমৃদ্ধি
কামনা করি।

ই,আই • বি,এন

কলিকাতা রেলওয়েসমূহের পাব্লিক রিলেসন্‌স্ অফিসার কর্তৃক প্রচারিত

বাইণ্ডারের শিল্প নৈপুণ্য

"জীবন্ত মানুষ বাদ দিলে পুস্তকের মত আশ্চর্যজনক জিনিষ আর কিছু নাই।—মৃত ব্যক্তিদের, যাঁহাদিগকে আমরা কোন দিন দেখি নাই—যাঁহারা আমাদের নিকট হইতে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থান করিতেন—পুস্তকেই তাঁহাদের বাণী। অথচ এই সব পুস্তক যাহা কাগজের কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পৃষ্ঠা মাত্র—তাহা আমাদের সঙ্গে কথা বলে, উদ্দীপনা দেয়, সতর্ক করে, শিক্ষা দেয়, সান্ত্বনা দেয় এবং মৃত ব্যক্তিদের মন আমাদের কাছে ভ্রাতার ন্যায় উদ্ঘাটিত করে।"

চার্লস কিংসলী

কিন্তু "কাগজের এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পৃষ্ঠাগুলি" নশ্বর জিনিষ। যদিও আদর্শ অবিনাশী, পুস্তক মরণশীল কালের ঝটিতি পড়তির অধীন। বাইণ্ডারের শিল্প নৈপুণ্যই উৎকৃষ্ট পুস্তকগুলিকে আমাদের কাছে সংরক্ষিত করে।

বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

৬১।১, মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। ভূমিকার ভূমিকাংশ	১
২। পশ্চিমবঙ্গে ভূমি শিল্পের সম্ভাবনা—ডিরেক্টরেটের নোট, এম-এ	২
৩। স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালি ও বাংলার সাহিত্য —মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী, এম-এ, এম-এল-এ	৮
৪। কবিতা ও কবিতা—শ্রীযোগেশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, বি-এল	৯
৫। ভারতীয় মুদ্রাস্ফীতির বাস্তব পরিস্থিতি —অধ্যাপক শ্রীভবানীমুখার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ	১৩
৬। শিল্প ও চাষী—অধ্যাপক শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ	১৭
৭। বন্ধ কলের বন্দরঃ—খোসাল চৌধিক	২৮
৮। জলাধারের উপর ও আলোকের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা —শ্রীসুবোধচন্দ্র দত্ত	৩২
৯। পশ্চিমবঙ্গ-আন্তি-পুরে বাঙালির স্থান —অধ্যাপক শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র পাল, এম-এ	৩৪
১০। মৃত্তিকার বিজ্ঞান—প্রভাতকুমার খোপাধী	৩৮
১১। ভারতের চলতি বিদেশ ভবনের সম্ভাবনা —শ্রীঅমৃতলাল ভট্টাচার্য, এম-এ	৩৯
১২। জীবন-বীমা ও বন-সংযোগ—শ্রীসচিদানন্দ চট্টোপাধ্যায়	৩৭
১৩। বাজারের ইতিবৃত্তন—শ্রীবৈদ্যনাথ বসু	৪৯
১৪। মোজিয়েট কৃষি ও বিজ্ঞান—শ্রীনারায়ণচন্দ্র দাস, এম-এস-সি	৫৩
১৫। পূর্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গ—সুকুমার মিত্র	৪১
১৬। আর্থিক জগতের চালা-নজর—অধ্যাপক প্রবোধনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৪
১৭। ব্যবসায় পরিচালনা—অরুণ বসু	৪৮
১৮। পরিবার-সমাজ আলো ও রঙ—নারায়ণ চৌধুরী	৫১
১৯। আমেরিকার নব-নারী বিবাহের পরিবর্তনা শ্রীবিমলেন্দু খোসাল, এম-এ	৫৫
২০। শিল্প ও বিজ্ঞান—শ্রীঅনিল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এস, সি	৬১
২১। উদয়ন্ত বিবাহের পরিবর্তনা—শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধী	৬৪
২২। মোজিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন—বিমল নন্দী	৬৬
২৩। ছুটির ছবি—শ্রীবিমল মুক্ত বসু	৬৯

ঘোষণা

পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলে

৩নং ঢাকেশ্বরী কটন মিলস

স্থাপিত হইতেছে। ইহার মাধ্যমে ঐ অঞ্চলের নিবাসীদের ... বিনিয়োগ করিবার সুযোগ দেওয়া হইতেছে। ইহা আসানসোল নগরীর উপকণ্ঠে এবং ... বি এন রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটবর্তী।

মিলের বাড়ীঘর—নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে। ... আশা করা যায় যে, ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যেই কাজ শেষ হইবে আশা করা যায়। এজন্য কারখানা সংলগ্ন কোয়ার্টারসহ প্রয়োজনীয় সমস্ত ইমারত ও বিল্ডিং তৈরীর ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কলকব্জা—কলকব্জা আমেরিকা হইতে আমদানী করা হইয়াছে। ... ইহাতে ৪০ হাজার স্পিন্ডল থাকিবে এবং ... ১৫ হাজার স্পিন্ডল বসান হইয়াছে। আগামী ১৯৫৯ সালের মধ্যে ইহাতে এই সব স্পিন্ডল বসাইয়া মিলের কাজ পূর্ণোদ্যমে চালু করা হইবে। আধুনিকতম ... ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্তমানে মিলের জন্য যে পাওয়ার সিস্টেম ... হইতেছে তাহাতে ১৫ হাজার কিলো ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যাইবে এবং ভবিষ্যতে ... আরও ১৫ হাজার কিলো ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মিলে একটী ডিজেল ... বসান হইয়াছে। মিলে একটী ডিজেল ... বিদ্যুৎ এবং ... বিকল্প ব্যবস্থা থাকিবে এবং ইহাতে কেবল মিহি সুতা ও শাড়ীই তৈরী হইবে—ইহাতে মিহি ... প্রস্তুত হইবে।

দি ঢাকেশ্বরী কটন মিলস লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :—
১৪৮, সিনক্লেন ... কলিকাতা ১৩

শ্রীসূর্যকুমার বসু
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ম্যানেজিং এজেন্টস্

ডিলার :
১৮৫ বালুরঘাট
১৮৭ খোসবাইল

জে, দত্ত এণ্ড সন্স লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ—৪

বয়স্ক শ্রেষ্ঠ জহুরীর পরিচালনায় উত্তর কলিকাতার প্রাচীনতম ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

অনুমোদিত মূলধন ৫,০০,০০০৲ (পাঁচলক্ষ টাকা)
বিক্রয়ার্থ মূলধন ৫,০০,০০০৲ ঐ

প্রত্যেকটি ১০০৲ টাকা করিয়া ৪,৫০০৲ অর্ডিনারী 'এ' ক্লাস শেয়ার
প্রত্যেকটি ১২৷৷০ টাকা করিয়া ৪,০০০৲ অর্ডিনারী 'বি' ক্লাস ঐ

পৃষ্ঠপোষকবর্গ ও ডিরেক্টারগণ

শ্রীহরিসাধন পাল—কে, ই—ডিরেক্টার—বি, কে, পাল কোং লিঃ
শ্রীবিজয় কুমার মুখার্জি—বারেন্টর, অভিনব ও খ্যাতনামা আইন ব্যবসায়ী, রাজ্যসভা মিউনিসিপ্যালিটি।
শ্রীশান্তিরোধ বোস—অভিনব ও ইঞ্জিনিয়র।
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মুখার্জি—এডভোকেট, কলিকাতার খ্যাতনামা মেয়র ও নামকরা সম্পাদক, বঙ্গীয় প্রাদেশিক "হিন্দু মহাসভা"
শ্রীসোরীন্দ্র চ্যাটার্জি—বি, এল-সি, ডিরেক্টার—বঙ্গল চ্যাটার্জি কোং লিমিটেড (ইঞ্জিনিয়র)।
শ্রীবরীন্দ্রনাথ বসু—বারেন্টর, জুরেলার্স ও (এজ-অফিসিও) এপ্রেসার।
শ্রীবরিসাধন বোস—ইঞ্জিনিয়র, ডিরেক্টার—বেঙ্গলমল্ল ধোবী ঘাট এণ্ড লোয়াইন্স লিঃ।
শ্রীবিপেন্দ্রনাথ বসু—বারেন্টর, জুরেলার্স, ডিরেক্টার ও ট্রেজারার—দি বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স অফিসিটী কোঃ অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ (এজ-অফিসিও)।

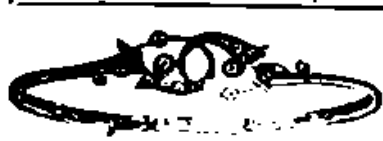

সলিসিটর :—মেসার্স বসু এণ্ড মজুমদার, ১১, ওল্ড কোর্ট অফিস ষ্ট্রীট।
ব্যাঙ্কারস :—দি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ। দি নেশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ।
অডিটরস :—এন, চৌধুরী এণ্ড কোং, ৪, ক্লেভিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ম্যানেজিং এজেন্টস :—মেসার্স ওটুস এজেন্সি, ১০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৪

শেয়ারের জন্য কোম্পানীর নিকট সরাসরি আবেদন করুন। এজেন্ট আবশ্যক।

বিজ্ঞাপন সূচী

কোম্পানীর নাম	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
অন্নপূর্ণার মালা	৫৪
আলায় ফিল্মস লিঃ	৪৮
আলায় ফেডল ফোমার মিলস্ লিঃ	৩৪
আজতোষ ধী এণ্ড কোং	সূচী ।৹
ইউনাইটেড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ	৪৭
ইন্দ্রজোন' কার্টেল লিঃ	৬৭
ইণ্ডিয়ান লাইফ এ্যাস্যুরেন্স কোং লিঃ	৭
ইণ্ডিয়ান ষ্টীল কর্পোরেশন কোং লিঃ	৩
ইণ্ডিপিরিয়াল টী	সূচী ৶৹
ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল কোং লিঃ	৪৫
ইষ্ট ইণ্ডিয়া ট্রেডিং কর্পোরেশন	৭৩
এ মুখার্জী এণ্ড কোং	৯
এম এল দাস পঞ্জাবিমিল এণ্ড কোং লিঃ	৫৩
এম বি সরকার এণ্ড সন্স	৬৯
এসিয়াটিক সোপস এণ্ড বোর্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ	৬০
কমলালয় লিঃ	৫৫
কামলাটা ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ	৫৯
কামলাটা মেডিক্যাল	সূচী ৵৹
কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ	৬৩
কুমিল্লা ম্যাচিং কর্পোরেশন লিঃ	৫৩
খোশাল সোপ ওয়ার্কস	৬৩
খোশীলাল দাস এণ্ড কোং	৫৭
খোড়বিহারী সোমানী	৬৮
গুপ্ত এণ্ড গুপ্ত লিঃ	৬৩
চিত্তরীব ঔষধালয়	৭
ছায়া ও কায়া লিঃ	এক কপাল
জি ডি এণ্ড কোং	৪

স্বাধীনতার স্বপ্ন

আমরা বহুদিন ধরে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে এসেছি। এর বহুদিন পূর্ণ হয়ে গেছে স্বাধীন স্বাধীনতাও পেয়েছি কিন্তু তাহলেই কি আমাদের সব পাওয়া ও চাওয়ার জীবালো হয়ে গেছে? দেশ স্বাধীন হলে দেশ-মাতৃকার আর বন্ধ, দুঃখদারিদ্র্য আর থাকে না এই কথাই আমরা জানি কিন্তু এই ধারণাটা যেমন ভুল হ'লো, তা। কতিপয় দুঃখদারিদ্র্য-এর দুরবস্থা, অপরদিকে দেশ স্বাধীন এমন অবস্থায় করেছে যে সব জিনিষ আজ ক্রেতাদেরকাছের কালো হয়ে বিক্রী হচ্ছে ফলে সাধারণের পক্ষে আজ দুঃখ, আর দেশবাসীর কঠিন হয়ে পড়েছে। সরকারের কাছে আমরা এ কথা জানাচ্ছি যে, সমস্ত পরিবেশনের দায়িত্ব আমরা নিচ্ছি তাঁরা শুধু জিনিষের আর দিন। আমাদের বিভিন্ন কারখানায় যে সমস্ত তৈরী হচ্ছে আজে দেশের চাহিদার অধিকাংশ আমরা মেটাতে পারি।

বিজ্ঞাপিতের জন্য লিখুন—

কারখানা — কেমিক্যাল কারখানা — ফার্মেসী
সৌনপুর। (বিহার) হুগলী। (পশ্চিম) ভক্তলাই চিরা (উড়িষ্যা)

ন্যাশনাল কেমিক্যাল

এণ্ড

সল্ট ওয়ার্কস (ইণ্ডিয়া) লিঃ

হেড, অফিস ঃ এম ফার্মাসিউটিক্যাল বিল্ডিং, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা

ইম্পিরিয়াল চা

৪, রাজা উডমণ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

MARK OF QUALITY

স্পিরিট ষ্টোভ
প্রেসার ষ্টোভ
কেরোসিন বার্নার ও কল
ক্যান ওপনার
—সিমুইড সোপ কন্টেনার—
—প্রস্তুতকারক—

শিল্পপীঠ লিমিটেড

আলমবাজার, কলিকাতা
ফোন বি, বি, ৩৮১১

কোম্পানীর নাম	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
কে এন কে	৫২
কে বসু এণ্ড সন্স লিঃ	সূচী ৶৹
কুমারেশ ব্যাল বিস্কিট	১৮ অক্ষর
চাকেশ্বরী ক্টীল বিল্ডিং লিঃ	সূচী ৶৹
চি এন সেন হোমিওপাথী ল্যাবরেটরী	৫৪
চাটার্ড অয়েল এণ্ড ফীড কোং লিঃ	৫৩
চিনি ইণ্ডিয়া এক্সপ্লোসিভস্ কোং লিঃ	৩৮
চিনি ইণ্ডিয়া সোপ এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস	১৬
জামসাদ ইণ্ডিয়ান লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ	৫১
জামসাদ কেমিক্যাল এণ্ড ড্রাগ (ইণ্ডিয়া) লিঃ	সূচী ৶৹
জামসাদ ডিস্টিলারস লিঃ	৫৮
ন্যাশনাল পাওয়ার ইণ্ডাষ্ট্রী ষ্টীল ফার্নিচার	৭৯
পি কে সেন এণ্ড সন্স	সূচী ।৹
পি পি ব্রুস	৭৯
পিজন ব্রুস লাইট কর্পোরেশন লিঃ	৩৯
প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ	৬৮
বিসি কী এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কেমিক্যালস লিঃ	৪৯
ভিক্টোরিয়া ইলেকট্রিক কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ	১৫
বঙ্গলক্ষী ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ	৫১
বাসন্তী ব্যাটারিং ওয়ার্কস	সূচী ।৹
বাসিক ভিটামিন ফার্মাসী এণ্ড কিনিং কেমিক্যাল লিঃ	৪৭
বি সি বসু এণ্ড ব্রাদার্স লিঃ	৩৪
ব্রিটানিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ	৭১

কোম্পানীর নাম	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
বিদ্যাসাগর ক্টীল বিল্ডিং লিঃ	৫৫
বেঙ্গল এনিম্ল এণ্ড কেমিক্যাল ম্যানুঃ কোং	৯
বেঙ্গল কার্বোরেণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ এণ্ড ফিনান্স লিঃ	১৯
বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ	৫১
বোম্বাই বেলার ষ্টীল	৬১
ভারতলক্ষ্মী ষ্টার্চ (ইণ্ডিয়া) লিঃ	১১
মণীন্দ্র ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ	৭৮
মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ	৪৬
যশোহর-খুলনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ	৬৬
রসুলাব বয় এণ্ড সন্স লিঃ	১২
লিলি বিস্কুট কোং লিঃ	১৫ অক্ষর
লক্ষ্মীবিলাস ইন্সিওরেন্স লিঃ	১৬
লাবার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ	৭৬
লিটারেচর অব ইণ্ডিয়া সিমিটুয়াল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ	৬৮
লিবিয়া টীন কেমিক্যালস কোং লিঃ	৫১
শুভেচ্ছা ঘাণী	৩৮
শুভম বস্ত্র এণ্ড সন্স লিঃ	৯১
সেন্ট্রাল এসিয়া এক্সিকিউটর ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ	১২ অক্ষর
সেন্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ	৬৫
সোমনাথ কেমিক্যাল ওয়ার্কস্	৭৮
সৌমেন্দ্র সিল্ক ক্যাষ্টরী	৬৯
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মা এনক্রেভিং কোং	৭২
হিন্দ ষ্টীল	সূচী ।৹
হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ	১৮
হিন্দুস্থান ষ্টার্চ	৫১
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্	৫৩

= ভারত বিখ্যাত =

পি, কে, সেন এণ্ড সন্সের চালমুগরা প্রডাক্টস্

[illegible] চালমুগরা তৈল, সাবান ও ঔষধ [illegible] সর্বত্র সমাদৃত হইয়াছে। [illegible] এবং [illegible] ব্যবহার করিতেছেন।

● চালমুগরা তৈল—দক্ষ [illegible] চর্ম রোগের [illegible] ইহা [illegible] ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

● চালমুগরা সাবান—ইহা [illegible] ব্যবহারে [illegible] ও ঘর্ম [illegible] ও [illegible] ইহা [illegible] ও [illegible] ও [illegible] করে।

● চালমুগরা মলম—একটি [illegible] ইহা সর্ব-প্রকার [illegible] এবং [illegible] ও সর্বপ্রকারের [illegible] সম্পূর্ণ নিরাময় করিতে সাহায্য করে।

• • •

ইহা ছাড়া বিমলা সোপ, ক্রীম সোপ, এন্টিসেপটিক কার্বলিক সোপ, ব্লাক সোপ, মল সোপ এবং সৌরভ। ব্রাহ্মী অয়েল, মহাভৃঙ্গরাজ তৈল, ভৃঙ্গরাজ এন্টিসেপ্টিক তৈল, আমলা, বিমল তিল প্রভৃতি তৈল ও ঘৃত, ভৃঙ্গরাজ মেন্থল, হেয়ার ডাজল প্রভৃতি বিভিন্ন আকারের বহিত বাজারে চলিতেছে।

পি, কে, সেনের খাঁটি সরিষার তৈল ব্যবহারে তৃপ্ত হইবেন।

পি, কে, সেনস্ ড্রাগ
এণ্ড
কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

১০৪।১, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, কলিকাতা
ও
সদর ঘাট রোড, চট্টগ্রাম। (ই, পি)

বিনা পাসে—
ছেলেদের ব্যবহার বন্দুক
সুন্দর ফিকেল করা
এবং হাল্কা
মূল্য—৪০৲

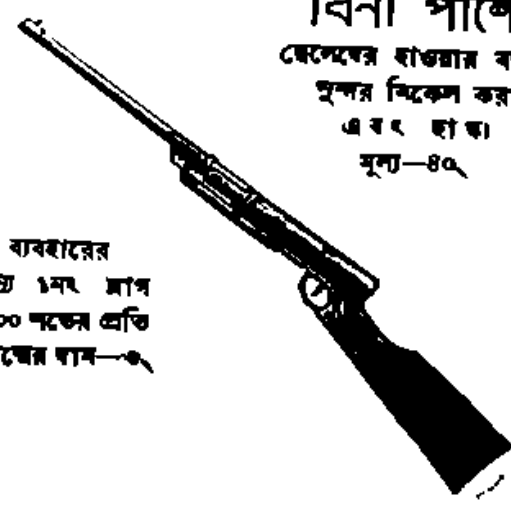

ব্যবহারের
জন্য ১নং ব্রাণ্ড
৫০০ শটের প্রতি
বাক্সের দাম—৩৲

ভারতে প্রথম তৈরারী

আশুতোষ দাঁ এণ্ড কোং

বন্দুক প্রস্তুতকারক ও আমদানীকারক
"দাঁ বিল্ডিং"
১৮৪, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ব্রাঞ্চ : রাণিহাট, কটক (উড়িষ্যা)

তার : "এরমোবাস" কলিকাতা ফোন : কলি ৩৪৫৩

ফোন—৪৬৭৩৫১ ৬০৮২

কার্যালয়—১২১এ বহুবাজার স্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক

সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

১১শ বর্ষ | কলিকাতা, ১লা অক্টোবর, শুক্রবার, ১৯৮৮ | আবশ্যিক মূল্য ১.৫০

দুর্দিনের দুর্গোৎসব

বাংলার নিজস্বরূপে শারদীয়া পূজা উৎসবের শুভলগ্ন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। ধনধান্যে পরিপূর্ণা 'শুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা' বাংলার অতীতে এই উৎসবের দিনে বাঙ্গালীর সানন্দে, বাঙ্গালীর গৃহপ্রাঙ্গণ প্রেম, প্রীতি ও আনন্দের উচ্ছ্বাসে উদ্বেল হইয়া উঠিত। শান্তি, মিলন ও সম্প্রীতির স্বতোৎসারিত ভাবধারায় নগর ও পল্লী প্রাণ-চঞ্চল হইয়া উঠিত। চারিদিকে বিচিত্র পণ্য-সম্ভার কেনাকাটার ধুম পড়িয়া যাইত। শিল্পী, ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের মনের ভাবধারা পূজা মণ্ডপে রূপায়িত হইয়া উঠিত। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক অবনতির সঙ্গে উৎসবের সে স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ উচ্ছ্বাস আজ লোপ পাইতে বসিয়াছে। একটানা অভাব ও দুঃখদারিদ্র্যের ভিতর আজ আর পূজা অর্চনার সমারোহ কোথাও দেখা যাইতেছে না। দেশে কাজ কারবার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ আজ নানাদিক দিয়া অবরুদ্ধ; অর্থাগমের পথ সীমাবদ্ধ। চূড়ান্ত দুঃখ-দারিদ্র্যের গুরুভারে লোকের জীবনধারা নিষ্পিষ্ট, বিপর্যস্ত। বাজারঘাটে উৎসব-মত্ত নবনারী ও শিশুর ভীড় নাই। দোকানে দোকানে কেনাকাটার ধুম নাই। কলিকাতার পূজার বাজার নিষ্প্রভ ও নিষ্প্রাণ। ব্যবসায়ীরাই যখন এই অবস্থা তখন গ্রামের অবস্থা বর্ণনা করিবে কে? ঘরে ঘরে দুর্বার আকাঙ্খা—কোথাও অর্ধাশন, কোথাও বা অনশন। দ্রুতবর্দ্ধিত দুঃখদুর্দশার চাপে নবনারী ও শিশুদের প্রাণশক্তি আজ নিষ্প্রভ। চাউল, কাপড়, তেল, লবণ, চিনি—কোনমতে বাঁচিতে হইলেও যে-কয়টি জিনিষ একেবারে অপরিহার্য্য তাহাদের মূল্য উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। কাজেই পূজা আনিলেও গত দিনের সুখস্মৃতি ছাড়া উহার ভিতর আজ আর কোন প্রাণের সাড়া খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

স্বাধীনতা লাভ করার আশা করা গিয়াছিল জাতীয় সরকারের আমলে দেশে সুপরিকল্পিতভাবে গঠনমূলক কাজ সুরু হইবে। তাহাতে চক্রে চক্রে দেশের লোকের দুঃখ-গ্লানি দূর হওয়ার পথ প্রশস্ত হইবে। কিন্তু জনকল্যাণের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া জাতীয় স্বার্থের নাগপাশ ছিন্ন করিয়া নিজস্ব ভাবে প্রকৃত অগ্রগতির পথে আগুয়ান হইয়া চলিবার আগ্রহ আজও যেন কিছু দেখা যাইতেছে না। নানা সমস্যার চাপে, প্রতিক্রিয়াশীল উপনেশীয় কায়েমীস্বার্থের প্রভাবে জাতীয় সরকার পদে পদে তাঁহাদের আসল লক্ষ্য সম্বন্ধে দিশাহারা হইয়া পড়িতেছেন। বাহিরের শত্রু দূর হইলেও ভিতরে আমাদের শত্রুর অবধি নাই। সমাজদ্রোহী কালোবাজারী ও ঘরশত্রু জীবকাতরের দল দেশের প্রগতি ও অগ্রগতির বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হিংসা, দ্বেষাদ্বেষি, অপচয় ও দুঃখদানের গ্লানি সকল করিয়া উহারা গঠনমূলক কাজের মূলে কুঠারাঘাত করিবার চেষ্টা করিতেছে। ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য উহারা দেশের কল্যাণ ও মনের আত্মবিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছে। জাতীয় উৎকর্ষের পথে ও সর্বজনকল্যাণের পথে আমাদিগকে চলিতে হইলে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও শ্রেণীগত স্বার্থপরতা আমাদিগকে পরিহার করিতে হইবে—বৃহত্তরের স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করিয়া ক্ষুদ্রের স্বার্থবৃদ্ধির সংগ্রাম বন্ধ করিতে হইবে। জনকল্যাণে ও সমাজকল্যাণের প্রয়োজনে সব কিছুর উর্ধ্বে স্থান দিতে হইবে। যে বিরোধী শক্তি আমাদের জাতীয় অগ্রগতির পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অবিলম্বে তাহার মূলোচ্ছেদের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। সেজন্য আমূলতঃ বিপ্লব প্রয়োজন। ইহাকে সফল করিতে কায়েমীস্বার্থের অবৈধ চক্রান্ত ব্যর্থ করিতে হইবে।

সেই শক্তি ও সাহস আজকের শুভ দিনে সকলের চাই। চাই সুবুদ্ধি, চাই সুবিবেচনার আলোকপাত। আর তাহারই ইঙ্গিতে আজিকার দিনে শুধু বাৎসরিক অনুষ্ঠানের পালন সার্থকতা। অনাচার-অবিচার ও অক্ষমতা-অযোগ্যতার দুঃখ বিপ্রহরণের যে অসুর তাহাকে নাশ করিবার জন্য দেবী দশপ্রহরণ হাতে শক্তিরূপিণীরূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। সেই দেবীমূর্তির পূজা অর্চনার ভিতর দিয়া অসুর ও অসুরাকে পরাজিত করিয়া সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা সাধনের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। এই মহাপূজার প্রেরণা আজ মানব সমাজে সত্য, ন্যায় ও সংস্কৃতির প্রসার এবং সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের বিজয় অভিযান কামনা করা হইয়াছে। অভাব অনটন, অবিচার উৎপীড়ন এবং লোভ ও তজ্জনীয় দুষ্কৃতির গ্লানির ভিতর দেশ ও দশের কল্যাণের জন্য মহামায়ার পূজা অর্চনার ভিতর দিয়া সেই জ্ঞান ও শক্তিলাভের সাধনা আজ আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। সেদিক দিয়া আমাদের দেশে শারদীয় দুর্গোৎসবের যে পরম সার্থকতা রহিয়াছে তাহার কথা স্মরিয়া নূতন যুগের মানুষ আমরা আমাদের ঐ প্রাচীন অনুষ্ঠানকে সাগ্রহে বরণ করিয়া লইতেছি।

পশ্চিমবঙ্গে বৃহৎ শিল্পের সম্ভাবনা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ, পশ্চিমবঙ্গের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর।

১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট বহু বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের শিল্পসম্পদ অতি অল্প পরিমাণেই হ্রাস পাইয়াছে। তাহার একটি প্রমাণ এই যে, সমগ্র ভারতে পশ্চিমবঙ্গ অধিক সংখ্যা হিসাবে এখনও শিল্পপ্রধান প্রদেশ বলিয়া গণ্য হইবার গৌরব দাবী করিতে পারে। কিন্তু এই গৌরবের মূল্য কম করিয়াছে অনেকগুলি অর্থ-নৈতিক সমস্যা, যাহা অধিকন্তু বঙ্গের পক্ষে তেমন জটিল ছিল না। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে ৮০০ জনের কম এবং জন-প্রতি কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ পড়ে মাত্র ১ একর। এই জনসংখ্যা ক্রমশঃ পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তুদের আগমনে বৃদ্ধি পাইতেছে। কাজেই এ প্রদেশের খাদ্য প্রয়োজন যে কৃষিদ্বারা মিটিতে পারে না তাহা বলা বাহুল্য। খাদ্য অন্য প্রদেশ হইতে অথবা বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইবে। কিন্তু প্রদেশের লৌহ ও অন্যবিধ অর্থ-নৈতিক প্রয়োজন সাধ্যমত বৃদ্ধি করা না গেলে তাহা হইলে জন-সাধারণের আর্থিক দুর্গতি ক্রমশঃই অবনতির দিকে অগ্রসর হইবে। এই অবনতির পথ রুদ্ধ করিয়া সম্পদবৃদ্ধির প্রকৃষ্টতর উপায় হইল বিবিধ শিল্পের প্রসার। পশ্চিমবঙ্গে যে বহুবিধ শিল্পপ্রসারের সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহাই আমাদের পক্ষে আশার কথা। কিন্তু এই সম্ভাবনাকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে একটি সুচিন্তিত কর্ম-পরিকল্পনার প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আর কোন বিভাগে পশ্চিম বঙ্গ শিল্প প্রয়োজনের দিক দিয়া স্বয়ং সম্পূর্ণতা লাভ করিতে সচেষ্ট হইবে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই; কিন্তু কলিকাতা ও হাওড়া অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া যে বিরাট একটি শিল্প বিস্তৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার জন্যই পশ্চিম বঙ্গে আরও অনেকগুলি শিল্পের সম্ভাবনা রহিয়া গিয়াছে। কলিকাতা একটি আন্তর্জাতিক বন্দর ও বাজার এবং পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চলের প্রয়োজন রহিয়াছে আরও বহুবিধ শিল্পের পণ্য। তাহার উপর পূর্বাঞ্চল, আসাম, কুচবিহার, মণিপুর, ব্রহ্মদেশ ও পূর্বাঞ্চলীয় কয়েকটি রাষ্ট্রের অনেক প্রয়োজন মিটাইবার সুযোগ ও সম্পদ পশ্চিমবঙ্গের আছে। কাজেই পশ্চিমবঙ্গ নিজস্ব প্রতিভা ও উদ্যমের সাহায্যে এই সুযোগ গ্রহণ করিতে যে অগ্রসর হইবে তাহা আশা করা যায়।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

কয়েকটি বৃহৎ শিল্পের সম্ভাবনা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাইতে পারে। লৌহ ও ইস্পাত শিল্প হইল শিল্পোন্নতির ভিত্তি। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে একটি মাত্র ইস্পাতের কারখানা আছে; তাহার উৎপাদন শক্তি তিন লক্ষ টনের কম। কিন্তু এই প্রদেশেরই লৌহ ও ইস্পাতের প্রয়োজন ৭ লক্ষ টনের উপর। যুদ্ধের পর অনেক নূতন নূতন শিল্পের পরিকল্পনা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রহণ করিয়াছে এবং সমগ্র পূর্ব ভারতের ও পূর্ব কেন্দ্রীয় কয়েকটি রাষ্ট্রের প্রয়োজন এই অঞ্চল হইতেই মিটাইতে হইবে। এই সব কারণে পশ্চিমবঙ্গে যে আর একটি সুবৃহৎ ইস্পাতের কারখানার প্রয়োজন আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহার সরকার একটি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, অতি শীঘ্র দশ লক্ষ টনের একটি ইস্পাতের কারখানা ভারতের কোন উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করা হইবে। এই কারখানাটি যাহাতে পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান জেলায় স্থাপিত হয় সেজন্য প্রাদেশিক সরকার বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিয়া একটি ইস্পাতের কারখানা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে এই প্রদেশে কি সুবিধা ও অসুবিধা আছে, অন্য প্রদেশের চেয়ে কোন্ কোন্ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের দাবী অগ্রে গণ্য হওয়া উচিত ইত্যাদি বিষয়ে অনেক তথ্য ও বিবরণী সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং ভারত সরকারের নিকট আমাদের দাবীও পেশ করা হইয়াছে। আসানসোল সহরের নিকটেই দুর্গাপুর অঞ্চল এই শিল্প স্থাপনের পক্ষে সব দিক দিয়া সুবিধাজনক হইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞের মত স্থির করিয়াছেন। এই কারখানা চালাইবার জন্য কয়লা, iron ore, চুনাপাথর, বিদ্যুৎ-শক্তি ও উপযুক্ত পরিমাণে জলের অভাব হইবে না। Iron ore একশত মাইলের ভিতরেই বিহার হইতে পাওয়া যাইবে। দামোদর নদীর পরিকল্পনার জন্য এই অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে জল ও শক্তি পাওয়া যাইবে। ইহা ছাড়াও দুর্গাপুর হইতে পণ্য চলাচলের উপযুক্ত যে একটি খাল ভাগীরথী নদী পর্যন্ত কাটা হইবে তাহার সাহায্যে লৌহ ও ইস্পাত অতি অল্প খরচে শিল্পাঞ্চলে পাঠাইবার সুবিধা হইবে। লৌহ ও ইস্পাত সম্বন্ধে কম খরচে উৎপাদন করিবার এবং বাজারে পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই হইতে পারে। আমাদের পক্ষ হইতে তাহার সরকারের কাছে ইহাই সবচেয়ে বড় যুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

চিনি শিল্প

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে মাত্র দুইটি চিনির কারখানা আছে। বেলঘরিয়ার কারখানাটিতে কয়েক বৎসর হইল কাজ হইতেছে না। আইনঘটিত ও আর্থিক ব্যাপারগুলি কোনরূপে অসুবিধার জন্য এই কারখানা চালু হইবার সম্ভাবনা খুব অল্প। কাজেই রামনগর-স্থিত (পলাশী) চিনির কলটিই একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের চিনি উৎপাদনের কারখানা। এখানে প্রতি বৎসর গড়ে ১০,০০০ টন চিনি হইতে পারে। সেস্থলে পশ্চিমবঙ্গের মানবদ প্রয়োজন ৬৭০০০ টন। আমাদের এই ঘাটতি বিহার ও যুক্তপ্রদেশ হইতে চিনি আমদানী করিয়া মিটাইতে হয়। রাজ্য সরকারের পরিকল্পনানুসারে পঞ্চবার্ষিকে ৩০০০ টন আখ মাড়াইবার উপযুক্ত চিনি কারখানা করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। এই সুযোগে পাঁচটি কারখানা (দৈনিক ৩০০ টন আখ মাড়াইবার উপযুক্ত) স্থাপন করা যাইতে পারে। শিল্পবিভাগ হইতে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে এই সব কারখানা স্থাপনের জন্য আবেদন আহ্বান করা হইয়াছিল। অদূর ভবিষ্যতে পাঁচটি না হইক, অন্ততঃ ২।৩টি কারখানা স্থাপিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কৃষি বিভাগ হইতে জরিপ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উত্তরবঙ্গে এবং বর্ধমান, নদীয়া ও কাটোয়া অঞ্চলে আখ চাষের উপযুক্ত জমি আছে। যদি পাঁচটি চিনির কলও পশ্চিমবঙ্গে স্থাপিত হয় তথাপি চিনি ব্যাপারে এই প্রদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে না; এখনও প্রতি বৎসর ২৫।৩০ হাজার টন চিনি অন্য প্রদেশ হইতে আমদানী করিয়া আমাদের প্রয়োজন মিটাইতে হইবে।

নূতন চিনির কল স্থাপন যে আমাদের সুরাসার শিল্প প্রসারের পক্ষেও সহায়তা করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্তমানে আমাদের শিল্প প্রয়োজনে অধিকাংশে সুরাসারই আমদানী করিতে হয় বিহার ও যুক্তপ্রদেশ হইতে। কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণে যানবাহন না হওয়ায় আমাদের শিল্পাবনতি অনেক ক্ষেত্রে ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে।

লবণ শিল্প

পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র উপকূলের লবণাক্ত জল হইতে অল্পবিস্তর লবণ তৈরী হইতেছিল। কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ (মাত্র ৩০।৪০ হাজার মণ) আমাদের প্রয়োজনের (৩৫ লক্ষ মণ) পক্ষে এত সামান্য যে, লবণের জন্য আমাদের অন্য প্রদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। যুদ্ধকালীন যানবাহনের অসুবিধার জন্য আমরা লবণের কিরূপ অভাব অনুভব করিয়াছি তাহা হয়ত এখনও সকলের মনে আছে। ইহা ইঙ্গিত করে যে, লবণের

আমাদের এই প্রদেশে যথেষ্ট লবণ তৈরী হইত এবং তাহা বিশেষও উন্নতমানী হইত। সেই লবণ সম্পর্কে আজ অবস্থাবৈগুণ্যে আমরা লবণশিল্পকে উজ্জীবিত করিতে পারি নাই। তাহার প্রধান কারণ ছিল বঙ্গদেশের লবণ সম্ভাবনা সম্বন্ধে সরকারী মতামতের বিমুখতা। শিল্পতদন্ত কমিটি (Bengal Industrial Survey Committee) এই বিষয়ে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া পূর্বতন মতামত খণ্ডন করেন এবং এই সুপারিশ করেন যে, বঙ্গদেশের সমুদ্র উপকূলে, বিশেষতঃ কাঁথি অঞ্চলে, লবণশিল্পের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। দুই একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও এই অঞ্চলে কাজ করিয়া সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। এই সুপারিশের উপর নির্ভর করিয়া এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ বিবেচনা করিয়া প্রাদেশিক সরকার বর্তমানে কাঁথি অঞ্চলে ব্যাপকভাবে লবণ শিল্পের প্রসারের জন্য পরিকল্পনা তৈরী করিয়াছেন। তিনটি অঞ্চল বাছিয়া লওয়া হইয়াছে। একটিতে বর্তমানে উৎপাদনরীতি কারখানাগুলি ও সমবায়পদ্ধতিতে ছোট ছোট কারখানায় কাজ করিবে, একটিতে সরকারী ও বেসরকারী মূলধনে পুষ্ট একটি নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া কাজ আরম্ভ করা হইবে এবং তৃতীয়টিতে নূতন নূতন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে কাজ করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে। এই তিনটি অঞ্চলে মোট ৮০০০ একরের মত জমি আছে। যদি দুই বৎসরে জমি সম্পূর্ণরূপে তৈরী হয় তবে তৃতীয় বৎসর হইতেই আমরা কাঁথি অঞ্চলে ৪০ লক্ষ হইতে ৫০ লক্ষ মণ লবণ পাইতে পারিব। এই উৎপাদন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ৮০ লক্ষ মণ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে। এই সম্ভাবনা যদি সত্যি কাজে পরিণত করা সম্ভব হয় তাহা হইলে শুধু যে আমাদের পশ্চিম বঙ্গের প্রয়োজন মিটিবে তাহা নয়, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, পূর্ববঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা ও ত্রিপুরা অঞ্চলকেও আমরা লবণ সরবরাহ করিতে পারিব।

কষ্টিক্ সোডা শিল্প

শুধু তাহাই নহে; লবণ শিল্পের আরও একটি বিরাট লাভজনক দিক্ আছে। সেটা হইল বিদ্যুৎশক্তি সাহায্যে কষ্টিক্ সোডা উৎপাদন। কষ্টিক্ সোডা অনেকগুলি শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে অবশ্য প্রয়োজনীয়। সুতা, সাবান ও বহুবিধ রাসায়নিক শিল্প কষ্টিক্ অভাবে ভয়ানক দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল। এখনও সে অবস্থার উন্নতি তেমন কিছু হয় নাই। সমগ্র ভারতের বাৎসরিক প্রয়োজন ৪৫০০০ টন; সে স্থলে ভারতে তৈরী হয় মাত্র ৪০০০ টন কষ্টিক্। ভারত সরকারের শিল্পপ্রসারের পূর্ববর্তী উদ্যোগ অনুসারে কষ্টিক্ সোডার উৎপাদনের পরিমাণ ঠিক করা হইয়াছে ১,০৫,০০০ টন। কাজেই কষ্টিক সিদ্ধের যে বিরাট সম্ভাবনা ও প্রয়োজন আছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। আমরা কাঁথি অঞ্চলে যেরূপ পরিমাণে লবণ তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছি; সঙ্গে সঙ্গে কষ্টিকসিদ্ধ প্রসারের কথাও আমাদের ভাবিতে হইবে। এবিষয়ে আমরা বিশেষজ্ঞ দ্বারা অনুসন্ধান করাইয়াছি। জোগান সিদ্ধটির প্রতিষ্ঠা সব দিক দিয়া সুবিবেচনার হইবে, লাভ যথেষ্ট হইবে এবং বেসরকারী পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে রিফিনা পরিচালনাটি কার্যে পরিণত করা যায়—ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করা হইয়াছে।

কষ্টিক্ সিদ্ধের একটি সমস্যা আছে। এক টন কষ্টিক্ সোডার উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে এক টনের বেশী Chlorine তৈরী হয়। এই ক্লোরিন অনেকটা বিষাক্ত এবং উহার বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহারের ব্যবস্থা না হইলে মানুষের স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়। এ জন্য আরও কয়েকটি সিদ্ধের কথা সঙ্গে সঙ্গে ভাবিবার প্রয়োজন আছে। Chlorine হইতে ব্লিচিং পাউডার, ক্লোরোফর্ম, D. D. T. কার্বলিক এসিড্ প্রভৃতি তৈরী করা যায় এবং এই সব জিনিষের যে বিশেষ চাহিদা ও প্রয়োজন আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন্‌টির চাহিদা কত এবং কি পরিমাণে তৈরী করা উচিত তাহার হিসাব না করিয়া কষ্টিক্‌সিদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের কোন একটি সিদ্ধ গড়িয়া তোলা সঙ্গত নয়। এই সব কারণেই অনেক দিক দিয়া এই সিদ্ধসমষ্টির সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। পশ্চিমবঙ্গে এই সিদ্ধগুলি যে প্রতিষ্ঠা করা একান্ত বাঞ্ছনীয় সে বিষয়ে অবশ্য সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

রঞ্জন শিল্প (Dyestuff)

কয়লা হইতে যে হাজার হাজার শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ অনেক কথা আলোচনা করিয়াছেন। এখনো কয়লা শুধু শক্তি উৎপাদনের জন্যই ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু অধুনা কয়লা ও Coaltar হইতে অন্যান্য আরও অনেক শিল্প গঠনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আগ্রহ ও অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে ভারত সরকার, বিহার সরকার, পশ্চিম বঙ্গ সরকার এবং মাথোদের কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় একটি যুক্ত অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হইয়াছে, মাথোদের অঞ্চলে কয়লা ভিত্তিক সম্ভাবনা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য। এই তদন্তকার্যে সহায়তা করার জন্য কয়েকটি জায়গায় বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত হইবে। সম্প্রতি বঙ্গের সরকারের দুইজন বাঙ্গালী বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিয়াছেন এই প্রদেশের দিক হইতে ঐ অনুসন্ধানে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য। বঙ্গের শিল্প পরিচালকের একেবারে হইবে, যা বিহার এবং কেন্দ্রের হইতে তাহারা ঐ যুক্ত কমিটি বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় ঠিক করিবেন। কিন্তু আমাদের দিক হইতে ঐ সিদ্ধ সম্বন্ধে যাবতীয় অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে। এরূপ সিদ্ধকে সাফল্য করার জন্য আরও অনেক প্রাথমিক ও মাঝারী রাসায়নিক সিদ্ধ গড়িবার প্রয়োজন আছে। সেই সব সিদ্ধের তালিকা পশ্চিমবঙ্গে তোলার ও কি পরিমাণে গড়িয়া তোলা যায় সে সম্বন্ধেও অনুসন্ধান আরম্ভ করা হইয়াছে। আশাকরি এই সব অনুসন্ধানের ফলাফলের মধ্যে যে অনেক নূতন সম্ভাবনা সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়িবে তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি।

আরও অনেক বৃহদাকার সিদ্ধের সম্ভাবনা পশ্চিমবঙ্গে রহিয়াছে। যেমন ভারী বৈদ্যুতিক কারখানা, যন্ত্রপাতি তৈরীর (machinery and plant) কারখানা, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির কারখানা (electrical machinery and plant), Calcium Carbide ইত্যাদি। এই সব শিল্প সম্বন্ধে প্রাদেশিক সরকার সকলে আছেন এবং তাঁহার সরকারের বিশেষজ্ঞ ও সহযোগিতার প্রয়োজন অনুসারে যে উদ্যোগী হইবেন তাহা আশা করা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ প্রধানতঃ শিল্প প্রসারের উপরেই বেশী পরিমাণে যে নির্ভর করিবে সে কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কুটীর ও ক্ষুদ্রাকার শিল্পগুলির প্রসার যেমন একদিকে বিশেষ প্রয়োজন, বৃহদাকার শিল্পগুলির প্রসার ও তেমনি প্রয়োজন। সরকারী শিল্পনীতির সম্পূর্ণ পরিণতি এখন পর্যন্ত দাঁড়াইয়া না করিলেও একথা বলা যায় যে, মাঝারতম শিল্প ও বৃহদাকার শিল্পের প্রসারনীতি ও সাহায্যমূলক প্রসারই ভারতীয় জীবনের পক্ষে সব দিক দিয়া কল্যাণকর হইবে।

সি. কে. সেনের
হস্তিদন্তভস্ম মিশ্রিত
কুঁচ তৈল
টনিক, কেশসংস্কার ও অঙ্গবিলেপনে অদ্বিতীয়। শত ৩০ বৎসর যাবৎ লক্ষ লক্ষ গৃহিণীকেশের সুপরিচিত। সকল ঔষধালয়ে ও ফেরীওয়ালা মোকাম পাওয়া যায়
সি. কে. সেনের ১৭০, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিঃ-১২ Phone : Br. 4811

স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব

মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী, এম-এ, বি-এল-এ.

এক বৎসর হইল ভারতবর্ষ পরাধীনতার কবলমুক্ত হইয়াছে। কিন্তু আমরা এই স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি কি?

ইংরেজ এ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া তাহারা এখানে যে কূটনীতির খেলা খেলিয়াছে, যাইবার সময়ও তাহা ভুলিতে পারে নাই। তাই অন্যত্র ভারতকে কৃত্রিমভাবে খণ্ডিত করিয়া পাকিস্থানের সৃষ্টি করিয়া ভারতেরই এক শ্রেণীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিকে যেন পাকাপাকি করিয়া দিয়াছে। তাহারই ফলে পাকিস্থানের জন্ম হইতে না হইতেই আরম্ভ হইল পশ্চিম পাঞ্জাবে শিখ ও হিন্দুদের উপর অমানুষিক অত্যাচার এবং তাহারই ফলে লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারার ভারতে অভিযান। ইহাদের পুনর্বসতির বিপুল সমস্যায় ভারত সরকার দিশাহারা হইয়া পড়েন এবং সরকারী অর্থভাণ্ডারের উপরও অতিরিক্ত চাপ পড়ে। অতঃপর এই সমস্যা ভারত সরকারের অন্যতম গুরু জটিল সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভারত বিভাগের সময় দেশীয় রাজ্যসমূহ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ব্যবস্থা না করিয়া, পাকিস্থান বা ভারত ইউনিয়নে যোগদান তাহাদের ইচ্ছাধীন করিয়া রাখায় মধ্যেও ইংরেজ আর এক চাল চালিয়া গিয়াছে। কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদ লইয়া যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, ইহা তাহারই পরিণতি।

ইহা ছাড়া পাকিস্থান সরকার প্রথম হইতেই ভারত ইউনিয়নের প্রতি যে বিরুদ্ধ মনোভাব লইয়া তাহাদের রাষ্ট্র পরিচালনা আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে তাবতের পক্ষে নীরবে বসিয়া থাকিয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করাও ভারত সরকারের অন্যতম গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই ত' গেল ভারত বিভাগজনিত বিশেষ সমস্যা। ইহা ছাড়াও ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ পরিচালনার জন্য তদানীন্তন ভারত সরকারকে দেশের অধিকাংশ পণ্যই বিদেশে চালান দিতে এবং তাহার মূল্য শোধ করিবার জন্য স্টার্লিং-ব্যালান্সে জমা রাখিতে হইয়াছিল। তাহারই অনিবার্য্য ফলস্বরূপ দেশে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, বর্তমানেও প্রয়োজনীয় পণ্যসম্ভারের অপ্রাচুর্য্যবশতঃ তাহা ক্রমেই বৃদ্ধির দিকে চলিয়াছে। ফলে জনসাধারণের জীবনযাত্রা ক্রমেই দুরূহ হইয়া উঠিতেছে। অধিকন্তু না দিলে অত্যাবশ্যক যে সব প্রয়োজনীয় জিনিষও আজকাল পাইবার উপায় নাই। চরিত্রের দুর্বলতা যখন চরমে উঠিয়াছে, তখন চোরাকারবারীর দল চোরা-কারবারে দুই হাতে অর্থ লুটিতেছে। এই চোরাকারবার বন্ধ, মুদ্রাস্ফীতি নিবারণ, উপযুক্ত মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যাদির সরবরাহের ব্যবস্থা এই সকল জীবন-মরণ সমস্যা সমাধানে সরকারী ঔদাসীন্য ও অক্ষমতা দেখিয়া জনসাধারণের মনে অসন্তোষের বহ্নি ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছে; বর্তমান গবর্ণমেণ্টের উপর তাহারা বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিতেছে।

যেখানেই পার্টি গবর্ণমেণ্ট,—সেখানেই তাহার বিরুদ্ধ দলও থাকে। এ দেশেও আছে। তাই এই অবস্থার সুযোগ লইয়া সাম্যবাদের রঙীন স্বপ্ন দেখাইয়া এক শ্রেণীর লোক বর্তমান শাসন ব্যবস্থাকে লোকচক্ষে হেয় করিবার সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতেছে। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেও অসন্তোষ বৃদ্ধির চেষ্টা চলিয়াছে। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক যখন যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে পণ্য উৎপাদন একান্ত প্রয়োজন, তখন শ্রমিকদের পুনঃ পুনঃ ধর্মঘটের ফলে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি ব্যাহতভাবে ব্যাহত হইতেছে। উচ্চতর হারে পারিশ্রমিক দিবার ব্যবস্থা সত্ত্বেও শ্রমিকদের মধ্যে কর্মনিষ্ঠার অভাব দেখা দিতেছে। জনসাধারণের মধ্যেও আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা, নিয়মানুবর্তিতার অভাব, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ ইত্যাদি বৃদ্ধি পাইতেছে।

এক শব্দীয়ের বক্তব্যান, এক শ্রেণী-শ্রেমিকের কার্যকরণ ও নির্যাতন ভোগের পর স্বাধীনতা যখন আমাদের করতলগত হইয়াছে, তখন আমাদেরই শ্রেণীবিশেষের মধ্যে এই মনোভাব কেন হইল ইহা গভীর চিন্তার বিষয়। গবর্ণমেণ্টই বা ইহা দূরীকরণ সম্পর্কে কি করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহাও বিচার্য্য।

সাধারণভাবে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও আমাদের জাতীয় সরকার এই এক বৎসর যাহা করিয়াছেন তাহা একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। বিশেষভাবে সর্দ্দার প্যাটেল দেশীয় রাজ্যসমূহের অধিকাংশেরই ভারতের অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা সত্যই প্রশংসনীয়।

কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও ক্ষোভের সহিত বলিতে হইতেছে যে, নূতন রাষ্ট্রের কর্ণধারদের মধ্যে যে বলিষ্ঠ চিন্তাধারা, ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ও কর্ম-তৎপরতা প্রয়োজন, আমাদের নেতৃবৃন্দের যেন তাহার কিছু অভাব রহিয়াছে, অন্ততঃ তাঁহাদের কর্মধারা হইতে তাহাই মনে হইতেছে। ইহার কারণ হয়ত ideological confusion বা আদর্শের অস্পষ্টতা। গান্ধীজির চিন্তাধারার মধ্যে মানুষ হইয়া, তাঁহারই আদর্শে এতদিন কাজ করিয়া আজ যখন ইংরেজের পরিত্যক্ত তক্তে বসিয়া তাহাদেরই তৈয়ারী আইনকানুনের সাহায্যে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে হইতেছে, তখন বস্তুতঃ এই অস্পষ্টতা একেবারে অস্বাভাবিক নয়। তাই আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের কর্মধারার

মধ্যে একাধারে পার্লামেন্ট, সমবায় ও সমাজ-তন্ত্রবাদের সংমিশ্রণ দেখা যায়।

এতদ্ব্যতীত একথাও এক এক সময় মনে হয় যে, আমাদের রাষ্ট্রনায়কগণ যেন এখনও সস্তা শ্লোগানের (slogan) মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। গ্রাশন্যালাইজেশন্ বা জাতীয়করণ সম্পর্কে তাঁহাদের বিশ্বোষিত নীতি হইতেই আমাদের একথা মনে হইতেছে।

মুদ্রাস্ফীতি ও তাহার আনুষঙ্গিক কুফল আমাদের এক মস্ত অভিশাপ। জনসাধারণের সুখদুঃখে ইহার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কাজেই যে কোন জাতীয় সরকারের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য ইহা দূর করিবার চেষ্টা করা। কিন্তু এক বৎসর পর সরকার এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে দেশের অর্থনীতিবিশারদ, শিল্পপতি প্রভৃতি সকলের এক সম্মেলনে এ বিষয়টির বিশদ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা ইহার প্রতীকারের নানা উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। সেগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য একটী কমিটীও নিযুক্ত হইয়াছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর বিগত অধিবেশনেও এই বিষয়টী লইয়া আলোচনা হইয়াছে। আশা করা যায়, মুদ্রাস্ফীতি দূর করিবার এবার সত্যই চেষ্টা হইবে।

মুদ্রাস্ফীতির কুফল যাহাই হৌক, ইহা একটা সাময়িক সমস্যা। কিন্তু দেশবাসীর নিরক্ষরতা ও পশ্চাদ্‌পদতা এখন পর্য্যন্ত আমাদের স্থায়ী সমস্যাই রহিয়া গিয়াছে। ভারত ইউনিয়নের নূতন রাষ্ট্রবিধির যে খসড়া রচনা করা হইয়াছে, তাহাতে প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রেরই ভোটাধিকার স্বীকার করা হইয়াছে। যাহাতে এই অধিকারের যথাযথ সদ্ব্যবহার করা হয়, তজ্জন্য প্রয়োজন ভোটারদিগের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা। কিন্তু নিরক্ষর দেশের সরকার এ বিষয়ে এখনও কোন গুরুত্ব দিয়াছেন কি?

অন্নবস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সকল গুরুতর সমস্যার কোন সমাধান হইল না, অথচ জাতীয় সরকার ইউনিয়নেই গ্যাশন্যালাইজেশন বা জাতীয়করণ লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের কথা উঠিয়াছে, দশ বৎসর পর ভারত সরকার কোন কোন শিল্প পরিচালনার ভার গ্রহণ করিবেন, এখনই সে সম্পর্কে ঘোষণা করা হইয়াছে।

দেশের শিল্প বাণিজ্য পরিচালনার ভার যদি জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেন এবং সেগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় তবে তাহাতে যে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পায়, দেশবাসীর মঙ্গল হয়, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে অন্নবস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পূর্ত্ত, সেচ ইত্যাদি বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের এত বেশী করণীয় রহিয়াছে যে, ৮।১০ বৎসরের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট অন্য কোন দিকে মন দিতে পারিবেন কি না, দিলেও কতটুকু দিতে পারিবেন, এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে।

তাহা ছাড়া শিল্প বাণিজ্যের যথাযথ পরিচালনের জন্য যে অভিজ্ঞতা ও কর্ম্মকুশলতা প্রয়োজন, বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারের তাহারও তত্ত্ব নাই, থাকিবার কথাও নয়। রেলওয়ে, টেলিফোন ইত্যাদি যে কয়টী প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমানে সরকারী পরিচালনাধীন আছে, তাহাদের কার্য্যকলাপ হইতেই আমাদের এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। ইংলণ্ডের মত দেশেও—যেখানে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট মুখ্যতঃ দেশবাসীর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই পরিচালিত হয়,—সেখানেও জাতীয়করণের ফল এ পর্য্যন্ত আশাপ্রদ হয় নাই। সেখানে কয়েকটী বিমান সার্ভিস বহুদিন পূর্ব্বে এবং কয়লা-খনিগুলি বহুদিবস পূর্ব্বে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আসা হয়। কিন্তু সরকারী পরিচালনার ফল এই হইয়াছে যে, যেখানে বে-সরকারী পরিচালনাধীনে পূর্ব্বে যথেষ্ট লাভ থাকিত, সেখানে এখন যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। ইহার অর্থ, দেশের জাতীয় সম্পদের অপচয় হইতেছে।

বোরোলীন

কাটা, পোড়া, হাজা, ব্রণ, মেচেতা, খোস, পাঁচড়া, পাকুই, নালী ঘা, ফোড়া, ঘামাচি, চুলকানি, কানের পুঁজ, কানের আভ্যন্তরীণ ঘা ও অস্ত্রোপচারের ঘা এবং অন্যান্য সর্বপ্রকার চর্মরোগের শ্রেষ্ঠ নিরাময়কারী ঔষধ। এমনকি মুখের বসন্তের দাগ মিলাইয়া মুখশ্রী সুন্দরতর করিতে "বোরোলীন" অদ্বিতীয়।

"বোরোলীন" একটি এ্যান্টিসেপটিক ক্রীম। ইহা সুদৃশ্য টিউবের মধ্যে থাকার জন্য বাহিরের কোন দূষিত পদার্থ ইহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না এবং প্রয়োজন মত ব্যবহার করার সুবিধা পাওয়া যায়।

সকল ডাক্তারখানা, ষ্টোর্স এবং ষ্টেশনারী দোকানে বিক্রয় হয়। ক্রয়কালীন "বোরোলীন" টিউবই চাহিবেন।

প্রতি টিউব—১৲

A Product of
G.D & CO

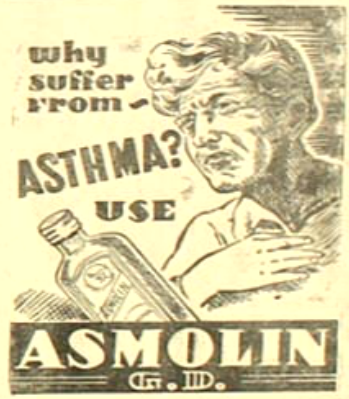

ASMOLIN
Reg. ID.

হাঁপানী, সর্দিকাসি, ব্রঙ্কাইটিস, হুপিং কফ, কফ দ্বারা কণ্ঠনালী বা ফুসফুসের অবরোধ, দুর্গন্ধময় কফ ক্ষরণ, কফের সহিত রক্ত পড়া এবং যক্ষ্মার প্রাথমিক অবস্থায় সেবন করিলে অত্যাশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়।

হাঁপানী প্রভৃতি রোগে অবহেলা না করে আজ থেকেই "এ্যাজমলীন" সেবন করুন।

ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক "এ্যাজমলীন" খেয়ে চিরতরে রোগমুক্ত হয়েছেন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ উচ্চকণ্ঠে "এ্যাজমলীন"এর প্রশংসা করেন ও রোগীদের ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন।

সকল ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়

মূল্য বড় শিশি—৫৲, ছোট শিশি—৩৲, হসপিটাল সাইজ—১৲

বেঙ্গল এজেন্ট : রাইমার এণ্ড কোং, ১১৪, আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা।
বিহার ষ্টকিষ্ট : সমাদ্দার ফার্ম্মেসী, পাটনা।
ইউ পি এজেন্ট : সি আর ঘোষ লক্ষ্ণৌ।
বোম্বাই এজেন্ট : পি কে মিত্র বোম্বাই।

তাহা ছাড়া দশ বৎসর পর তাহার গবর্ণমেণ্টের নিয়ন্ত্রণনীতি কি হইবে, তাহা এখনই বলায় কি কোন লাভ হইয়াছে? লাভ ত' কিছুই হয় নাই, বরঞ্চ এই অস্তিই হইয়াছে যে, দশ বৎসর পর যে সকল শিল্প গবর্ণমেণ্টের নিয়ন্ত্রণাধীনে যাইবার সম্ভাবনা আছে, সেই সব এখন তাহাতে টাকা খাটাইতে অগ্রসর হইবে না। বিশেষতঃ আজকাল যন্ত্রপাতি বসাইয়া কাজ আরম্ভ করিতেই প্রথম তিন চারি বৎসর কাটিয়া যায়। পরবর্তী তিন চারি বৎসরের লাভ অপেক্ষা লোকসানের সম্ভাবনাই বেশী। কাজেই আট দশ বৎসর পরই যখন সবে লাভ হওয়া সুরু হইবে, তখনই যদি উহা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে কে উহাতে হাত দিতে যাইবে?

হইয়াছেও তাই। তাতে গবর্ণমেণ্টের নিয়ন্ত্রণনীতি ঘোষণার পর হইতেই দেশের সর্ব্বত্রই প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। নূতন কোন বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানে মূলধন যোগাইবার আর যেমন উৎসাহ দেখা যাইতেছে না। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় উহা যে মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

অমিতব্যয়ী প্রথা উচ্ছেদ সম্পর্কেও সেই একই কথা। অমিতব্যয়ী প্রথা কোন করিয়া বন্ধ করিবেন তাহা ছাড়া এখন পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের এ সম্পর্কে অন্য কোন পরিকল্পনা নাই। কাজেই পরিকল্পনাহীন গবর্ণমেণ্ট যে বিশেষ কোন সুবিধের সৃষ্টি দিতে বা প্রজাদের কোন উপকার করিতে পারেন নাই, এ কথা কে না জানে? অমিতব্যয়ের ফল যেমনই থাকুক, শুধু কালমদল সৃষ্টির জন্য অমিতব্যয়ী বিলোপের যে কোন সার্থকতা নাই, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

তারপর দেশরক্ষায় অমিতব্যয়ী উচ্ছেদের আয়োজন চলিতেছে, নীতির দিক হইতেই যা তাহা করা হউক গবর্ণমেণ্টের তাহাতে আপত্তির বিষয় নাই। অমিতব্যয়ী বিলোপ করিতে হইলে অমিতব্যয়ের উপযুক্ত অতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা করা উচিত—উহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন অসঙ্গত দাবী নাই। কিন্তু বিধানে অমিতব্যয়ী উচ্ছেদ বিল যে আকারে পাস হইয়াছে, তাহাকে সঙ্কীর্ণতা ও বিদ্বেষদুষ্ট বলিলে অন্যায় হয় কি?

আমরা দুনা না দিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি কোন কিছু কিনিতে চাহেন, তবে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া বিচারের করা গবর্ণমেণ্টের সাধ্য থাকিবে না। দশ বৎসর পর গবর্ণমেণ্ট যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাহারাই বা সে সময় উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তি সম্বন্ধে সরকারী নীতির উপর কতখানি ভরসা করিতে পারিবেন? তাহার পর অমিতব্যয়ের অতিপূরণের অর্থ কোথা হইতে আসিবে, Negotiable or Non-negotiable বণ্ড তাহা কোন করিলেও আখিক জগতে তাহার কি অবাঞ্ছনীয় প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে, বিভিন্ন ব্যাঙ্কের অংশীদারদের বিশেষ বার্ষিক সভায় উক্ত ব্যাঙ্কের পরিচালক ডাক ডিরেক্টরগণ তাহার যে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন, তাহাও বিবেচনার প্রণিধানযোগ্য।

ইহা ছাড়া সমাজ জীবনের যে বিপর্য্যয় দেখা দিবে, তাহা লইয়া ইতিপূর্ব্বে অনেক আলোচনা হইয়াছে। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এত সব প্রতিকূল কারণ সত্ত্বেও এমনই অমিতব্যয়ী প্রথা উচ্ছেদের কি হেতু থাকিতে পারে? তাহাতে ত' অনেক বিষয়েই প্রতিশ্রুতিভঙ্গ, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার ফলটা কাহার সপক্ষে হইয়াছে?

আমাদের জাতীয় সরকারের যে নীতির দৃঢ়তা নাই, আগের কাজ আগে না করিয়া যে সকল কাজ আরও কিছুকাল অনায়াসেই ফেলিয়া রাখা চলে, তাহা লইয়া যে তাঁহারা কিরূপ অযথা সময় ও শক্তি নষ্ট করিতেছেন তাহা দেখাইতে গিয়াই এত কথা বলিতে হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা যে স্বাধীন হইয়াছি, জনসাধারণ এখন পর্য্যন্ত তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। উহার একটী কারণ পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কারণ এই যে, কর্তৃপক্ষ এখনও পূর্ব্বের মনোভাব কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। জনসাধারণের সহিত তাঁহাদের যোগসূত্র যতটা নিবিড় হওয়া উচিত, এখন পর্য্যন্ত তাহা হইতেছে না। দেশরক্ষা, দেশ শাসন বা দেশের সম্পদ বৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রত্যেকটী বিষয়ে যে প্রত্যেক ব্যক্তিরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দায়িত্ব রহিয়াছে, এই বোধ তাহাদের করিবার জন্য সরকার পক্ষ হইতে কোন চেষ্টাই হইতেছে না। ফলে, দেশরক্ষাবাহিনী বাদে সকলভাবে তোড়াতাড়ির ভাসাইতেছে, দেশের সম্পদ বৃদ্ধির দিক সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া অধিকাংশ তাহাদের ঝোঁক দেখিতেছে, যেনতেন পার্থ উপেক্ষা করিয়া দেশদ্রোহীর দল দেশের গায়ের রক্ত-জোঁকের মত চলার দিতেছে।

কাজেই যাহাতে নবলব্ধ স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারে, ইহার অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করা জাতীয় সরকারের অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য। উহা করিতে পারিলে আমাদের আজকালকার সকল সমস্যারই সহজে সমাধান হইবে।

ভারতবর্ষে যেরূপ অনুন্নত দেশ, তাহাতে ইন্‌সুরেন্স সম্বন্ধের নামে জনসাধারণের জন্য উন্নয়নের কোন কাজ স্থগিত রাখা বা বাতিল করার কোন কথা আপাততঃ এখানে না উঠাই বাঞ্ছনীয়। জাতীয় সরকার যদি কোন অনুরোধে ঐ সব কাজ বন্ধ রাখেন তবে তাহা কংগ্রেসের সমুক্ত আদর্শবাদ বিসর্জ্জন দেওয়াই সামিল হইবে। ইন্‌সুরেন্স সম্বন্ধের নামে নামক সর্ব্বজনের নীতি পরিহার না করিয়া সুসমন্বিতভাবে ইন্‌সুরেন্সের মূল কারণগুলি দূর করা সম্পর্কেই গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া উচিত।

এসিড ও কেমিক্যালের জন্য
BENGAL ACID & CHEMICAL MFG. Co.
গবর্ণমেণ্ট ও রেলওয়ে কন্ট্রাক্টরস
হেড অফিস :
৬৭-এ, আপার সারকুলার রোড
ফোন : বি, বি, ১৫৯
ফ্যাক্টরী :
২১৩ ও ২১৪, বাগমারী রোড
ফোন : বি, বি, ২১৭
এসিড নাইট্রিক কিম্বা মিউরিয়াটিক লাইকার, এমোনিয়া ডিস্টিল্ড ওয়াটার
এসিড হাইড্রোক্লোরিক এসিড সালফিউরিক সোডি সালফ্, ম্যাগ সালফ্, ইত্যাদি.

জনগণ ও জনমত

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, বি-এল

আজকাল জনগণ ও জনমতের কথা খুব বেশী শুনিতে পাওয়া যায়। কি রাজনীতি-ক্ষেত্রে, কি অর্থ-নৈতিক ব্যাপারে যাহাই করা হউক না কেন সরকারের পক্ষেই জনগণ ও জনমত একমাত্র অকাট্য যুক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা এখানে কয়েক দুই একটি দৃষ্টান্ত মাত্রই উল্লেখ করিবার জন্য স্থান পাইব। বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া উপলক্ষে চেম্বারলেন তদিনের ১৭ই ফেব্রুয়ারী (১৯৪৮) যে প্রেসনোট, প্রচার করেন তাহাতে বলা হইয়াছে, "গবর্ণমেণ্ট এই আশা করিতেছেন যে, তাঁহাদের বর্তমান নীতি দ্বারা (বস্ত্র-বিনিয়ন্ত্রণ) কাপড়ের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা লিখিয়া করিবার জন্য জনগণের দাবী পূর্ণ হইবে।" বস্ত্রনিয়ন্ত্রণের জন্য জনমতের দাবীই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, না মিলমালিকদের দাবী অপ্রতিহত হইয়া উঠিয়াছিল, নিয়ন্ত্রণোত্তর যুগে কাপড়ের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধির মধ্যে কি তাহারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না? গত ২১শে এপ্রিল (১৯৪৮) বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন উপলক্ষে প্রেসকে কংগ্রেস সভাপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ বলিয়াছেন, "আজ অনেকে জনগণের হস্তগত হইয়াছে। মন্ত্রিগণ তাহাদের পক্ষ হইতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছেন। বৈদেশিক গবর্ণমেণ্টের নীতি সমালোচনার সময় যে ধারা অবলম্বন করা হইত এখন গবর্ণমেণ্টের সমালোচনায় সেই ধারার পরিবর্তন করা আবশ্যক। কারণ, বিদেশী গবর্ণমেণ্ট জনগণের ইচ্ছার সাড়া দিতেন না।" কংগ্রেস সভাপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদের মুখে এই কথা শুনিয়া লক্ষ লোকের মনে এই প্রশ্ন জাগিয়াছে ভারতের রাষ্ট্র শক্তি কি সত্যই জনগণের হস্তগত হইয়াছে? ভারতের রাষ্ট্র-নায়কগণ কি সত্যই জনগণের কল্যাণের জন্য তাহাদেরই অভিপ্রায় অনুসারে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছেন? এই দুইটি প্রশ্নের যথার্থ উত্তর পাইতে হইলে জনগণ বলিতে তাহাদিগকে বুঝায়, জনমত কি এবং কিরূপে ও কোথায় জনমতের অভিব্যক্তি হয় সে-সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

কাহারা জনগণ, এই প্রশ্নের উত্তর কোথাও আমরা পাইয়াছি কি? ইংরাজী ভাষায় 'পিপুল' (people) বলিয়া একটা কথা আছে এবং রাষ্ট্রনীতি বিজ্ঞানে তাহার সংজ্ঞাও নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। এখানে এই সংজ্ঞা লইয়া আলোচনা করার স্থানাভাব। এই সংজ্ঞা অনুসারে অভিজাত, ধনী, মধ্যবিত্ত, কৃষক, শ্রমিক সকলেই 'পিপুলের' (people) অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ইহা জনগণের একটা ব্যাপক সংজ্ঞা। আভিজাত্য এবং ঐশ্বর্য্যের প্রভাবে অভিজাতের ও ধনীশ্রেণীর মতটাই জনমত বলিয়া চলিয়া যাইতে আমরা দেখিয়াছি। সাধারণ মানুষ বা Common man এবং প্রকৃত জনগণ বলিয়া কথাও আমরা শুনিয়াছি। যাহারা উপরোক্ত ভাষার স্থান পাবে ফেলিয়াও, দুইবেলা পেট ভরিয়া স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সুখে অন্ন তুলিয়া দিতে পারে না, বস্ত্রাভাবে অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় যাহাদের জীবন কাটাইয়া দিতে হয়, এই বিশাল বিশ্বে যাহারা মর্ত্তিকার একটুকু স্থান যাহাদের নিজে না—আলোবাতাসহীন অন্ধকারাচ্ছন্ন খুপরি ঘরে যাহাদের জীবন অতিবাহিত হয়, রোগে শয্যাগত হইলেও যাহাদের চিকিৎসা হয় না, মরার পর যাহাদের স্ত্রী-পুত্র নিরাশ্রয় হয়, তাহারাই সাধারণ মানুষ, তাহারাই প্রকৃত জনগণ। ইহারা কাহারা সে-কথা বুঝাইয়া বলার প্রয়োজন আছে কি? ভারতের আয়কর বিভাগের ১৯৪৭-৪৮ সালের রিপোর্ট অনুসারে অবশ্য ভারতে আয়কর-দাতার সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৯২ হাজার। প্রতি পরিবারে পাঁচজন লোক ধরিলে এই ৩ লক্ষ ৯৭ হাজার আয়কর-দাতার পরিবারের লোকসংখ্যা ১৯ লক্ষ ৭৫ হাজারের বেশী হয় না। সুতরাং অবশ্য ভারতের ৪০ কোটি লোকের মধ্যে ২০ লক্ষ লোক বাদে অবশিষ্ট ৩৯ কোটি ৮০ লক্ষ লোকই বৃহত্তর জনগণের মধ্যে পড়ে। তাহার বিস্তৃত হওয়ার পর ভারত ডোমিনিয়নে আয়কর-দাতার সংখ্যা কত দাঁড়াইয়াছে তাহা বৃহত্তরের নির্ভরযোগ্য বলা হয়ত সম্ভব নহে। কিন্তু সে-দিন পর্য্যন্ত বার্ষিক আয় আড়াই হাজার টাকা হইলেই আয়কর দিতে হইত, একথা আমাদের মনে রাখা আবশ্যক। নূতন অর্থনৈতিক বৎসর (১৯৪৮-৪৯) হইতে আয়কর ধার্য্যের উপযোগী সর্ব্বনিম্ন আয় বার্ষিক তিন হাজার টাকা স্থির করা হইয়াছে। বর্ত্তমান জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির দিক হইতে বিবেচনা করিলে তাহার বার্ষিক আয় তিন হাজার টাকা বিভিন্ন বিভিন্ন অবস্থাভেদে মধ্যে গণ্য। ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থসচিব মিঃ আর, কে, ষণ্মুখম চেট্টি গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪৮) ভারতীয় পার্লামেণ্টে বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের আয় বার্ষিক ৩ হাজার ৮ শত টাকা হইতে ১০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত তাঁহারা মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ইহাদের সংখ্যা ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬৫৩ জন। সুতরাং

RECORDS SPEAK FOR THEMSELVES.

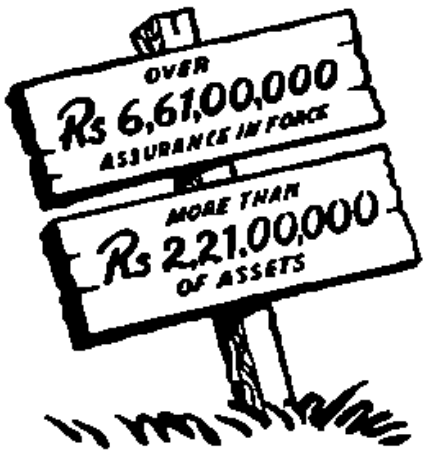

THE INDIAN LIFE ASSURANCE CO., LTD.
"The Friendly Company"
Estd. 1907
CHIEF OFFICE for INDIA—"ELACO HOUSE"
Sir Pherozeshah Mehta Road, Fort, BOMBAY
REGISTERED OFFICE—KARACHI
Write for particulars to—
Mr. J. E. FERNANDEZ—Chief Agent

বার্ষিক আয় দশ হাজারের উপরে হইলেই তাঁহাকে আমরা ধনীশ্রেণীর মধ্যে ফেলিতে পারি। ইহাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। অর্থ-সচিব বলিয়াছেন যে, বার্ষিক দুইলক্ষ টাকা ও তদূর্দ্ধ আয় আছে এইরূপ লোকের সংখ্যা আমাদের দেশে মাত্র ৪১৫ জন। লক্ষাধিক টাকার উর্দ্ধ এবং দুইলক্ষ টাকার অনূর্দ্ধ আয় আছে আমাদের দেশে এরূপ লোকের সংখ্যা তত অর্থসচিব তাহা বলেন নাই। এখানে আমাদের উহার প্রয়োজনও নাই। কিন্তু অর্থসচিব যাঁহাদিগকে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বা middle class-এর মধ্যে ফেলিয়াছেন তাঁহারা মূলধনের মধ্যে পড়েন কি, না, ইহাই প্রশ্ন। নিছকৈতিক সম্বন্ধ অর্থাৎ মালিক ও কর্মীদের মধ্যে সম্বন্ধ দ্বারা এই প্রশ্নের উত্তরের সন্ধান আমরা করিতে পারি।

শ্রমিক-মালিক বিরোধের স্বরূপ আলোচনা করিলে দেখা যায়, বিরোধটা অনেক সময় উচ্চপদস্থ মোটা বেতনভোগী কর্মচারীদের সহিত নিম্নস্তরের কর্মীদের বিরোধের রূপ গ্রহণ করে। এই সকল উচ্চপদস্থ মোটা বেতনের কর্মচারিদিগকে ইংরাজী ভাষায় 'বস্' (Boss) নামে অভিহিত। পুঁজিপতিরা ইঁহাদিগকে মোটা মাহিয়ানা দিয়া থাকেন। সুখেস্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহের কোন অসুবিধা যাহাতে ইঁহাদের না হয় সে-দিকে পুঁজিপতিদের বিশেষ লক্ষ্য থাকে। ইঁহারা উৎকৃষ্ট গৃহে বাস করেন, বিলাস-ব্যসনের কোন ব্যাঘাত ইহাদের হয় না। কিন্তু অধিকাংশ কর্মীই অতি অল্প বেতন পাইয়া থাকেন। অসুবিধা অভাব এবং অত্যধিক শ্রমের ফলে ইঁহারা চঞ্চলচিত্ত। উচ্চপদস্থ 'বস্'দের নিকট হইতে ইঁহারা সর্ব্বদাই দুর্ব্যবহার পাইয়া থাকেন। ইঁহাদেরই ঘাইয়া পরিয়া বাঁচিয়া থাকিবার দাবী লইয়া শ্রমিক-মালিকের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং উচ্চপদস্থ মোটা বেতনভোগীরা স্বাভাবিকই মালিকের পক্ষ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কাজেই এই শ্রেণীর মোটা বেতনভোগী মধ্যশ্রেণীর লোককে সাধারণ মানুষ বা বৃহত্তর জনগণের পর্য্যায়ে ফেলিতে পারা যায় না। অতএব আমরা বলিতে পারি, কৃষক, শ্রমিক এবং নিম্নবিত্ত মধ্যশ্রেণী লইয়াই বৃহত্তর জনগণ বা সাধারণ মানুষের শ্রেণী। প্রকৃত পক্ষে জনগণ বলিতে ইঁহাদিগকেই বুঝায়। ইঁহারা অতিজাত শ্রেণীর মধ্যেও পড়ে না, মধ্য শ্রেণীর মধ্যেও পড়ে না। দেশের অধিবাসীদের মধ্যে ইহারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু নিম্নবিত্ত মধ্য শ্রেণীর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

মধ্যশ্রেণী নাম হইতেই সমাজ-ব্যবস্থায় ইহাদের স্থান কোথায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সর্ব্বনিম্নে কৃষক ও শ্রমিক এবং সর্ব্বোচ্চে অতিজাত ও ধনীশ্রেণী, মধ্যস্থলে নিম্নবিত্ত মধ্যশ্রেণীর স্থান। এই মধ্যবর্ত্তী অবস্থা দ্বারাই ইহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্দ্ধারিত হয়। বুদ্ধিজীবী বলিতে যাঁহাদিগকে বুঝায় তাঁহারাও এই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। ইঁহাদের আকাঙ্ক্ষা থাকে ধনীশ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার। কেহ কেহ ধনীশ্রেণীতে উন্নীত হইয়াও থাকেন। আবার সাধারণ স্বার্থ-বিপন্নতাহেতু শ্রমিক শ্রেণীতে নামিয়া আসিবার আশঙ্কায় ইহারা ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠেন। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা যেরূপ ভয়ঙ্কর উপদ্রব উপনীত হইয়াছে তাহাতে বিত্তের দিক হইতে ইঁহাদিগকে সর্ব্বহারা বলিতে কোন বাধা নাই। কিন্তু মনোবৃত্তি ধনী শ্রেণীর অনুরূপ হইয়াই গঠিত। এইরূপ আর্থিক অবস্থা ও মনোবৃত্তির জন্যই দোটানার মধ্যে পড়িয়া দ্বান্দ্বিক-মানসিকতার বেতস লতার মত অবস্থায় ইহাদের জীবন কাটিয়া যায়। ভাগ্য ভঙ্গ করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষাও ইহাদের আছে, সমষ্টিগতভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়া সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনও তাহারা করিতে চায়। আবার ধনী ও অতিজাত শ্রেণীর অনুগ্রহের ফলে অথবা তাঁহাদের অনুকম্পা দেখিয়াই দুহুতে লম্বস্ত চেটা বর্জ্জন করিতেও ইহারা কুণ্ঠিত হয় না। ধনীশ্রেণীর ভ্রূকুঞ্চনে বিচলিত হইয়া নত বদলাইতেও ইহাদের সময় লাগে না। গণতন্ত্রের ভাব-ধারায় ইহারা সহজেই প্রভাবিত হয়, কিন্তু তাহাদের নীচের শ্রেণী অর্থাৎ কৃষক শ্রমিকরা শক্তিশালী হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিলেই, ইহারা অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠে। ইহাদের আর্থিক সামর্থ্য যেমন অত্যন্ত অল্প, এই স্বল্প আর্থিক সামর্থ্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কাও তেমনি অত্যধিক। মন্বন্তর, ভূমিকম্প, সাইক্লোন প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের মধ্যে ইহারা যেমন একান্ত অসহায়, তেমনি একান্ত অসহায় ভাবেই ইহারা ধনীশ্রেণী দ্বারা শোষিত হয়। কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব করে ইহারাই। আবার ধনীশ্রেণীর নিকট হইতে সামান্য সুবিধা বা প্রলোভন পাইলেই কৃষক ও শ্রমিকের প্রতি ইহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিতেও দ্বিধাবোধ করে না। আমাদের দেশের ব্যবসায়ী সম্বন্ধে আমরা পরস্পর কলহ-বিবাদ করিতে, নিজেদের মধ্যে কূটনৈতিক লড়াই করিতে দেখিতে পাই। কিন্তু পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য ব্যবসায়ী সমস্তগুলি এখনও ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে নাই। সরকারী অফিস আদালতে, আধা-সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে জন কয়েক উচ্চশিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর মনের (Boss) অধীনে ইহারা অফিস ঝাঁকাইয়া থাকেন। আপনি যদি কোন কাজের জন্য কোন অফিসে যান, তাহা হইলেই ইঁহাদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ও দুর্নীতির পরিচয় পাইতে বিলম্ব হইবে না। নিম্নবিত্ত মধ্যশ্রেণীর কথা সামান্য বিশদভাবেই এখানে বলিতে হইল। জনগণের ইহারা একটা প্রধান অংশই শুধু নহে, জনগণের ভবিষ্যৎ ভাগ্য-নির্দ্ধারণের এই অংশটির গুরুত্ব খুব বেশী। ইহারা শিক্ষিত, রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন। কিন্তু প্রাণে বাঁচিবেই ইহাদের প্রাণান্ত। এক হিসাবে কৃষক ও শ্রমিকের অপেক্ষাও ইহাদের জীবন দুর্ব্বিষহ।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে এই জনগণ —কৃষক, শ্রমিক ও নিম্নবিত্ত মধ্যশ্রেণী খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। বস্তুতঃ ভারতের স্বাধীনতা লাভে ইহারাই করিয়াছে সৈনিকের কাজ। কংগ্রেসী আন্দোলনের ফলেই হউক আর আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাবলীর চাপেই হউক, ইহারাই ভারত শাসনের ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিয়াছে। ভারত বিভক্ত হইলেও আমরা বৃটিশের প্রত্যক্ষ শাসন হইতে মুক্ত হইয়াছি। অত্যাচারী বৈদেশিক শাসন আর নাই। কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদের ভাষায় ভারতীয় ইউনিয়নে জনগণের গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই গবর্ণমেণ্ট জনগণের পক্ষ হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছেন। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাই পূরণ করিবেন, ইহাই আশা করা স্বাভাবিক। ভারত জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাই গবর্ণমেণ্ট পূর্ণ করিতেছেন, কিন্তু কয়েকটি আর্থান্বেষী লোকের প্রয়োচনায় জনসাধারণ তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। মিঃ বল্লভভাই প্যাটেল বাজেট প্রকাশিত হইলে কোন দৈনিক পত্রিকার কেহ লাইনে বলা হইয়াছিল, "No Additional Burden on Poor Man," অর্থাৎ দরিদ্র লোকের উপর আর অতিরিক্ত বোঝা চাপানো হয় নাই। ইহাকেই কি আমরা জনমতের অভিব্যক্তি বলিব? দেশের ভাড়া সামান্য বাড়িয়াছে। ইহাও না উহা জনগণের কল্যাণের জন্যই করা হইয়াছে। চিনির নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়ার পর চিনির পাইকারী দর ২১৲ টাকা হইতে বাড়িয়া ৩৬৲ টাকা হইয়াছে। খুচরা দাম বাড়িয়াছে আরও বেশী। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চিনির যে দাম আমরা তাহা অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ বেশী দাম দিতেছি। কিউবায় চিনি ভারতে আমদানি করিলে প্রতি সের ৵৹ পন আনায় বিক্রয় হইত। চিনির দাম বৃদ্ধির জন্য যে বাড়তি লাভ হইতেছে তাহার একটা অংশ গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিতেছেন। কাজেই জনগণের ক্ষোভের কি কারণ থাকিতে

পারে ? তা' ছাড়া বিটিশ কবিয়াও আমরা যে অজ্ঞাতসারে পুনরুজ্জীবন করিতেছি, সে কথা মনে করিলে চিনির দাম বৃদ্ধির জন্য আমাদের বরং আনন্দিতই হওয়া উচিত। চিনির দাম হইতে মনোবৃত্তি ভঙ্গ আমরা সোমনাথের মন্দির পুনর্নির্মাণ ব্যতিরেকে দেখিতে পাইতেছি। আমরা স্বাধীন হইয়াছি বলিয়াই যে চিনি খাইয়া এতবড় পূজা আমরা সম্পন্ন করিতে পারিতেছি। গত ১৫ই আগষ্টের (১৯৪৮) "লাইফ্‌লাইট" পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে—চিনি চালান দেওয়ার জন্য স্পেশাল ট্রেণের ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও বিহারের অধিকাংশ চিনির কলেই প্রচুর পরিমাণে চিনি মজুত রহিয়াছে। বেশী চিনি খাওয়ার ফলে ভারতীয় জনগণের যাহাতে 'ডায়বেটিস্' না হয় তাহারই জন্যই কি এই ব্যবস্থা ?

যতদিন কাপড়ের নিয়ন্ত্রণ ও রেশন ব্যবস্থা বজায় ছিল ততদিন কাপড়ের যে অভাব ছিল তাহাতে দরিদ্র জনসাধারণের লজ্জা নিবারণ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উঠিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ে বাজার যেমন ছাইয়া গেল, তেমনি বস্ত্রের মূল্যের জন্য হু-হু করিয়া কাপড়ের দাম বাড়িতে লাগিল। বস্ত্রনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উঠিয়া যাওয়ার পর সাত মাসে কাপড়ের কলের মালিকগণ এবং বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা ১০০ কোটি টাকারও বেশী অতিরিক্ত লাভ করিয়াছেন। বস্ত্র বিনিময়ের পরে কাপড়ের দাম খুব বেশী বাড়িয়া যাইবার জন্য জনসাধারণেই দায়ী করিতে আমরা শুনিয়াছি। তাহারা কাপড় বিনিময়ের জন্য বেশী কড়াকড়ি করাতেই নাকি দাম বাড়িয়া গিয়াছে। গত আগষ্ট মাসে পণ্ডিত যবের অসাধারণ দরবৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন, "পূর্ব-পাকিস্তানের মহাজন গান্ধীজী আদর্শের কথা স্মরণ করা উচিত এবং তাঁহারাই যে জাতীয় সম্পদের প্রকৃতরক্ষক এজন্য তাঁহাদের বিশেষভাবে যত্নবান হওয়া কর্তব্য।" তবে জাতীয় সম্পদের প্রকৃত রক্ষক হিসাবে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যেই কাপড়ের দাম বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। অর্থনীতি বিজ্ঞান অনুসারে ইহাতে ১০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত লাভ জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে কি না, তাহা বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে এই আশঙ্কাই শুধু জাগিতেছে যে, জাতীয় সম্পদ যে অনুপাতে বাড়ে সাধারণ মানুষের দরিদ্রতা সেই অনুপাতেই বর্ধিত হয়। সুতরাং আজি যদিতে যাহা বুঝায় সাধারণ মানুষের তাহা তাহাতে জোগায়, এই প্রশ্ন কি জাগিবার বিষয় নয় ?

বিদেশী গবর্ণমেণ্ট জনমতের দাবীতে লাড়া দিতেন না, একথা আমরা কাহারো প্রেসিডেণ্ট ট্রাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের মুখে শুনিয়াছি। আমাদের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট জনমতের দাবীতে সাড়া দিতেছেন কি ? তাহার গবর্ণমেণ্ট বাউলিকল আয়লমির উপর যে বিধিনিষেধ আরোপ করিয়াছেন তাহা কি জনমতের দাবী অনুসারেই ? বাউলিকল বিলাসদ্রব্য বলিয়া গণ্য হইল কেন ? কবিত্ব ও মনোবিজ্ঞান শ্রেণীর অনুযায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মান হিসাবে বাউলিকলের বিশেষ সার্থকতা আছে বলিয়াই কি, না কি বিলাসের বাউলিকলের কারখানা আছে বলিয়া ? যত্ন এত সহরগুলির দৃশ্য ও মান জনসাধারণের সম্মুখে ধারণকরণ। ট্রামে বাসে যে কি ভীড় হয়, কবিত্ব জনসাধারণ প্রতিনিধি আমাদের শাসকবর্গের সে সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা নাই। তবু বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের নির্দেশে বোম্বাইয়ের দৃশ্য হইতে বসিবার আসনগুলি তুলিয়া দিয়া সকলের জন্যই তুলিয়া যাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ ইহাতে প্রত্যেক ট্রামে আরও বেশী লোক ধরাইতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ কতক ট্রামযাত্রী বসিয়া যাইবে আর কতক দাঁড়াইয়া যাইবে, এইরূপ গণতন্ত্রবিরোধী ব্যবস্থা বোধহয় বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট লক্ষ্য করেন নাই।

BOOKS ON COMMERCE

Civics & Economics

1. HAND BOOK CIVICS (In English) 7/-
   By Prof. A. K. Sen, M.A., M.Sc., (Econ.) Lond.
2. ESSENTIALS OF GENERAL ECONOMICS 2/8
   In the form of Q. & Ans. for B.A. & B.Com.
3. ESSENTIALS OF INDIAN ECONOMICS 2/8
   In the form of Q. & Ans. for B.A. & B.Com.
4. পৌর বিজ্ঞান (Civics in Bengali) 7/-
   By Prof. A. K. Sen
5. INT. CIVICS COMPANION IN BENGALI 3/8

Economic and Commercial Geography

6. ECONOMIC & COMMERCIAL GEOGRAPHY 10/8
   By Prof. A. Dasgupta, M.A. (Gold Medalist).
7. ECONOMIC GEOGRAPHY (In two Parts)
   Part I 2/- Part II 3/-
   By Prof. D. R. Mitra, M.A. (Edin.), Barat-Law.
8. ECONOMIC GEOGRAPHY OF INDIA 3/8
   For I.Com. students By Prof. A. Dasgupta, M.A.
9. ESSENTIALS OF COMMERCIAL GEOGRAPHY 2/8
   In the from of Q. & Ans. for B.Com. students.
10. ESSENTIALS OF COMMERCIAL GEOGRAPHY 1/8
    For I.Com. students in the form of Q. & Ans.
11. COMMERCIAL GEOGRAPHY (In Bengali) 2/8
    By Profs. D. R. Mitra & M. R. Chaudhury.
12. INT. COMMERCIAL GEOGRAPHY Companion in Bengali.

Business Organisation

13. BUSINESS ORGANISATION 11/-
    By Prof. Dr. B. B. Ghosh, Ph.D. (Econ.) Lond.
14. ESSENTIALS OF BUSINESS ORGANISATION 7/-
    By Prof. R. B. Bose, M.A., B.Com., A.S.A.A.
15. INDIAN BUSINESS: VOL I 10/-
    By Prof. K. C. Lalwani, M.A.

Commercial Law

16. HANDBOOK OF COMMERCIAL LAW 10/8
    A. K. Sen, M.A., M.Sc. (Econ.) Lond. Barat-Law
17. ESSENTIALS OF COMMERCIAL LAW 2/-
    For B.Com. students By a Gold Medalist.
18. Q. & ANS ON COMMERCIAL LAW 1/8
    By R. Sengupta, M.A., B.Com., B.L.

Auditing

19. PRINCIPLES & PRACTICE OF AUDITING 5/-
    By Prof. R. B. Bose, M.A., B.Sc., B.Com., A.S.A.A.
20. QUESTIONS & ANS ON AUDITING 2

Book-Keeping and Accountancy

21. ELEMENTS OF BOOK-KEEPING 7/8
    By Prof. B. Chakravarti, B.Com., B.A., A.S.A.A.
22. ESSENTIALS OF BOOK-KEEPING AND ACCOUNTS 7/8
    By Profs. R. B. Bose & P. K. Ghosh.
23. QUES. & ANS. ON ADVANCED ACCOUNTANCY 3/8

Banking and Currency

24. INTRODUCTION TO MONEY 3/8
25. INTRODUCTION TO BANKING 3/8
    By Prof. K. C. Lalwani, M.A.

English

26. HIGHER GRADE ENGLISH COMPOSITION 8/8
    By Prof. G. N. Moitra, M.A.
27. MODEL ESSAYS FOR COLLEGE STUDENTS 2/8
    By Prof. S. K. Mukherjee, M.A.

Bengali

28. HANDBOOK OF COMMERCIAL BENGALI 5/-
    By S. Banerjee, M.A. (Gold Medalist)
29. QUES. & ANS ON B.COM. BENGALI COMPOSITION 1/8

A. MUKHERJEE & CO. 2, COLLEGE SQ., CALCUTTA

যিনি বোম্বাইয়ের ট্রামে একটিমাত্র ঝুলিয়া যাওয়ার ব্যবস্থাকে 'hanging accommodation' বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন, তিনি জনসাধারণের জন্য বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটির আধুনিক বাস তৈরি করিতে পারেন নাই। কলিকাতার ট্রামে সীটগুলি তুলিয়া দিয়া এখনও 'hanging accommodation'-এর ব্যবস্থা হয় নাই। বোম্বাই কলিকাতার জনসাধারণের দাবী এইরূপ ব্যবস্থার জন্য প্রবল হইয়া উঠে নাই। বেশ ভ্রমণের দুর্ভোগের কথা বোধহয় না শুনাই ভাল। আজকাল সামান্য দূর-ভ্রমণ করিতে হইলেও বহু ব্যক্তিকে এরোপ্লেনে যাইতে থাকেন। তাহাতে রেলভ্রমণের অসুবিধা দূর করিবার জন্য জনসাধারণ তো প্রবল হইয়া উঠিবার কথা নয়। মাঝে মাঝে আমরা বিনাটিকিটে রেলভ্রমণের কথা শুনিতে পাই। কর্তৃপক্ষ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া প্রচার করিয়া থাকেন যে, বিনা টিকিটে রেলভ্রমণ বন্ধকরার নামান্তর মাত্র। রেলপরিচালনের অব্যবস্থার জন্য বহু লোক যে টিকিট কিনিতে না পারিয়া বিনা টিকিটেই রেলে চড়িয়া বসে, সে-সমস্যা লইয়া এখানে আলোচনা করিবার স্থান নাই। বিনা টিকিটে রেলভ্রমণ অবশ্যই প্রতিকার্য। কিন্তু যে ট্রেনে তিলধারণের স্থান নাই সে ট্রেনে যাইবার জন্য লক্ষলক্ষ লোকের নিকট টিকিট বিক্রয় করাকে কি বলিয়া অভিহিত করা সঙ্গত?

যুদ্ধের সময় হইতেই ভারতের বিভিন্ন সহরে জনসংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে এবং এখনও বাড়িতেছে। পাটনাতে আগে যাহাদের আয়-সংস্থানের উপায় ছিল, আজ দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনে তাহারা সেই উপায় হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। অন্নসংস্থানের চেষ্টায় সহরে চলিয়া আসা ছাড়া আর কোন উপায় তাহাদের নাই। ফলে সহরগুলিতে জনসংখ্যার চাপ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু নূতন গৃহ নির্মাণের কোন আয়োজন যুদ্ধোত্তর পর তিন বৎসরের মধ্যে হয় নাই কেন? গৃহনির্মাণের উপকরণের অভাবের কথা আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু উপকরণের অভাব সত্ত্বেও এই কলিকাতা সহরেই বহু সিনেমা গৃহ নির্মিত হওয়া সম্ভব হইয়াছে। জনসাধারণের জন্য কলিকাতায় প্রয়োজন মিটানো হইয়াছে বলিয়াই কি গৃহনির্মাণের জন্য জনসমর্থনের প্রয়োজনীয়তা নাই?

স্বাধীনতার এক বৎসরে খাদ্যদ্রব্যাদির মূল্য আরও বাড়িয়া গিয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থ-নৈতিক উপদেষ্টা ভারতের সমস্ত বড় বড় শহরের পাইকারী দরের সাপ্তাহিক মূল্যসূচী প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই মূল্য-সূচী হইতে দেখা যায়, ১৯৪৭ সালের ১৬ই আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে ভারতের সকল রকম পণ্যের পাইকারী দরের সূচীসংখ্যা ছিল ৩০১৫; এক বৎসর পর ১৯৪৮ সালের ১৪ই আগষ্ট যে-সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে উক্ত সূচীসংখ্যা ৩৮৩-তে উঠিয়াছে। ২১টা পাইকারী দরই বাড়িয়াছে শতকরা প্রায় ২৮·১ ভাগ। ১৯৪৭ সালের ১৬ই আগষ্ট যে-সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে খাদ্যদ্রব্যসমূহের পাইকারী দরের সূচীসংখ্যা ছিল ২৯৮·৪। ১৯৪৮ সালের ১৪ই আগষ্ট যে-সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে উক্ত সূচী ৩৯৮·- হইয়াছে। পাইকারী দরের এই বৃদ্ধি মোটেই খুশীর কথা নয় কিন্তু কতখানি বাড়িয়াছে তাহা কিছুই অনুমান করা যায় না। ১০ই জুলাই তারিখের "ষ্টেট্‌সম্যান" পত্রিকায় কলিকাতার বাজার দর বৃদ্ধির একটি তুলনামূলক তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এই তালিকায় ৫৭টি দ্রব্যের ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরের এবং ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসের দামের তুলনামূলক হিসাব আছে। এই তালিকায় দেখা যায় ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরের তুলনায় ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে তরিতরকারীর দাম শতকরা ৪৪ ভাগ, মাছের দাম শতকরা ২৪ ভাগ, চালের কিনের দাম শতকরা ৪ ভাগ বাড়িয়াছে। কয়লার নিয়ন্ত্রিত দর প্রতিমণ ১৮৵০ আনা। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত দরে কয়জন লোক কয়লা কিনিতে পায়; লাইন দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কয়লা কিনিতে পারেন না, তাঁহাদিগকে প্রতিমণ কয়লার জন্য ৫৲ টাকা দিতে হয়, অর্থাৎ শতকরা ৯২ ভাগ বেশী দাম দিতে হয়। যাঁহারা জনসাধারণের প্রতিভূ তাঁহারা এই দাম বৃদ্ধি সম্বন্ধে কি বলেন? শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী ভারতের গবর্ণর জেনারেল হইয়া যাওয়ার প্রাক্কালে কলিকাতার মাড়োয়ারী সভার বিদায়-সম্বর্দ্ধনার উত্তরে বলিয়াছিলেন: "Those who wished to blacken the reputation of the Government complained that rice and cloth were selling at high price."—অর্থাৎ 'যাহারা গবর্ণমেণ্টের সুনামকে কালিমালিপ্ত করিতে চায় তাহারাই বলে চাউল ও কাপড় চড়া দরে বিক্রয় হইতেছে।' ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের ভাষায় 'জনতা জনসাধারণের শত্রুতে পরিণত হইয়াছে। মন্ত্রিগণ তাহাদের পক্ষ হইতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছেন।' সুতরাং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম বাড়িয়াছে বলিয়া যাঁহারা প্রচার করেন, তাঁহাদের প্রচারকার্য্যের মধ্যে জনমত নিশ্চয়ই অভিব্যক্ত হয় না। কিন্তু প্রয়োজন হইলে দাম বৃদ্ধি ও চোরাকারবারের জন্য জনসাধারণকেই দায়ী করিতে আমরা শুনিয়াছি। গত ১৭ই আগষ্ট (১৯৪৮) কলিকাতা চোরাবাজার প্রসঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ রায় বলিয়াছিলেন: "The black market existed because purchasers were willing to pay exorbitant prices for goods. Buyers should go on a buying strike while prices remained high." অর্থাৎ "ক্রেতারা অত্যধিক দামে জিনিষ কিনিতে রাজী বলিয়াই চোরাবাজারের অস্তিত্ব রহিয়াছে। যতদিন দাম চড়া থাকিবে ততদিন ক্রেতাদের ধর্মঘট করা উচিত।" ধর্মঘটকারীরা ততদিন ধর্মঘট চালাইতে সমর্থ, যতদিন উপরে ধর্মঘটের জয় নিশ্চয় করে। জমিদারগণ যদি এক মাসের জন্য সমস্ত খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করা বন্ধ করে, তাহা হইলে খাদ্যদ্রব্যের দাম কমিবে কি? খাদ্যদ্রব্যের দাম না কমিলেও একমাসের অনাহারে জনসংখ্যা যে কমিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। একমাস অনাহারে জনসংখ্যা যদি যথেষ্ট হ্রাস পায়, তাহা হইলেও খাদ্যদ্রব্যের দাম কমিবে কিনা সন্দেহ। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে ৫০ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের দাম সে-অনুপাতের কমে নাই।

মাঝে মাঝে দুই একজন নেতা ফুল কমিয়া বেতন কমা বলিয়া থাকেন। গত ১৪ই আগষ্ট (১৯৪৮) সন্ধ্যে সহরে পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ বলিয়াছিলেন: "The common man has not yet realized the thrill and joy of freedom." অর্থাৎ 'সাধারণ মানুষ এখনও স্বাধীনতার উদ্দীপনা ও আনন্দ উপলব্ধি করে নাই।' সাধারণ মানুষের প্রাণ রাখিতেই যখন প্রাণ অন্ন অবধ্য, তখন স্বাধীনতার উদ্দীপনা ও আনন্দ তাহারা উপলব্ধি করে নাই, একথা কিরূপে স্বীকার করা যায়? কৃষক, শ্রমিক এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শক্তিকে শক্তিমান হইয়াই কংগ্রেস ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। ক্ষমতা লাভের পর স্বাধীন ভারতের গবর্ণমেণ্ট পৃথিবীর ৩১টি দেশে রাষ্ট্রদূত রাখিয়া ভারতীয় জনগণের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন। সাধারণ মানুষ দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাইক আর না-ই পাইক, পরনের কাপড় জুটুক আর না-ই জুটুক বিদেশে তাহাদের মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য বৎসরে এক কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে। সুতরাং সাধারণ মানুষ স্বাধীনতার উদ্দীপনা ও আনন্দ উপলব্ধি না করিবে কেন? ভারতের গবর্ণর জেনারেল শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী মাসে ১২,৩০০৲ টাকা বেতন পাইয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত প্রতিবাসে গবর্ণর জেনারেলের জন্য ব্যয় হয় ৮৮,৬০০৲ টাকা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু গবর্ণর জেনারেলকে এই বেতন দেওয়ার কারণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "It was necessary to

see that dignity did not suffer" অর্থাৎ 'মর্যাদা যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তাহার জন্য উহা প্রয়োজন।' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মাসে ১০,০০০৲ টাকা বেতন পাইয়া থাকেন। সুতরাং ভারতের মর্যাদা রক্ষার জন্য গবর্ণর জেনারেলের মাসিক বেতন ১০,৯০০৲ টাকা না হইলে চলিবে কেন? সুতরাং সাধারণ মানুষের স্বাধীনতার আনন্দ ও উদ্দীপনা উপলব্ধি না করিয়া উপায় আছে কি? তাহার বিস্তার চেষ্টা সত্ত্বেও ভারতের শাসন পরিচালনের জন্য কর্মচারীর সংখ্যা কমে নাই। লক্ষ্ণৌ-এর "নেশন্যাল হেরল্ড" পত্রিকায় এই বৃদ্ধির যে তুলনামূলক হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল:

	১৯৩৯	১৯৪৮
সেক্রেটারী	৯	১৯
এডিঃ সেক্রেটারী	৪	৫
জয়েন্ট সেক্রেটারী	৮	৩৪
ডেপুটী সেক্রেটারী	১১	৮৭
আণ্ডার ও এসিঃ সেক্রেটারী	১৬	১৯১
সুপারিন্টেণ্ডেন্ট	৬৫	১১৯
এসিঃ ইনস্পেক্টর	৮	১১৯
এসিষ্ট্যাণ্ট	৪৯৩	৩৭০৮
কেরাণী	৬৪১	২৫৬৯
টেনোগ্র্যাফার	৯০	৪১০
চাপরাশী	৪৭০	৯১০০

আমাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য জনসাধারণের চরিত্র গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছেন তাঁহারা এই বৃদ্ধি নিশ্চয়ই প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ ভারতের এই মর্যাদা বৃদ্ধি সম্বন্ধে কি অভিমত পোষণ করে? এই অভিমত জানিবারই বা উপায় কি?

সাধারণতন্ত্রের জনমতের প্রকাশক বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। কোন কোন সংবাদপত্র ও লেখক এসম্বন্ধে যে তাহার সমালোচনা করেন নাই, তাহা নহে। কিন্তু ইহারা "News papers of no great standing in the country and nameless scribes" আখ্যা লাভ করিতেছেন। সুতরাং দেশের কোন বিশিষ্ট ও মর্যাদাসম্পন্ন সংবাদপত্র ও কোন খ্যাতনামা লেখক ভারতের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার এই ব্যবস্থার যে বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন নাই, তাহা বলিয়া লওয়া যাইতে পারে। কাজেই সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে কোন-গুলি জনমতের বাহক ও বাহক বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু যাহারা সাধারণ মানুষ—যাহারা কৃষক, শ্রমিক ও নিম্ন-বিত্ত মধ্যশ্রেণীর লোক তাহাদের সম্বন্ধেই বা কি, তাহা জানিবার কোন উপায় আছে কি? তাহারা নিজেরাই 'of no great standing'; তাহারা নিজেরাই 'nameless' সেই জনমতের মত সহায়ই কোথাও অভিব্যক্ত হয় কি?

বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে গণভোট গ্রহণ (plebiscite) জনসাধারণের অভিমত জানিবার শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। গণভোটের উপযোগিতা সর্বপ্রথম বোধের হয় ফরাসী বিপ্লবের সময়ে। যে সকল দেশ ফরাসী প্রজাতন্ত্রের সহিত যুক্ত করা হয় সেই সকল দেশে গণভোট গ্রহণের জন্য ফরাসী গণ-পরিষদ দাবী উত্থাপিত করেন। তৃতীয় নেপোলিয়ন শক্তি প্রয়োগে তাহাদের সম্মতি লইয়াছিলেন। কিন্তু সম্মতি গ্রহণের পর তিনি তাঁহার সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনের জন্য গণভোটের দ্বারা অনুমোদন করাইয়া লইয়াছিলেন। গণভোটের পদ্ধতিতে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠে প্রথম মহাসমরের পরে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গণভোটেরই একাধিপত্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু গণভোট দ্বারা সত্যই জনসাধারণের সত্যকার অভিপ্রায়ের পরিচয় পাওয়া যায় কি? গণভোটের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। সাফল্যের সহিত প্রচারকার্য চালাইবার জন্য যে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন হয় তাহা নহে। প্রচুর অর্থেরও প্রয়োজন হয়।

বেদ বেদান্তের যুগে মুনি-ঋষিরা পান করতেন 'সোমরস'। জরাজীর্ণ পৃথিবীতে নশ্বরত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতেন তাঁরা। কালের বিজয় অভিযান এগিয়ে চলো।

- আদি 'সোমরসের' সূত্র হারিয়ে গেলো বিস্মৃতির অন্তরালে। বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারে আবিষ্কৃত হ'ল সোমরসের আধুনিক সংস্করণ।
- প্রসবের আগে ও পরে, ক্ষয় নিবারণে ও দৌর্বল্য নিরোধে জীবন্ত স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ পরমায়ু উপার্জনের উৎকৃষ্টতম সম্বল, জাতীয় প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানসম্মত রসায়নাগারে প্রস্তুত।

"ভিটাকারনিস"

মাদারল্যাণ্ড ড্রাগ হাউস (ইণ্ডিয়া) লিঃ

৫৯, বেলগাছিয়া রোড,
কলিকাতা।

দেশের অর্থনৈতিক শক্তি যে দলের হাতে তাহারাই জনমত প্রভাবিত করিতে সমর্থ। ইহার উপর রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি যদি তাহাদের হাতে থাকে, তাহা হইলে জনমতের সমর্থন লাভ করা আরও সহজ হয়। তাহাই লক্ষিতে ইহা বিবেচিত হইয়াছিল যে, বিরোধীয় অঞ্চল হইতে যাবতীয় সমস্ত পক্ষের সমস্ত সৈন্য অপসারণ করিতে হইবে এবং আন্তর্জাতিক কমিশন পর্যবেক্ষণের অঞ্চলের ভার গ্রহণ করিবেন। কিন্তু নিরপেক্ষ সৈন্যবাহিনী নিরপেক্ষ নাও থাকিতে পারে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর আলার সাইলেসিয়ার গণভোট গ্রহণের সময় জার্মান সৈন্যরা পোলদিগকে এবং বৃটিশ সৈন্যরা জার্মানদিগকে সমর্থন করার অভিযোগ উঠিয়াছিল। ভোট দেওয়া সম্বন্ধে স্বাধীনতা, সততা এবং গোপনীয়তার সুব্যবস্থা সত্ত্বেও কিরূপে জনমতের অভিপ্রায় নির্ধারণ করা কঠিন। জনমত একটি বিপুল শক্তি। কিন্তু এই শক্তি অসংবদ্ধ ও বিক্ষিপ্ত। যে রাজনৈতিক দল এই বিপুল শক্তির যত বেশী অংশ নিজেদের অনুকূল করিতে পারেন, সেই দলেরই জনমতের প্রতিভূ বলিয়া গণ্য করিবার অধিকার জন্মে। কিন্তু জনমতকে অনুকূল করিবার অনেক সময়ই যে-সকল অন্তরায় উপস্থিত হয়, জনসাধারণের সেগুলির সম্মুখে একান্ত অসহায়। এই বিক্ষিপ্ত শক্তি অসংবদ্ধ ও বিক্ষিপ্ত থাকার সুযোগেই জনগণ স্বাধীনভাবে নির্বাচিত তাহাদের প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দেয়, এইরূপ একটা আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার প্রচলন করা সম্ভব হইয়াছে।

জনমত কোন অলৌকিকের নিয়মে পরিচালিত হয় না। যে-সকল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় শক্তি ও সংস্কার দ্বারা সমাজ ব্যবস্থা পরিচালিত হয়, তাহাই জনমতকেও প্রভাবিত করে। সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থা জনগণকে বাদ দিয়া নয়। কিন্তু এই অসংবদ্ধ ও বিক্ষিপ্ত জনশক্তিকে সংহত এবং সুসংবদ্ধ করার জন্য প্রকৃতপক্ষে কোন চেষ্টাই এপর্যন্ত হয় নাই। বিভিন্ন দলের প্রচার-কার্যের ফলে তাহাদের বৃদ্ধি ও সাফল্যের অনুপাতে এই সকল দল জনশক্তির কিছু কিছু নিজেদের আয়ত্তে আনিতে সমর্থ হয়। যে-দল সর্বাপেক্ষা বেশী অংশ দখল করিতে সমর্থ সেই দলই জনগণের প্রতিভূরূপে রাষ্ট্রশক্তি দখল করেন। কিন্তু সমগ্র জনশক্তি সংহত ও সুসংবদ্ধ হইয়া আত্মসচেতন হইয়া উঠিতে পারে, তাহা হইলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষে জনশক্তিকে লইয়া এইরূপ টানাটেঁচড়া করা আর সম্ভবপর হইবে না। এই কাজ করিবে কে? কোন একটি রাজনৈতিক দল নিশ্চয়ই। কিন্তু সংগঠনের কাজে বর্তমান রাজনৈতিক দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিবেই। গবর্মেণ্ট এবং রাজনৈতিক দলগুলি যে পর্যন্ত জনমতের উপর চাপ দিবার সর্বপ্রকার অসৎ উপায় বর্জন না করিবেন, ততদিন জনমতকে সংগঠিত করার কোন চেষ্টাই সফল হইবে না। স্বাধীনতা লাভের পরে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সরকারী কোন কার্যের সমালোচনা করিলেই উহাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। একথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, গবর্মেণ্ট এবং রাষ্ট্র এক নয়। যে রাজনৈতিক দল যখন ক্ষমতা লাভ করেন, তখনকার মত সেই দলই গবর্মেণ্ট এবং সরকারী কাজের সমালোচনার জন্য বিরোধী দল থাকা আইন সঙ্গত এবং গণতন্ত্রের পক্ষে অপরিহার্য। গবর্মেণ্টকে রাষ্ট্র বলিলে গণতন্ত্রকেই অস্বীকার করা হয় এবং জনশক্তিকে সংহত করিয়া জনমতকে আত্মসচেতন করিয়া তোলাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। প্রকৃত পক্ষে গবর্মেণ্টও একটা রাজনৈতিক দল মাত্র। রাষ্ট্রশক্তি হাতে পাইয়া তাঁহারা যদি অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির জনমত গঠনের কাজে বাধা সৃষ্টি করেন, তাহা হইলে জনগণের প্রকৃত অভিপ্রায় জানিবার পক্ষেই বাধা সৃষ্টি হইয়া থাকে।

পার্থিব কল্যাণের মূলে রয়েছে

অর্থশক্তি

অর্থশক্তির প্রয়োগে প্রধান সহায়

কাগজ

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স লিমিটেড

কাগজ, ছাপার কালি, লেখন সামগ্রী ও মুদ্রণ সম্ভার বিক্রেতা

"ভোলানাথ ধাম" ঃঃ ৩৩-২, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

ফোন : বড়বাজার ৪১৭৪ টেলিগ্রাম : "পেপারসেপার" কলিকাতা

শাখা

১৩১, পুরাতন চিনাবাজার ঃঃ ৬৪, হারিসন রোড, কলিকাতা

৫৮, পটুয়াটুলি, ঢাকা

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য পরিস্থিতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

ভারতবর্ষকে কৃষিপ্রধান দেশ বলা হয়। এদেশের শতকরা ৭০ জন লোক প্রত্যক্ষভাবে এবং শতকরা ১৫ জন পরোক্ষভাবে কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু ভারতের কৃষিব্যবস্থা এখনও অটুলন শতাব্দীতে পড়িয়া আছে। আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য পরিচালিত হয় না বলিয়া ভারতবর্ষে শস্য উৎপাদনের হার অত্যন্ত কম। ঐ বিষয় লাভাল অরগুল তাঁহার 'দি গান্ধীয়ান প্ল্যান' গ্রন্থে (পৃঃ ৬২) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতি একর জমিতে উৎপাদনের নিম্নলিখিত হিসাব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই হিসাব হইতেই ভারতের অবস্থার শোচনীয়তা উপলব্ধি করা যাইবে :—

প্রতি একর জমিতে উৎপাদন
(পাউণ্ড হিসাবে)

দেশ	ধান	গম	আখ	তুলা
যুক্তরাষ্ট্র	২,১৮৪	৮১২	৪০,২৭০	১৬৮
জাপান	৩,৪৪৪	১,৭১০	৪৭,৫০৪	১২৬
মিশর	২,৯৯৮	১৯১৮	৭০,৩০২	৪০৫
চীন	১,৮৭৩	৩৭৯	—	১০৪
ভারতবর্ষ	১,১৮০	৬৯০	৩০,১৯০	৮৯

অথচ অধ্যাপক ভারতে বৎসরে ৬ কোটি ১০ লক্ষ টনের মত খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হইবে এবং ভারতে উৎপন্ন হইবে মোট ৫ কোটি ৮০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য। ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার পর পূর্ববঙ্গ, সিন্ধু এবং পশ্চিম পাঞ্জাবের উর্বরা ও সেচব্যবস্থার সুবিধাসম্পন্ন জমিগুলি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় খাদ্যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা অত্যন্ত অসহায় হইয়া পড়িয়াছে। পাকিস্তানের প্রয়োজন বৎসরে ১ কোটি ৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের, পাকিস্তানে বৎসরে গড়পড়তা উৎপাদন হইতেছে ১ কোটি ২০ লক্ষ টন। কাজেই পাকিস্তানে যে ১৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত হইতেছে ; সেই ১৫ লক্ষ টন ঘাটতি মিটিতেছে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের হিসাবে। সুতরাং অথচ ভারতের ঘাটতি ৩০ লক্ষ টন ও পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত ১৫ লক্ষ টন, একুনে এই ৪৫ লক্ষ টনই এখন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গড়পড়তা বাৎসরিক ঘাটতি। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত সরকার খাদ্যশস্য সম্পর্কে তাঁহাদিগকে পরামর্শাদি দিবার জন্য স্যার সুকোয়োরদাস টাকুরদাসের সভাপতিত্বে একটি খাদ্যশস্য নীতি নির্ধারণ কমিটি গঠন করিয়াছিলেন, সেই কমিটির মত যে মাসে প্রকাশিত হইবার বিদেশে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এই ৭৫ লক্ষ টন ঘাটতির কথা ঘোষণা করিয়াছেন। খাদ্যের বেশন ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারতের গ্রামাঞ্চলের লোকের দৈনিক ১৬ আউন্স ও সহর অঞ্চলের লোকের দৈনিক ১২ আউন্স খাদ্য হলে নিম্নতম প্রয়োজন ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ৩৩ কোটি লোকের জন্য বৎসরে প্রয়োজন হয় ৫ কোটি ৬৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের। খাদ্যশস্য নীতি নির্ধারণ কমিটি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বৎসরিক উৎপাদন অনুমান করিয়াছেন মাত্র ৫ কোটি ৯৯ লক্ষ টন। বলা বাহুল্য ভারত সরকারকে এই বিপুল পরিমাণ ঘাটতি পাকিস্তান ও অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি পৃথিবীর উদ্বৃত্ত দেশসমূহ হইতে আমদানী করিয়া

দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস ঃ— ৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।

স্থাপিত—১৯২২

অনুমোদিত মূলধন ---------- ২,০০,০০,০০০ টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন ---------- ১,০০,০০,০০০ ,,
আদায়ীকৃত মূলধন (অগ্রিম আদায়ী নয়) --- ৮০,৭২,০০০ ,,
সংরক্ষিত তহবিল ---------- ৩১,০০,০০০ ,,
আমানত ---------- ১৪,৭৫,০০,০০০ টাকার উর্দ্ধে
কার্য্যকরী মূলধন ---------- ১৭,৩০,০০,০০০ টাকার উর্দ্ধে

(৩১শে চৈত্র, ১৩৪৪, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৪৮ পর্য্যন্ত হিসাব)

কলিকাতাস্থ অফিসসমূহ :—৮, নেতাজী সুভাষ রোড, ১১২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ২৯-এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ১৪৭-বি, বহুবাজার ষ্ট্রীট, ১৩৯-বি, বেন্টিঙ্ক রোড এবং ২১০।১-এ, বাসবিহারী এভিনিউ (দক্ষিণাঞ্চলীয় শাখা)

ঃ অন্যান্য শাখাসমূহ ঃ

বোম্বে	চট্টগ্রাম	গৌহাটী	কৃষ্ণনগর
কলবাদেবী (বোম্বে)	চাঁদপুর	জোরহাট	লাহিনা
বরিশাল	জামতাড়া	ময়মনসিংহ	পাইমারিটী
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ঢাকা	নারায়ণগঞ্জ	পুরাণবাজার
ভাগলপুর	ধুবড়ী	সিরাজগঞ্জ	রাজসাহী
ভৈরববাজার	ফেনারন	শ্রীহট্ট	ঝিনাইদহ
বাঁকুড়া	ঝিনেপড়	সাবনা	মজফরপুর
মুন্সিগঞ্জ	মাজাজ	বর্দ্ধমান	যোশোর
			মেদিনীপুর

সর্বপ্রকার বৈদেশিক আর্থিক বিনিময়ের কার্য্য করা হয়।

বৈদেশিক এজেন্টসমূহ :

লণ্ডন—মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ ; আমেরিকা—গ্যারান্টী ট্রাষ্ট কোং অফ নিউ ইয়র্ক ; ফ্রান্সিসো—ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্, সিডনী, ক্যালকাতা—মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক (ওভারসীজ) ; ইষ্ট এফ্রিকা—মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক (ই, সি, ও) ; করাচী—ইণ্ডিয়ান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, সিইচ ডি (ইকন), লণ্ডন, ব্যারএট-ল।

পূরণ করিতে হইতেছে। অন্তঃপক্ষে যুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্ষকে বৎসরে গড়ে ৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য যোগাইত, উহাদের অবস্থা স্বাভাবিক হয় নাই বলিয়া তাহা হইতে এখনও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ চাউল আমদানী হইতেছে না। সম্প্রতি তাহার সরকারের খাদ্য-সচিব শ্রীজয়রামদাস দৌলতরাম গত অল্প কয়েক বৎসর বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে কি পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানী হইয়াছে তাহার একটি হিসাব দিয়াছেন। এই হিসাবে দেখা যায় ভারতে বিদেশ হইতে ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে ৭ লক্ষ ৬০ হাজার টন, ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে ১ লক্ষ ১০ হাজার টন, ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে ২১ লক্ষ টন ও ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে ২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দৌলতরাম জানাইয়াছেন যে, ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে আমদানীর পরিমাণ যাহাতে লক্ষণীয়রূপে বৃদ্ধি পায় তাহার সরকার বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এই আমদানীর জন্য ভারত সরকার ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে ৮০ কোটি টাকা ও ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে ১০০ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন। আমদানীর গতি লক্ষ্য করিয়া খাদ্য-সচিব অনুমান করিতেছেন এ বৎসর (১৯৬৮) ভারত সরকারকে বিদেশ হইতে খাদ্য-আমদানীর জন্য ১২০ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইবে। এখন যে একেবারে বিনা বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করাই এক কথাটি, ইহা হইতে উপরে অনুমানে আমদানীর হাহিসাব লইয়াই তাহার সরকারের বিলম্বুক্তি হইতেছে না। বিদেশী খাদ্যশস্য এখানে আসিতে যে খরচ পড়িতেছে, এখানকার বাজারে খাদ্য বিক্রয় করিয়া সেই খরচ তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিলে দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের অতিমূল্যের দরুণ নিদারুণ অসুবিধা ভোগের সম্ভাবনা; এই জন্যই তাহার সরকার এখন খাদ্যশস্য আমদানীর হিসাবে বৎসরে গড়ে ২০ কোটি টাকার মত লোকসান দিয়া চলিয়াছেন।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দের মন্বন্তরের সময় ভারতবর্ষ যেরূপ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, সেই দুর্গতির কথা সারা জগতে সুপ্রচারিত হয়। এই প্রচারের ফলে আন্তর্জাতিক খাদ্য বোর্ড (International Food Board) ভারতবর্ষের ব্যাপারে বিশেষ সহানুভূতিশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন। ভারতে এখনও বিদেশ হইতে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানী হইতেছে তাহার পরিমাণ কম নয়। কিন্তু ভারতবর্ষ যদি অদূর ভবিষ্যতে নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া যাইতে না পারে, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক খাদ্য বোর্ডের নিকট হইতে চিরকাল এইভাবে নিয়মিত সাহায্য পাওয়া সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে সারা পৃথিবীতেই এখন খাদ্যের টানাটানি চলিতেছে। ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন শতকরা ৭ ভাগ কমিয়াছে অথচ এই সময়ে পৃথিবীতে লোক বাড়িয়াছে ৬ কোটি। আরও দুশ্চিন্তার হইতেছে, যে সব দেশে বর্তমানে খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত হয়, সেইগুলি হইতেও আশানুরূপ পরিমাণ খাদ্যশস্য বাহিরে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা যাইতেছে না। সাধারণের জন্য এই সব দেশে আগের তুলনায় এখন অনেক বেশী খাদ্যশস্য ব্যবহার করিতেছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের রিপোর্টেই বলা হইয়াছে যে, খাদ্য রপ্তানীকারী দেশগুলিতে উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পাইতেছে সত্য, কিন্তু ঐ বর্ধিত খাদ্যের একটি বড় অংশ ঐ সকল দেশেই ব্যবহৃত হইতেছে। ফল এই হইয়াছে যে, কতকগুলি দেশ যুদ্ধের আগের তুলনায় শতকরা ১৫ ভাগ বেশী খাদ্য ব্যবহার করিতেছে, পক্ষান্তরে বহু দেশ আগের হিসাবে এক-তৃতীয়াংশ কম খাদ্য পাইতেছে। এইভাবে ৩ অংশ খাদ্যাভাবের ফলে এই সব দেশের অধিবাসীদের শরীর নিস্তেজ হইয়া দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। অভাব বর্তমানে শুধু ভারতবর্ষের নয়, পৃথিবীতে আরও অনেক অভাবগ্রস্ত দেশ রহিয়াছে। আন্তর্জাতিক খাদ্য প্রতিষ্ঠানের উপর যেরূপ প্রভাব প্রচুর, কাজেই ইয়োরোপের বৃহত্তর দেশগুলির প্রয়োজন না মিটাইয়া ভারতের অভাব চিরকাল মিটান হইবে, এইরূপ আশা করা বাতুলতা। ভারতবর্ষে খাদ্যশস্যের বার্ষিক অভাব এখন ৪৫ লক্ষ টন, পক্ষান্তরে পৃথিবীর বাৎসরিক ঘাটতি ১ কোটি ৮০ লক্ষ টন। এই বিশ্বব্যাপী খাদ্য সমস্যার খুব শীঘ্র যে একটা সন্তোষজনক সমাধান হইবে এমন আশাও দেখা যাইতেছে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ গত ১লা আগষ্ট এক বিজ্ঞপ্তিতে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, পৃথিবীতে খাদ্যাভাব এখনও অন্ততঃ দু'বৎসর থাকিবে। অভাবগ্রস্ত দেশগুলির দুর্ভাগ্যের সুযোগ লইয়া উদ্বৃত্ত দেশসমূহের মুনাফাবৃদ্ধি যাহাতে চলিতে না পারে তজ্জন্য গত মার্চ মাসে আন্তর্জাতিক গম-পরিষদ (International Wheat Council) একটি পাঁচ বৎসরের মেয়াদী আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র রচনা করিয়াছেন এবং এই চুক্তিপত্রে সহিত বিজড়িত আছে পৃথিবীর বিভিন্ন ৩৩টি জাতি। এই চুক্তিপত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার গমের সর্বোচ্চ দর প্রতি বুশেল ২ ডলারে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। চলতি বাজার দর অপেক্ষাও এই সর্বোচ্চ দর কম বলিয়া চুক্তিপত্র প্রকাশিত হইবার পর সকলেই এজন্য সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে একথা মনে রাখিতেই হইবে যে, রপ্তানীযোগ্য খাদ্যশস্যের দর কমান দুর্গত দেশের পক্ষে যত কল্যাণকরই হউক না কেন, আসলে এই সব দেশগুলির অভাব দূরীকরণে তাই প্রচুর পরিমাণ খাদ্যের। আগেই বলা হইয়াছে উদ্বৃত্ত দেশগুলি এখন যুদ্ধের আগের তুলনায় অনেক অধিক পরিমাণ খাদ্যশস্য ব্যবহার করিতেছে, ইহার উপর খাদ্যশস্য রপ্তানী করিয়া যদি বেশী লাভের সম্ভাবনা না

খাতে তখন হয়তো এই সব দেশের খাদ্য উৎপাদনকারীদের বিদেশে খাদ্য রপ্তানে উৎসাহের অভাব ঘটিবে। এইভাবে শেষ পর্যন্ত রপ্তানীর পরিমাণ কমিয়া গেলে সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এখনও পর্যন্ত ভারতে বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী মোটের উপর ভালই চলিতেছে, সমস্যাটি দীর্ঘদিনের বলিয়াই আন্তর্জাতিক খাদ্য পরিস্থিতি দেখিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় ঘাটতি দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মনে আশঙ্কা জাগে।

বলা নিষ্প্রয়োজন, ভারতের খাদ্য পরিস্থিতির উন্নতির জন্য ভারত সরকার ও ভারতীয় চুক্তি সম্প্রদায় যদি উদ্যোগী না হন, তাহা হইলে এদেশের অভাব মিটিবার পরিবর্তে ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে। বর্তমানে এদেশে বৎসরে ৫০ লক্ষ হিসাবে লোক বাড়িতেছে, অথচ উৎপাদনের নিম্নগতি অনুসারে ফসল উৎপাদন ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী দিল্লীতে বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিবর্গকে লইয়া যে খাদ্য-প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেই সম্মেলনের সভাপতি তৎকালীন অন্তর্বর্তী সরকারের খাদ্য-মন্ত্রী ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেন যে, অবস্থা এইরকম ভাবে চলিতে থাকিলে ১৯৯১ খৃষ্টাব্দে ভারতে ঘাটতির পরিমাণ ৭০ লক্ষ টন দাঁড়াইবে। পৃথিবীতে উদ্বৃত্ত দেশের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে, নানা রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক কারণে উদ্বৃত্ত দেশসমূহ হইতেও রপ্তানীযোগ্য খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিতেছে, ইহার উপর ভারতের খাদ্যাভাব কমিবার পরিবর্তে ক্রমশঃ বাড়িয়া গেলে পরিস্থিতির গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়।

এক্ষেত্রে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্যাভাব ঘুচাইবার ভার ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকেই অবশ্য নিজের হাতে লইতে হইবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতীয় কৃষিব্যবস্থার উন্নতি হইলে অর্থাৎ পতিত জমিতে চাষের ব্যবস্থা সহ কৃষিকার্যে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক রীতির প্রবর্তন হইলে এদেশেই খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াইয়া ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির খাদ্যশস্যবিষয়ক শাখা সমিতি ভারতের খাদ্যপরিস্থিতির উন্নতিকল্পে একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। এই পরিকল্পনায় তাঁহারা বলেন যে, তাঁহাদের পরামর্শে ও সরকারের অর্থানুকূল্যে এদেশে রাসায়নিক সার ও পশুখাদ্য উৎপাদনে যদি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়, তাহা হইলে পাঁচ বৎসরের মধ্যেই ভারতে আড়াই হইতে তিন কোটি টন খাদ্যশস্য বাড়ান সম্ভব। উপরিউক্ত ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের দিল্লী সম্মেলনে ভারত সরকারের তৎকালীন খাদ্য-মন্ত্রী ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদও পঞ্চবার্ষিকী একটি কৃষি পরিকল্পনার উল্লেখ করেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে, তাঁহার এই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ হইলে এদেশের সামগ্রিক উৎপাদনেই ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের সম্ভাব্য ৭০ লক্ষ টন ঘাটতি পূরণ হইয়া যাইবে। তাঁহার পরিকল্পনায় ছোট বা বড়ের কথা বলা হইয়াছে তাহার শতকরা ২৫ ভাগ কেন্দ্রীয় সরকার, শতকরা ২৫ ভাগ প্রাদেশিক সরকার ও শতকরা ৫০ ভাগ কৃষককে দিতে হইবে।

আগেই বলা হইয়াছে, ভারতের খাদ্যশস্যের উন্নতির জন্য ভারত সরকার ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাসকে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির সদস্য ছিলেন শেঠ ঘনশ্যামদাস বিড়লা, স্যার শ্রীরাম, ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া, ঠাকুর শীতলাবক্স সিং, মিঃ তুলেন উইয়ার, ডাঃ বি কে আর ভি রাও, মিঃ আর এ গোপালস্বামী প্রভৃতি অর্থনীতিবিদ। এই কমিটি যে রিপোর্ট বিভিন্ন রাজ্যের ভারতীয় কৃষির উন্নতিসাধনের বিপুল সম্ভাবনার কথা স্পষ্ট স্বীকৃত হইয়াছে এবং পাঁচ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষকে খাদ্যের দিক হইতে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিবার অনেকগুলি মূল্যবান পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। কমিটি আশা করেন ভারতের পতিত জমিতে যথাসম্ভব চাষ-আবাদ এবং কৃষিব্যবস্থা আধুনিক রীতিতে পরিচালিত হইলে এদেশে পাঁচ বৎসরের মধ্যে ঘাটতি এক কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদন মোটেই কঠিন নয়। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ ৩ কোটি ৫২ লক্ষ একর এবং পাকিস্তানে এইরূপ জমির পরিমাণ ২ কোটি ৯০ লক্ষ একর। কাজেই শুধু পতিত জমিতে চাষের

ব্যবস্থা করিয়া ভারতে অন্ততঃ ৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি বাহিরে পাঠাইতে পারে। এজন্য কৃষিনীতিতে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক রীতির প্রবর্তন হইলে তো কথাই নাই। জাপানী চাষীরা ভারতীয় চাষীদের হিসাবে ১/৮ ভাগ জমি চাষ করে। কিন্তু ফলন তোলে ২ ভাগ। জাতীয় সরকারের আমলে কৃষির উপর একান্ত নির্ভরশীল এই দেশের কৃষিনীতির দ্রুত উন্নতি অবশ্যই আশা করা যায়।

অবশ্য বর্তমানে জরাগ্রস্ত হইলেও ভারত সরকার এদেশের কৃষিব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য এখন যেরূপ আগ্রহ দেখাইতেছেন তাহা স্থায়ী ও ফলপ্রসূ হইলে অনেক কাজ হইবে বলিয়া মনে হয়। তাহাতে ২৫টি নদনদীর সামগ্রিক বহুবিধ উদ্দেশ্যমূলক (Multi-purpose Projects) পরিকল্পনা কার্যকরী হইতে চলিয়াছে। এইসব পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে ভারতে ১ কোটি ৯০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে এবং বাড়তি ফসল জন্মাইবে ৪০ লক্ষ টন। ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিতে অধিকতর উৎকৃষ্টভাবে সহিত চাষ আবাদ করিলে বৎসরে বাড়তি ৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন। দুর্ভোগপ্রসূত খাদ্যনীতি বিচারের কমিটির রিপোর্টে এইভাবে কৃষিসংস্কারের জন্য কাজ সরকারের ৪০ কোটি টাকা মূলধন লইয়া একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। ভারতে অধিকতর খাদ্য উৎপাদনের জন্য ভারত সরকার ১৯৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে একটি পঞ্চবার্ষিকী আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়াছেন। এখনও এই আন্দোলনের উদ্দেশ্যোপযোগী ফল পাওয়া না গেলেও আশা করা যায় পাঁচ বৎসরে এই পরিকল্পনার যথেষ্ট সুফল ফলিবে। এই উপলক্ষে ১৯৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ প্রথম বৎসরে, কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য হিসাবে ২ কোটি টাকা এবং ঋণ হিসাবে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। মনে হয় প্রাদেশিক সরকারসমূহও এই পরিকল্পনায় আলোচ্য বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকারের সম-পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়াছেন।

উপযুক্ত পরিমাণ চেষ্টা ও আগ্রহ থাকিলে ভারতের কৃষিব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া আগামীর মধ্যেই যে এদেশকে খাদ্যের হিসাবে স্বাবলম্বী করিয়া তোলা যায়, এবিষয়ে বর্তমান ভারত সরকারও আশাবাদী। গত ৮ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে ভারত সরকারের খাদ্য-কৃষি মন্ত্রণালয়ের দৌলতরামের সভাপতিত্বে প্রাদেশিক খাদ্য-সচিবদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে খাদ্য-সচিব তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন—"দৃঢ় সংকল্প লইয়া যদি অগ্রসর হওয়া যায় এবং সেইসঙ্গে যদি যথেষ্ট আর্থিক সচ্ছলতা ও সংগঠন শক্তি থাকে, তাহা হইলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ খাদ্যসম্পর্কিত বর্তমান উদ্বেগ হইতে মুক্তি পাইবে। তবে এই অবস্থায় পৌঁছাইতে হইলে কৃষিব্যবস্থার গুরুত্ব স্বীকার করিয়া আমাদের জাতীয় পরিকল্পনায় উহার মূল্যোবর্দ্ধিতা মানিয়া লইতে হইবে। কৃষি-সম্পদ আমাদের শিল্পোৎসাহ ও জাতীয় শ্রীবৃদ্ধির ভিত্তিস্বরূপ।" *

* "I have no doubt that, with determined effort backed by adequate financial support and organizational efficiency, India can before long free itself from anxiety in regard to food. But to enable India to achieve this result, agriculture must be allowed to come into its own and receive the priority it deserves in our nations plans. Agricultural wealth is the basis of our industrial activity and national prosperity."

সপ্তর্ষি চিত্রমণ্ডলী লিমিটেডের
—প্রথম চিত্রার্ঘ্য—
"যার যেথা ঘর"
—কাহিনী—
শ্রীনিতাই ভট্টাচার্য্য
—সঙ্গীত—
শ্রীপ্রতাপ মুখোপাধ্যায়
—পরিচালনা—
শ্রীছবি বিশ্বাস
—রূপায়ণে—
মীরা সরকার, সরযূবালা, রেণুকা রায়, কুমারী কেতকী, পাহাড়ী সান্যাল, সন্তোষ সিংহ, মনোরঞ্জন, শ্যাম লাহা, সমর মিত্র, অচিন্ত্যকুমার ও ছবি বিশ্বাস।
—কর্ম্মসচিব—
অচিন্ত্যকুমার
—ব্যবস্থাপনা—
গোরা গুপ্ত

শিল্প ও রাষ্ট্র

অধ্যাপক শ্রীনীরেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম-এ

জনসাধারণের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধির বিধান তথাই শিল্প ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। রাষ্ট্রের উপরেও জনসাধারণের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, উভয়ের উপরেও যখন বিভিন্ন, তখন উহাদের সম্বন্ধের ক্ষেত্রও সীমাবদ্ধ। বস্তুতঃ প্রাচীন যুগে শিল্পের সহিত রাষ্ট্রের পরোক্ষ সম্বন্ধ অতি সামান্যই ছিল। শিল্পী, কারিগর ইত্যাদি শ্রেণীর লোক নিজ নিজ জাতিগত বৃত্তি হিসাবে শিল্প পরিচালনা করিতেন, তাহাতে যে আর্থিক ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিত তাহার মধ্যে রাষ্ট্রের স্থান ছিল নিতান্ত অধিকের লোকের মতো—শিল্পব্যবস্থার অন্তর-মহলে রাষ্ট্রের প্রবেশ করিবার প্রয়োজন হইত না। রাষ্ট্রের প্রয়োজন হইত বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে নিজের দেশকে রক্ষা করিবার সময়ে, কিংবা আভ্যন্তরীণ অশান্তি দমন করিবার জন্য কিন্তু শিল্প-ব্যবস্থাকে গড়িয়া তুলিতে কিংবা চালনা করিতে রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজনই ছিল না। গ্রামের কুটির শিল্প গ্রামের সীমার মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিত, তাহার উৎপন্ন দ্রব্য গ্রামের অধিবাসীরাই কিনিয়া লইত, শিল্পীর সর্ববিধ প্রয়োজন মিটাইবার দায়িত্বও গ্রামবাসীরাই গ্রহণ করিত। শহরের শিল্প অবশ্য গ্রামাঞ্চলের শিল্প অপেক্ষা সমৃদ্ধ ছিল, তাহার উৎপন্ন দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয়ও হইত অধিক পরিমাণে, কিন্তু তাই বলিয়া রাষ্ট্রের সহায়তা গ্রহণ করিবার বিশেষ প্রয়োজন তাহারও ছিল না। অবশ্য শহরের শিল্পীকে নিজের শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্য রাজা-রাজড়ার দরবারে উপস্থিত হইতে হইয়াছে, কোনো সময়ে রাজার অত্যাচার চরমে উঠিলে তাহা প্রতিরোধ করিবার জন্য তাহাকে 'সঙ্ঘ' গঠন করিতে হইয়াছে এবং মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে শহরের শিল্পীকে গ্রামের কুটির শিল্পীর তুলনায় অনেক অধিক পরিমাণে রাষ্ট্রের সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রভাব শিল্পের উপর বেশীদিন স্থায়ী কিংবা সর্বব্যাপী হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাহা নিতান্ত মতো অল্প কয়েক শিল্পব্যবস্থাকে আঘাত করিয়াছে কিংবা আদর করিয়াছে বটে, কিন্তু রাজার মতো সবল শিল্পকে শাসন করিতে চেষ্টা করে নাই। শিল্পব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রশাসন ভিন্ন ভিন্ন পথেই চলিয়াছে; কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুই পথ এক হইয়াছে, কিন্তু পরক্ষণেই তাহা আবার পৃথক হইয়া গিয়াছে। শিল্পের গতিপথ শিল্পী কিংবা কারিগর নিজেই আঁকিয়া লইয়াছে, রাষ্ট্র প্রধানতঃ শাসন ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজেই ব্যস্ত রহিয়াছে।

ক্রমশঃ এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। শিল্পের আকার বিস্তৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, দেশ বিদেশে মাল চলাচলের সুবিধা বাড়িবার ফলে, শিল্পের প্রকৃতিতে এক বিপ্লব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এখন শিল্পকে বিপুল পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ করিতে হয়, বিপুল সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করিতে হয়, বিপুল পরিমাণে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিতে এবং উৎপন্ন মাল কাটাইবার জন্য বহু দূরদেশে ক্রেতার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। আধুনিক শিল্পে উৎপন্ন দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় কেবল একটি-মাত্র দেশে সীমাবদ্ধ নয়, তাহা বিদেশের বাজারেও বিস্তৃত। এই সকল কারণে, এক দিকে যেমন শিল্প ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল পরমুখাপেক্ষী লোকের সংখ্যা বাড়িয়াছে, অন্য দিকে শিল্পকেও বহু অনিশ্চিত সম্ভাবনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইতেছে। আজ-কাল এক একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে হাজার হাজার শ্রমিকের স্থান নির্দিষ্ট হয়, শিল্পের মালিককে এই সকল শ্রমিকের কল্যাণের জন্য সর্ববিধ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয় এবং যে সকল ক্ষেত্রে মালিক শ্রমিকগণের মঙ্গলের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অক্ষম কিংবা অনিচ্ছুক, সেই সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকেই বাধ্য হইয়া এই উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। ইংলণ্ডের ইতিহাসে দেখিতে পাই, শিল্পের উপর রাষ্ট্রের অধিকার বিস্তার করিবার প্রথম প্রয়োজন হইল শ্রমিকের স্বার্থ বিধান করিবার জন্যই। যখন বহু-সংখ্যক শ্রমিকের স্বার্থ এক দল শিল্পপতির দ্বারা অবহেলিত হইতে লাগিল, তখন সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বেই রাষ্ট্রকে নামিয়া আসিতে হইল শিল্পের ক্ষেত্রে। শিল্প ও রাষ্ট্রের মধ্যকার ব্যবধান ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইবার লক্ষণ দেখা দিল।

শিল্পের পরিধি বিস্তৃত হইবার ফলে আরও অনেকগুলি গুরুতর সঙ্কটের সৃষ্টি হইল। প্রথমতঃ, বিদেশের শিল্প আসিয়া দেশের শিল্পব্যবস্থার মর্মমূলে আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইল। ফলে দেশের শিল্পী, কারিগর, বহুত কর্মহীন হইয়া পড়িবার আশঙ্কা দেখা দিল। এ অবস্থায় রাষ্ট্র আর শিল্পকে এক পাশে ফেলিয়া রাখিতে পারিল না। দেশের ক্রমীভূত অর্থনৈতিক সঙ্কট দূর করিবার জন্য রাষ্ট্রকে বাধ্য হইয়া শিল্পের শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইতে হইল। বিদেশী শিল্পের অবাধ প্রতিযোগিতা হইতে দেশের শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্রকে শিল্প-সংরক্ষণ নীতির প্রবর্তন করিতে হইল।

দ্বিতীয়তঃ, শিল্পের আকার বাড়িয়া যাইবার ফলে অধিক পরিমাণে মূলধন সংগ্রহের প্রয়োজন ঘটিল। কিন্তু নূতন নূতন শিল্পে মূলধন যোগাইবার লাগিয়া প্রবল করিবার মতো লক্ষ্যসিদ্ধির লোকের অভাব। কাজেই রাষ্ট্রকে মূলধন সরবরাহের ক্ষেত্রেও নামিয়া আসিতে হইল। জনসাধারণের বিভিন্ন সঞ্চয়কে একত্রিত করিয়া শিল্পকে সুবিধা ও উন্নত করিবার জন্য ব্যাঙ্কিংয়ের সাহায্য গ্রহণ করা অনেকে আবশ্যক মনে করিতে লাগিলেন। জনসাধারণকে উপযুক্ত কর্মসংস্থান করিয়া দিবার জন্য এবং তাহাদের জীবিকা-মান উন্নত করিবার জন্য রাষ্ট্রের পক্ষে শিল্পব্যবস্থার ভার লওয়া ভিন্ন উপায় ছিল না। শিল্পের মূলধন সংগ্রহ করিয়া দিবার দায়িত্ব রাষ্ট্রকে গ্রহণ করিতে হইল।

তৃতীয়তঃ রাষ্ট্রকে শিল্পের শ্রমিক আরও অনেক সম্বন্ধে অধিক চিন্তা করিতে হইল। দেখা গেল, বিপুল আয়তনের শিল্পে অবাধ প্রতিযোগিতা বেশী দিন চলিতে পারে না। এইরূপ প্রতিযোগিতার ফলে বড় শিল্প ছোট শিল্পগুলিকে গ্রাস করিয়া একাধিপত্য স্থাপন করে। নিজের লাভের জন্য বৃহৎ শিল্প উৎপাদন-ব্যবস্থাকে কমাইয়া করিয়া আনে, ফলে শিল্পের যে সামাজিক উদ্দেশ্য, অর্থাৎ জনসাধারণের সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান, তাহা আর আধুনিক বৃহৎ শিল্পের সাহায্যে সুসম্পন্ন হইতে পারে না। যতদিন বহু সংখ্যক ছোট, বড়, মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে, ততদিন প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য থাকে অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিয়া অধিক লাভ করা। কিন্তু একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বৃহৎ শিল্প কম চড়াইয়া দিয়া অধিক লাভের ব্যবস্থা করে—তাহার আর অধিক উৎপাদন করিবার আগ্রহ কিংবা প্রয়োজন থাকে না। ফলে জনসাধারণ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের জন্য অধিক দর দিতে বাধ্য হয়, অথচ তাহাদের জীবিকামান ক্রমশঃ নিম্নগামী হইতে থাকে। শিল্পব্যবস্থা একাধিপত্যমূলক হইয়া ওঠে,—এক শ্রেণীর শিল্পপতি নিজেদের লাভের জন্য শিল্পব্যবস্থাকে সঙ্কুচিত, সমাজবিদ্বেষ ও উন্নতিবিহীন করিয়া রাখে। যে রাষ্ট্র জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিয়া দিবার জন্য দায়ী, তাহার পক্ষে এই অবস্থা সঙ্কুচিত শিল্প-ব্যবস্থাকে বিনা প্রতিবাদে সহ্য করা অসম্ভব।

সেই জন্য শিল্পব্যবস্থা যাহাতে উহার প্রাথমিক উদ্দেশ্যের অনুগামী হয়, জনসাধারণের আর্থিক সমৃদ্ধি যাহাতে মুষ্টিমেয় শিল্পপতির অনাবশ্যক লাভলিপ্সায় বাধা অকারণে বাধাপ্রাপ্ত না হয়, তাহার জন্য রাষ্ট্রকে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নীতি হইল একাধিপত্য স্থাপনে বাধা দিয়া এরূপ অবস্থার উদ্ভব হইতে না দেওয়া। কিন্তু আধুনিক শিল্পের গতিই যখন একাধিপত্যের দিকে, তখন এই ধরণের চেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হইয়া যায়। তখন রাষ্ট্রকে একেবারে লোকসৃষ্টি শিল্পের আসরে অবতীর্ণ হইতে হয়, যাহাতে কেন পরিত্রাণ করিয়া তাহাকে ধরিতে হয় শিল্প-নায়কের বেশ।

শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার এই শেষ বাণীটি খুব সহজ নয়। যে সকল শিল্পপতি শিল্পব্যবস্থা পরিচালনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা বিনা প্রতিবাদে রাষ্ট্রের এই হস্তক্ষেপ সহ্য করিয়া যাইবেন, ইহা যেরূপ আশা করা যায় না, সেইরূপ শিল্পপতিগণের অসন্তোষকে অগ্রাহ্য করিয়া রাষ্ট্রের পক্ষে শিল্পব্যবস্থাকে করায়ত্ত করাও তত সুখের কথা নয়। বস্তুতঃ, শিল্প-পতিদের অসন্তোষকে অগ্রাহ্য করিতে হইলে বোধ হয় সমস্ত অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থাই বিপর্যস্ত হইয়া যাইবে। সুতরাং শিল্পকে রাষ্ট্রের অধীন করিবার চেষ্টা সমাজবিপ্লবের নামান্তর মাত্র।

তাহা ছাড়া, শিল্পকে রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে রাখিবার পথে আরও অনেকগুলি বড় বাধা রহিয়াছে। আধুনিক শিল্পের আকার এরূপ বিপুল, এবং শিল্পনীতি এত জটিল যে, উহাকে সর্বদা চোখে চোখে রাখা রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থার যাহা প্রাথমিক উদ্দেশ্য, অর্থাৎ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা, রাষ্ট্রের গঠন ও পদ্ধতিরা তাহার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। রাষ্ট্রের পক্ষে শিল্পজগতে প্রবেশ করার অর্থ তাহার ঐ নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিসমূহ হইতে বিচ্যুত হওয়া। রাষ্ট্রের পরিচালনা এবং শিল্পের পরিচালনা, দুইটি দুই পৃথক জগতের বস্তু। রাষ্ট্রীয় কর্ম-সচিবদের পক্ষে তাহাদের শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কার বজায় রাখিয়া শিল্প পরিচালনার কর্তব্য পালন করা অতি দুরূহ ব্যাপার।

শিল্প পরিচালনার জন্য যে সকল বিশেষ গুণের প্রয়োজন হয় তাহার মধ্যে উদ্ভাবন বা নিত্য নূতন পথের সন্ধান অন্যতম প্রধান। আধুনিক কালে শিল্পনীতি অহরহ পরিবর্তিত হইতেছে। যাহারা এই পরিবর্তনের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারে, তাহারাই শিল্প-জগতে টিঁকিয়া থাকিবার ছাড়পত্র লাভ করে। কিন্তু রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে উদ্ভাবন শিক্ষা করিবার সুযোগ অতি অল্প। রাষ্ট্র পরিচালনা শক্তি সংরক্ষণের নামান্তর মাত্র। সুতরাং যাঁহারা রাষ্ট্রের কর্ণধার, তাঁহারা শিল্পের ক্ষেত্রেও রক্ষণশীল এবং যথাযথপদ্ধতিরক্ষার প্রয়াসী হইয়া ওঠেন। যে প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া শিল্পপতি নিত্য নূতন পথের সন্ধান করিয়া বেড়ায়, রাষ্ট্রের নিকটে ঐ সকল প্রেরণার বিশেষ কোনো মূল্য নাই। কিন্তু যতদিন শিল্পপতির অধীনে থাকে, ততদিন নূতন প্রণালী অবলম্বনের জন্যে যে খরচপত্র হয়, তাহাতে শিল্পপতিরই লাভ। কিন্তু শিল্পকে রাষ্ট্রের অধীনস্থ করিয়া দিলে ঐ লাভের প্রেরণা আর তেমনভাবে কাজ করিতে পারে না, বরঞ্চ নূতন শিল্পনীতি অবলম্বন করিবার যে সকল আনুষঙ্গিক অসুবিধা তাহাই রাষ্ট্রকে নূতনত্বের প্রয়াস হইতে বিরত রাখে।

শিল্প পরিচালনার জন্য যে ধরণের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার আবশ্যক, রাষ্ট্রের কর্মচারীদের মধ্যে তাহা আশা করা বৃথা। সেইজন্য শিল্প-ব্যবস্থার পরিচালনা এক ধরণের বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীর হাতে ন্যস্ত করা আবশ্যক হয়। এই কর্মীদিগকে কেবল শিল্পনীতি বা টেক্‌নিক্ সম্বন্ধে অবহিত হইলেই চলিবে না, ইহারা যদি শিল্পের উন্নতি ও বিকাশ সম্বন্ধে পরিপূর্ণ শক্তির সচেতনভাবে গ্রহণ না করে, তাহা হইলে শিল্পব্যবস্থা নিতান্ত স্থাণু হইয়া পড়িবে। সেক্ষেত্রে শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার সুফল আশা করা যায় না।

সুতরাং প্রশ্ন হইতেছে, শিল্পপতিগণের ব্যক্তিগত লাভের প্রেরণাকে ঠেলিয়া ফেলিলে, তাহাদের পক্ষে শিল্পের পরিপূর্ণ বিকাশের সর্ববিধ দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভবপর এবং স্বাভাবিক কিনা। অনেকের মতে, আধুনিক যুগে রাষ্ট্রের মর্যাদা এত বেশী যে, প্রত্যেকটি বৃহৎ শিল্পকে একটি জাতীয় সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে পারিলে উহার দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্যে যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের অভাব হইবে না। আবার অনেকের ধারণা, যে ব্যক্তিগত লাভের আশা শিল্পপতিকে উদ্ভাবনের প্রেরণা যোগায়, সেই লাভের উপর হস্তক্ষেপ করিলে তাঁহারা শিল্পব্যবস্থাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, সে অবস্থায় রাষ্ট্রের কর্মচারীদের পক্ষে শিল্পব্যবস্থার হাল ধরিয়া বসা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। এ প্রশ্নের কোনো মীমাংসা করা যায় না। এ কথা সত্য যে, রাশিয়ার মতো পরিপূর্ণ সমাজতন্ত্রবাদী দেশেও শিল্প-সংগঠককে অতিরিক্ত মর্যাদা দিতে হইয়াছে; ম্যানেজার এবং ফোরম্যান শ্রেণী রাশিয়ার সমাজে অভিজাত। কিন্তু রাষ্ট্র ব্যবস্থা তাহাদের লাভলিপ্সাকে সংযত করিয়াছে, এ কথাও সমান সত্য। সুতরাং সাধারণ অর্থনীতি ও শিল্পের দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম সংগঠক—এই দুই শ্রেণীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকিলেও, কেবলমাত্র অভাব লাভের প্রেরণা থাকাই শিল্পব্যবস্থাকে বাঁচাইয়া রাখা চলে, এ কথা যুক্তির দ্বারা বলা যায় না। আবার, ব্যক্তিগত লাভের প্রেরণা যেরূপ সকলক্ষেত্রেই কার্যকরী, সেইরূপ অন্য কোনো কার্যকরী প্রেরণার সন্ধান আমরা এ পর্যন্ত পাই নাই, ইহাও স্বীকার্য। তবে প্রত্যেক সমাজেই অন্য ধরণের অল্পস্বল্প প্রেরণার কাজ করিতে থাকে। রাশিয়াতে ইহা বিপ্লবকে স্থায়ী করিবার প্রেরণা, ইংলণ্ডে ইহা শ্রমিক-দলের শাসনকে কায়েম করিবার প্রেরণা, সেইরূপ ভারতবর্ষে ইহা আর্থিক স্বাধীনতা গড়িয়া তুলিবার প্রেরণারূপে কাজ করিতে পারে। এই ধরণের কোনো প্রেরণার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইলে শিল্পপতিগণ লাভের মাত্রা সংযত করিয়াও রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে নিজ নিজ যোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু অসুবিধা এই যে, এ ধরণের প্রেরণা সকল দেশে, সকল সময়ে কার্যকরী হইয়া ওঠে না। সেইজন্য শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার অপরিহার্য প্রাথমিক সর্ত হইল, এই ধরণের কোনো প্রেরণাকে কাজে লাগানো যাইতে পারে কিনা, তাহার অনুসন্ধান।

বস্তুতঃ শিল্প পরিচালনার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাকে গণনার মধ্যে না আনিয়া যাঁহারা শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার কথা ভাবেন, তাঁহারা শিল্পব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যবর্তী গুরুতর ব্যবধানটির কথা ভুলিয়া যান। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, পুলিশ বা সৈন্যদলের দ্বারা শিল্পকে পাহারা দেওয়া চলে বটে, কিন্তু শিল্পকে চালু রাখা যায় না। আধুনিককালের জটিল ও প্রসারশীল শিল্পব্যবস্থাকে রাষ্ট্রযন্ত্রের লোহার কাঠামোর মধ্যে ধরিয়া রাখা অসম্ভব। সেইজন্য রাষ্ট্রশাসন ও শিল্পশাসনকে দুইটি পৃথক পথেই চলিতে দিতে হইবে। অথচ শিল্প শাসনের ভার যাহাদের হাতে, তাহারা যাহাতে শিল্পের মূল উদ্দেশ্য সাধনে ব্যাঘাত না ঘটায়, তাহার ব্যবস্থাও রাষ্ট্রকেই করিয়া দিতে হইবে। যে সকল শিল্প একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তাহাতে প্রতিযোগিতাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য রাষ্ট্র কতকগুলি সমান্তরাল প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিতে পারে। কিংবা শিল্পপতিগণের নিকট হইতে শিল্পের আংশিক মালিকানা রাষ্ট্র কিনিয়া লইতে পারে। অনেকক্ষেত্রে এই সকল উপায়ে জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করা যতটা সম্ভব, পরিপূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্তকরণ (nationalisation) দ্বারা তাহা সম্ভব হয় না। সেইজন্য নীতি হিসাবে রাষ্ট্রায়ত্তকরণকে গ্রহণ করিবার পূর্বে অন্য উপায়ের কথাও রাষ্ট্রকে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে।

পূজা-মাঙ্গলিক
সব চাইতে আজকের দিনে সকলের অন্তর ছাপিয়ে উঠছে কাউকে কিছু দেওয়ার আনন্দ। সকল দেওয়ার শ্রেষ্ঠ দেওয়া,— শত্রুকে ক্ষমা, প্রতিপক্ষে সহিষ্ণুতা, বন্ধুকে হৃদয়ের প্রীতি, সন্তানকে সদ্দৃষ্টান্ত, পিতাকে শ্রদ্ধা, মাতাকে সন্তানের চরিত্র-গৌরব, নিজেকে সম্মান এবং মানুষ মাত্রকেই ভালবাসা,— আর প্রিয়পরিজনকে পূজার সর্বোৎকৃষ্ট উপহার হিন্দুস্থানের বীমাপত্র।
হিন্দুস্থান
কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড.
৭নং, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

গণ বনাম গণতন্ত্র

গোপাল ভৌমিক

স্বাধীন ভারতকে আমরা ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃত গণতন্ত্র করে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছি। আমাদের জাতীয় নেতাদের প্রতিনিয়ত এই কথা বলতে শুনি—আমাদের পত্র-পত্রিকাতেও প্রতিনিয়ত এ নিয়ে আলোচনা হয়। দাবী-দাওয়া ও আশা-আকাঙ্ক্ষার অন্ত নেই—কিন্তু তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া যে কত কঠিন সে কথাটা আমরা অনেকেই ভেবে দেখি না। কিংবা ভেবে দেখলেও তার সম্বন্ধে যতটা সজাগ হয়ে কথা বলা আবশ্যক ততটা সজাগ হয়ে কথা বলি না। স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে আমরা যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আদর্শ প্রচার করতাম তার আর কোন মূল্য না থাক প্রচার-মূল্য ছিল অনেকখানি। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের আহ্বানে সহজেই জন-মানসে সাড়া জাগত। আজ সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটেছে ভারতের বুকে; তাই প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব আমাদের বেড়ে গেছে শতগুণ। আজ মৌখিক প্রচারের প্রয়োজন ততটা নেই—যতটা প্রয়োজন দেখা দিয়েছে প্রকৃত কাজের। আর স্থায়ী ভিত্তিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজটা যে কথার চেয়ে অনেক বেশী কঠিন আশা করি এটা বুঝতে আর কষ্ট হবে না। জাতীয় জীবনের চতুর্দিকে চেয়ে আজ এই কার্যক্ষেত্রেরই অভাব যেন বেশী করে চোখে পড়ছে এবং সেইটেই প্রকৃত দুঃখের কথা।

গণতন্ত্র কথাটির মূলগত অর্থ অনুধাবন করলেই বোঝা যায় যে, 'গণ' বা সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার নিবিড় সংযোগ। কোন ব্যক্তি বিশেষ বা দল বিশেষ ইচ্ছা করলেই কোন একটা দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেন না। এর জন্যে চাই দেশের সমগ্র অধিবাসীদের উপযুক্ত প্রস্তুতি। তা নইলে কাগজে কলমে গণতন্ত্র স্থাপিত হলেও সে গণতন্ত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না এবং তার ফলে সে জিনিসটি বাস্তবও হয়ে ওঠে না। নামে গণতন্ত্র পৃথিবীর অনেক দেশেই প্রচলিত আছে কিন্তু কার্যত দেখা যায় যে, তাদের শাসনব্যবস্থা যেভাবে চলে তার সঙ্গে রাজতন্ত্রের বিশেষ কোন ব্যবধান নেই। সেই আমলাতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি—সেই দলবিশেষের বা ব্যক্তি বিশেষের একাধিপত্য। নীচের জনগণ যেন রোগী আর উপরে যাঁরা বসে আছেন তাঁরা যেন ডাক্তার। তাঁরা উপর থেকে যা নির্দেশ করে দিচ্ছেন নীচের জনগণকে তাই গ্রহণ করতে হচ্ছে ঔষধ বা পথ্যরূপে। এটা আর যাই হোক, একে গণতন্ত্র বলতে মন চায় না। এ অবস্থা অস্বাস্থ্যকর এবং গণতন্ত্রবিরোধী। উপরতলা এবং নীচেরতলার ব্যবধান ঘোচাতে না পারলে সমাজে ও রাষ্ট্রে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। প্রকৃত গণতন্ত্রে সমাজের প্রতিটি মানুষকে এক একটি শক্তিকেন্দ্র বলে মনে করা উচিত। তাদের কোন স্তরের চেয়ে কোন স্তরের শক্তি কম নয়। এই সব শক্তিকেন্দ্রকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে মূল গণতান্ত্রিক কাঠামো। এর ব্যতিক্রম হলেই বুঝতে হবে যে, সে গণতন্ত্র ভুয়া ও অর্থহীন।

অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনায় আমাদের দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজ আরও কত বেশী কঠিন ও কষ্টসাধ্য সে কথাটা আমরা ভেবে দেখি না। আমাদের দেশ নিয়ে আমরা অনেক গৌরব করে থাকি, অনেক অহঙ্কার করে থাকি। গৌরব ও অহঙ্কারের অনেক কিছু আমাদের আছে এ কথাও সত্যি। কিন্তু সেই সঙ্গে অগৌরবের যা কিছু আছে তা আমরা নির্বিঘ্নে ভুলে যাই। কয়েক হাজার বৎসরের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও সভ্যতাই আমাদের একমাত্র পরিচয় নয়। সেই সঙ্গে বেশ কিছুকালের পরাধীনতা যে আমাদের দেশকে দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন করে রেখে গেছে এ কথাটা আমরা ভুলে যাই। যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বড়াই আমরা করি তা কি সমাজের শতকরা মাত্র দশজন ভাগ্যবান ও ভাগ্যবতীরই কুক্ষিগত নয়? তাকে যদি সমাজের সকলের সম্পদরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারি তবে তার সার্থকতা কোথায়? আমাদের দেশে স্থায়ী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অর্থ হল সে গণতন্ত্রে সমাজের প্রতিটি নরনারীর সক্রিয় অংশ গ্রহণ। অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও দারিদ্র্যে যে সমাজের অন্ততঃ ৯০ জন নরনারী মুহ্যমান সেখানে প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কি করে সম্ভব? যে দেশের জনগণ আমাদের দেশের তুলনায় অনেক গুণে বেশী শিক্ষিত ও সংস্কারমুক্ত সে দেশেও আমরা গণতন্ত্রের মুখোস পরে ফ্যাসিজম বা এক-নায়কত্বের আবির্ভাব হতে দেখি। আমাদের দেশে সেরূপ সম্ভাবনা আরও কত বেশী তা সহজেই অনুমেয়। গণতান্ত্রিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে জনগণকে হতে হবে সমাজতন্ত্রে—সমাজচেতন। এর জন্যে প্রয়োজন হল উপযুক্ত পরিবেশ ও গণতান্ত্রিক শিক্ষার। আমাদের দেশে এ দুটি মৌলিক জিনিসেরই যে অভাব, আশা করি এ বিষয়ে আমার সঙ্গে কেউ দ্বিমত হবেন না।

এর থেকে কেউ যেন না মনে করেন যে ভারতবর্ষে প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সংগঠন বিষয়ে আমি নৈরাশ্যবাদী। আদৌ তা নই—তা যদি হতাম তবে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করতাম না। ভারতের কল্যাণকামী প্রতিটি রাজনীতি-সচেতন নরনারীর মত আমিও চাই যে, ভারতবর্ষে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক। কিন্তু তার জন্যে যে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজন তারই যেন অভাব দেখতি চার-দিকে। সেই পরিবেশ কি করে সৃষ্টি করা যায় তাই হল আমার প্রধান আলোচ্য। প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভারতে যে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপিত হবে—স্বাধী ভারতের শাসনতন্ত্রে তা প্রায় একপ্রকার স্থিরীকৃত হয়ে গেছে। কিন্তু সেইটেই কি একমাত্র প্রশ্ন? প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার প্রবর্তিত হলেই কি আমাদের সমাজ জীবনের যত কিছু আধিব্যাধির অবসান ঘটবে? তা যদি ঘটত তবে সেটা নিঃসন্দেহে সুখের বিষয় হত। কিন্তু সে সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার পৃথিবীর অনেক স্বাধীন দেশেই আছে। কিন্তু তাই বলে সে সব দেশে সাম্য, ন্যায় ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিংবা সে সব দেশের জনগণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে এমন কথা বলা চলে না। সেখানেও দারিদ্র্য আছে, আছে বেকার সমস্যা, অশিক্ষা ও কুশিক্ষা—গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে আছে জনগণের সীমাহীন নির্লিপ্ত ঔদাসীন্য। আমাদের দেশেও যাতে তার পুনরাবৃত্তি না ঘটতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে—তা নইলে আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সংগঠনের আদর্শ স্বপ্নেতে পর্যবসিত হবে।

আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপনের যে নমুনা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় যে, আমাদের প্রবর্তিত গণতান্ত্রিক আদর্শ শেষ পর্যন্ত অঘটনাদের দুঃস্বপ্নেই পরিণত হবে। আমাদের যে সব দেশনেতা পরাধীনতার আমলে গণশক্তিকেই তাঁদের শক্তির সকল আধার বলে বর্ণনা করতেন, দেশ স্বাধীন হবার পর তাঁরাই যেন গণশক্তি সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে উঠেছেন। তাঁদের অনেকেরই আজ আমরা 'গণ'-কে বাদ দিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অসম্ভব প্রয়াস করতে দেখছি। তা যদি না হত, তবে আজ দেশের গণশক্তিকে বাদ দিয়ে স্বাধীন ভারতের স্থায়ী শাসনতন্ত্র গড়ে তোলার চেষ্টা চলেছে কেমন করে? স্বাধীন ভারতের স্থায়ী শাসনতন্ত্র আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অন্যান্য দশটা স্বাধীন দেশের গণতান্ত্রিক

শাসনতন্ত্র পর্যালোচনা করে একটা শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করলেই তা আমাদের দেশের উপযোগী হয়ে উঠবে না কিংবা তার দ্বারা আমাদের দেশে পূর্ণ গণতন্ত্রেরও প্রতিষ্ঠা হবে না। শাসনতন্ত্রে প্রকৃত গণ-প্রতিষ্ঠা করতে হলে তার সঙ্গে জনতার আপামর জন-সাধারণের যোগাযোগ স্থাপনের প্রচেষ্টা সর্বাগ্রে করা প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় সেই চেষ্টাই হচ্ছে না। শাসনতন্ত্র রচনার মত এতবড় একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ প্রায় নিঃশব্দে সম্পন্ন হয়ে গেল—তা নিয়ে জন-মানসে আদৌ না কোন প্রতিক্রিয়া, তাদের তরফ থেকে এলো না পরিবর্তন কিংবা সংশোধনের কোন দাবী। একে আমি কোনক্রমেই সুস্থতার লক্ষণ বলে মনে করতে পারি না। কিন্তু জন-মানসের এই যে নিশ্চিন্ত ঔদাসীন্য এর জন্যে কি বহুলাংশে আমাদের জাতীয় নেতৃত্বই দায়ী নয়? জনগণের যে এ ব্যাপারে আদৌ কোনরূপ অধিকার আছে, তারা যে নিজেদের সৃষ্টিমূলক কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা এর মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করতে পারে এ বোধে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার কোন চেষ্টাই করেন নি আমাদের নেতারা। তাঁরা শুধু জনগণকে বলেছেন শান্তশিষ্ট ভদ্র হয়ে থাকতে। যা কিছু করার তাঁরাই করবেন, জনগণ শুধু তাঁদের কাজে সমর্থন জানিয়ে যাবে—তবেই আমাদের দেশে প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে—এই হল তাঁদের অভিমত। কিন্তু এই উপর থেকে চাপানো জিনিসকে প্রকৃত গণতন্ত্রের মর্যাদা আমরা কিছুতেই দিতে পারি না।

আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রজীবন থেকে শুধু মাত্র একটি উদাহরণ এখানে দিলাম। এরূপ আরও অনেক উদাহরণ উপস্থাপিত করা যায়। সর্বত্রই দেখি সেই একই প্রয়াস—উপরতলা থেকে নীচুতলার জীবনের উপর পরিসমাপ্ত কোন কিছু চাপানোর প্রয়াস। কিন্তু প্রকৃত গণতন্ত্রের উৎপত্তি সমাজ-জীবনের উঁচুতলাতে নয়—তার উৎপত্তি নীচুতলাতে। নীচের তলার সক্রিয় সমর্থন ও জাগ্রত কর্মপ্রয়াস যেখানে না থাকে সেখানে গণতন্ত্র সার্থকনামা হয়ে উঠতে পারে না। পৃথিবীর সর্বত্রই উপরতলার অধিবাসীরা হল সংখ্যালঘু আর নীচেরতলার অধিবাসীরা হল সংখ্যাগুরু। আমাদের দেশও এর ব্যতিক্রম নয়। উপরতলার মুষ্টিমেয় লোক নীচের তলার অগণিত জনগণের জীবন নিয়ন্ত্রণ করবে—এ কখনও গণতন্ত্রসম্মত হতে পারে না। দেশ যখন স্বাধীন ছিল না তখন এ ব্যবস্থা হয়ত হোক, অনিচ্ছায় হোক আমাদের মেনে নিতেই হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে এ আশা আমরা করেছিলাম এবং আমাদের সে আশার মধ্যে অন্যায় কিছু ছিল না। দুঃখের বিষয় স্বাধীনতা অর্জনের পর ঘটনার গতি যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তাতে মনে হয় যে, আমাদের সে আশা হয়ত বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করার সুযোগ পাবে না। ঘটনার গতি দেখে মনে হয় আমরা যেন বিপরীত মুখেই চলেছি। উত্তরাধিকার সূত্রে যে শাসনযন্ত্র আমরা পেয়েছি তার সিভিলিয়ানী স্বরূপ কার্যত গণতন্ত্র-বিরোধী। জনকল্যাণের জন্যে তাকে পরিবর্তিত করবার কোন সুযোগই আমাদের হয়নি বরং আমরাই যেন সে শাসনযন্ত্রের প্রয়োজনে বদলে চলেছি। জাতীয় জীবনে পূর্ণ গণতন্ত্রের বিকাশের পথে এর চেয়ে বড় বাধা আর কি হতে পারে? প্রতিটি মানুষকে তার অন্তর্নিহিত জীবনেষণা অনুযায়ী আত্ম-বিকাশের সুযোগ দিতে হবে, তার স্বচ্ছন্দ জীবিকার্জনের সম্বন্ধে দিতে হবে নিশ্চয়তা—যে কোন আদর্শ গণতন্ত্রের এই হল মূল কথা। আমাদের জাতির জীবনে আজ এই দুটি জিনিসেরই সর্বাধিক অভাব দেখা যাচ্ছে না কি?

তাই 'গণ' দিয়ে গণতন্ত্রের কথাটা আজ আমাদের দেশের প্রতিটি চিন্তাশীল রাজনীতিকেরই ভেবে দেখবার সময় এসেছে। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখতে গেলে 'গণে'র সঙ্গে গণতন্ত্রের কোন বিরোধই নেই বরং উভয়ের সঙ্গে আছে গভীর যোগাযোগ। 'গণ' ছাড়া গণতন্ত্র হতে পারে না একথা আমরা সবাই বুঝি। কিন্তু কার্যত আমরা দেখি কি? দেখি 'গণ'কে বাদ দিয়েই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন। বহু বিচিত্র একটা মতলবগোষ্ঠীকে নিয়েই সমাজ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা। সকল মানুষ মূলতঃ এক হলেও তারা এক নয়। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই আছে প্রতিটি মানুষের ব্যবধান। তাই মানুষ সম্বন্ধে আজও এমন কোন সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করা হয় নি যা পদার্থ বিজ্ঞান বা রসায়ন বিজ্ঞানের সূত্রাবলীর মত ব্যাপক ও সর্বজন গ্রাহ্য। রাষ্ট্রনেতৃত্ব যাঁদের হাতে থাকে, সাধারণতঃ দেখা যায় যে, তাঁরা এই বহু-বিচিত্র মানুষের মাঝে মানুষকে উপেক্ষা করেই সে সব পরিচালনা করে থাকেন। তাঁদের নিজেদের মধ্যে যে তত্ত্ব বুদ্ধি বা কলাকৌশল থাকে তাঁরা অবশ্য তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই এ কাজ করেন। কিন্তু Good government is no substitute for self-government কথাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। অন্যের মত ধারণা, শাসনপ্রণালী ও প্রজাতন্ত্রের উপরি কিংবা একনায়কত্ব যদি এ যুগের পাওয়া যায়, তবু কি আমরা গণতন্ত্রের পরিবর্তে তাকেই চাইব? চাইব না যে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

পশ্চিম বঙ্গের মোট জনসংখ্যা ছাব্বিশের কোটী। তাহার মধ্যে ৭৩ লক্ষ লোক সরকারকে বাস করিয়া থাকে। এ প্রদেশের লোকদের জন্য বৎসরে বিভিন্ন শ্রেণীর যে ধান্য ফসল প্রয়োজন, পশ্চিম বঙ্গে তাহার উৎপাদন বৎসরে মোট ৬ লক্ষ টনের মত কম হইতেছে।

আমরা চাই এমন গণতন্ত্র যে গণতন্ত্র গণস্বার্থের বিরোধী নয়, যে গণতন্ত্রের নিয়ামক হবে জাতিধর্মনির্বিশেষে জনগণ, যে গণতন্ত্রে উচ্চ নীচ ভেদাভেদ থাকবে না, যে গণতন্ত্র প্রতিটি মানুষকে বাঁচবার সমান অধিকার দেবে।

ভারতে এরূপ আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করতে হলে আজ দেশের প্রতিটি মানুষকে নিজের নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বার্থ সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠতে হবে—সঙ্গে সঙ্গে দেশের দারিদ্র্য পীড়িত অশিক্ষিত জনগণকে গণতান্ত্রিক অধিকারবোধে উদ্বুদ্ধ করে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে তাঁদের। একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, নীচের তলার মানুষের চাপ পুরাপুরি বজায় রাখতে না পারলে প্রতি পদে গণতান্ত্রিক আদর্শ ক্ষুণ্ণ হবার সমূহ আশঙ্কা। জাতীয় নেতাদের কিংবা রাষ্ট্রনায়কদের আশ্বাসে আমরা যেন নিজেদের অধিকারবোধ হারিয়ে ফেলে নিষ্ক্রিয় না হয়ে উঠি। নিষ্ক্রিয়তা অপমৃত্যুরই নামান্তর। জাতীয় জীবনে নিষ্ক্রিয়তার অর্থই হল গণতন্ত্রের অবসান। আমরা ভারতকে যেন সেই দুর্দৈবের মুখে ঠেলে না দেই।

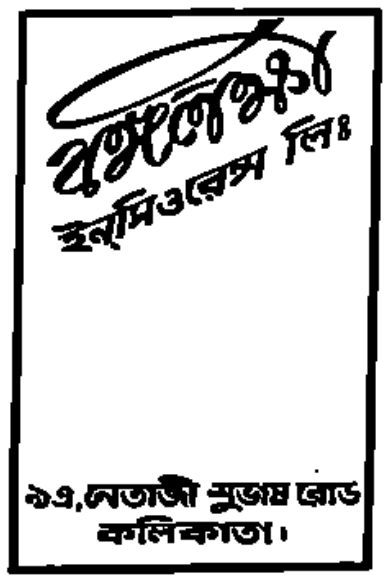

ডলারের ফাঁদ ও আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা •

শ্রীহেমেন্দ্র দত্ত

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ [illegible]রের ঢক্কানিনাদ বন্ধ হইবার অনেক আগে নানা দেশের পুঁথিগত অর্থনীতিবিদ্‌গণকে এই মতলব করিতে শুনা গিয়াছিল যে, মানব সমাজ উৎপাদন ব্যবস্থার অসাধারণ লাভলাভ করিয়াছে, কিন্তু বণ্টন ব্যবস্থায় দেখাইয়াছে মারাত্মক অপটুতা। এই বণ্টন বৈষম্য জগতে অনেক অনর্থ সৃষ্টি করিতে পারে অনেকেই তখন এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন (অবশ্য টীকা হইতে মহাযুদ্ধ বাধিবে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী কেহই করে নাই। যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে আজ তিন বছর, অনেক গলদ-ঘামের পর বিশ্ব অর্থনীতি-ক্ষেত্রে। বিপর্যস্ত বণ্টনব্যবস্থাও একসঙ্গে হাত মিলাইবার প্রয়োজনের তাগিদে। অনেক মাথা একত্র হইয়া গড়িয়াছে নূতন নূতন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। এই সবের মধ্যে সেরাদলী করিয়া আসিতেছে যুক্তরাষ্ট্র। আমেরিকা আজ প্রায় সকলের উপর মুরুব্বিয়ানা চালে কথা বলিতেছে। যাদের উপর মুরুব্বিয়ানা চাল চলে না তাদের বিরুদ্ধে নানারূপে বিষেষ প্রচার করিতে ত্রুটি বোধ করিতেছে না।

কিছুকাল আগে ভারতস্থিত আমেরিকান্ রাষ্ট্রদূত ডাক্তার গ্রাডী কলিকাতায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি ভারতের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী এবং তিনি ভারতের অকর্মণ্যতা ও বহির্বাণিজ্যের উত্তরোত্তর হ্রাসবৃদ্ধি কামনা করেন। এই জন্যই তিনি চান যে ভারতের বিরুদ্ধমুখ দৃষ্টি লাভ করে এবং ভারতবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। বিশেষ করিয়া বহির্বাণিজ্যের উন্নতির জন্য ভারত গভর্নমেণ্টের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে। সংক্ষেপতঃ, পৃথিবীর বহুদেশ এবং তাহার বহু উৎপাদনের বিপক্ষে পতিত। বলার সঙ্কট বলিয়া কিছু নাই। আসল সঙ্কট হইল উৎপাদন সঙ্কট। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রকারান্তরে রাশিয়াকে উল্লেখ করিয়া বলেন যে, একটা দেশ অন্যান্য বড় দেশ সমূহের সাহায্য না পাইলে বাণিজ্য পৃথলে আবদ্ধ হইত। আর সেই দেশ আজ কেবল দূরে সরিয়া দাঁড়ায় নাই, সাহায্যকারীদের মিলিত অগ্রগতি প্রতিহত করিতেছে।

পশ্চিমের এই জ্ঞানী ব্যক্তির উদ্দেশ্যমূলক বক্তৃতার বিশ্লেষণ ভারতীয় স্বার্থের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। আমরা পৃথিবীর জাতি-সমূহের মুখে নানা রকম ভাষণ এখন শুনিব। আমেরিকা আজ যে বিশ্বের বন্ধুত্বের কথা আমাদিগকে শুনাইতেছে তাহার উৎস সন্ধান করিয়া দেখিতে গেলে অনেক প্রাসঙ্গিক কথা আসিয়া পড়িবে এবং তাহাতে আমেরিকান্ বন্ধুত্বের আসল রূপ ধরা পড়িবে।

৪৪টি দেশের প্রতিনিধি হিসাবে ১৯০ জন অর্থনীতি শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ গড়িয়াছেন আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক। মুদ্রা তহবিলের লোকের কথা ধরা হইল

• লেখক কর্তৃক সর্ব স্বত্ব সংরক্ষিত।

এডাম্ স্মিথের অবাধ বাণিজ্য (Free Trade of the Adam Smith Variety) অথবা তার আধুনিক সংস্করণ আটলাণ্টিক চার্টার প্রদত্ত অবাধ বাণিজ্য।(১) মুদ্রা তহবিলের প্রধান উদ্দেশ্য হইল আন্তর্জাতিক চলতি লেন-দেনে স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বৃদ্ধি সাধন করা। অথচ মুদ্রা তহবিল চালু হওয়ার এক বছরের মধ্যে দেখা দিল ডলার-সঙ্কট (Dollar Scarcity)। বৃটেন আমেরিকার বিরুদ্ধে ঘুরিয়া দাঁড়াইতে জোর তলাইয়া দিয়াছে। দুইটা বড় দেশের সম্পর্ক এই। কোথায় গেল চলতি লেনদেনের স্বাচ্ছন্দ্য, কোথায় রহিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বৃদ্ধি সাধন ?

ইউনাইটেড্ কিংডাম আমেরিকার নিকট হইতে মোটা রকমের ঋণ গ্রহণ করিয়াও আজ অর্থনৈতিক সঙ্কটে পতিত। দারুণ অভাব তার চলার পথে। আর এই অভাব পূরণ করার জন্য তাহাকে সহিতে হইবে অনন্ত দারিদ্র্য এবং পদে পদে অপমান। কেহ কেহ আর একটু রস লাগাইয়া বলিতেছে যে, ইউনাইটেড্ কিংডাম হইবে যুক্তরাষ্ট্রের ৪৯তম ষ্টেট। এদিকে ভারতের এখন বৃটেনের কাছে যথেষ্ট টাকা পাওনা রহিয়াছে। এই টাকাটা কবে কিভাবে কিরিয়া পাওয়া যাইবে তাহা আজ পর্যন্ত নির্ণয় করা হয় নাই। ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতানুসারে ইচ্ছা বৃটেনের কেমন কিছু আছে কিনা এখন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। এই পরিস্থিতিতে আমেরিকা ভারতকে ঋণজালে আবদ্ধ করিতে উৎসাহী হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডাঃ গ্রাডী বলিয়াছেন যে, আমেরিকার বড় বড় ধন দান করিয়া সেই সবের নূতন নূতন মেয়াদ বাড়াইবার কোনও ইচ্ছা নাই। এদিকে মার্কিনী ডলার জাল বিস্তার করিবার প্রয়াস ও নূতন নূতন ফন্দি আজ কাল আর ঢাকা পড়িয়া থাকিবার অবস্থায় নাই। চতুর চূড়ামণি ডাঃ গ্রাডী আমাদিগকে ধীরে ধীরে কোথায় নিয়া যাইতে চান তাহা আমাদের বুঝিয়া দেখা দরকার। তিনি তাঁহার কিন্নোমেলীতে শাঁস দেখাইবার জন্য, ঘরে ফিরিয়া গিয়াছেন। অচিরাৎ প্রত্যাবর্তন করিয়া মধুরতম সম্ভাষণ শুনাইলে আশ্চর্য্য হওয়ার কারণ ঘটিবে না।

(১) আটলাণ্টিক চার্টারের স্বাধীনতা চতুষ্টয়ের একটি হইল যে, কোনও কোনও দুই দেশের মধ্যে বিশেষ অর্থনৈতিক চুক্তি করা চলিবে না। প্রত্যেক দেশেরই অন্যের বাণিজ্য ও তাহার মালের উপর সমান অধিকার থাকিবে।

নিজের অবের টাকা বৃটেনের ব্যাঙ্কে আটক পড়িয়া থাকা সত্ত্বে পরের নিকট হইতে কর্জ্জ নিলে আমাদের কি কি লোকসান হইবে তাহা একটু বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার। আমাদের টাকা আমাদের হাতে ফিরিয়া আসিলে বেইমানে মূলধন খাতে একটা মোটা রকমের নিরপ্ত ক্রেডিট্ হ্যালেন্স পাকিস্তানের নিকট হইতে ধার নিতে চইলে সেই জায়গায় আসিয়া পড়িবে একটা অ্যাসিটেন্স লোন্। আসল টাকা ও সুদ উহার মিলিয়া একটা মিয়াদ বেঁধা ঋণে দাঁড়াইবে। নিজেদের পাওনা ষ্টার্লিং ব্যালেন্স ও তাহার সুদ বাবদ কিছু পাওয়া যাক বা না যাক, কর্জ্জ নেওয়া টাকার সুদ কিস্তিমত চালাইয়া যাইতে হইবে। এই সুদের টাকা পরিশোধ করার জন্য মুদ্রা তহবিল হইতে খুব সত্বর ধার নিতে হইবে এবং তাহার জন্য চড়া সুদও দিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা ভাল যে, আমরা ষ্টার্লিং ব্যালেন্সের উপর "বুক এন্ট্রি" হিসাবে যেই হারে সুদ পাইতেছি—আমরা অপরের নিকট হইতে কর্জ্জ নিলে যেই সুদ দিব এবং ঐ সুদ পরিশোধ করার জন্য যেই সুদ মুদ্রা তহবিলকে দিব—শেষোক্ত সুদের হার পূর্বোক্ত পাওনা সুদের চারের চেয়ে কম পক্ষে ১ (এক) পার্সেন্ট বেশী হইবে এবং কোনও কালে আমাদের ঘরের টাকা ও তার সুদ ফিরিয়া আসিলেও আমাদের মোট লোকসান একটা বিরাট অঙ্কে দাঁড়াইবে। ক্যাপিটেল লোন্ গ্রহণ করার পক্ষে সুদের হের টানা মুদ্রা তহবিলভুক্ত আমাদের চলতি হিসাবেরও দাবড়াবাবে নয় করিয়া ফেলিবে। সুদের টাকার বোঝা ও সুদ পরিশোধের জন্য মুদ্রা তহবিল হইতে কর্জ্জ গ্রহণ—এইরূপ মিয়মানুসারে মুদ্রা তহবিলের চলতি হিসাবের এলাকায় আসিয়া পড়িবে। এবং এই প্রক্রিয়ার মুদ্রা তহবিল ও ভারতীয় মুদ্রার বিনিময় হারের ইকুইলিব্রিয়াম বা ভারসাম্য অবস্থার উপর জোর আঘাত হানিবে—যার ফলশ্রুতি আমরা অচিরাৎ একটা Adverse Balance-ওয়ালা দেশে পরিণত হইবে। এমতাবস্থায় বৃটেনের নিকট হইতে আমাদের পাওনা টাকা আদায় করার জন্য সজোরে চেষ্টা করিতে হইবে। আমেরিকা যদি বৃটেনকে আমাদের টাকা পরিশোধ করার ব্যাপারে সাহায্য করে তাহা হইলে তাহার সহিত্যেক্ষের পরিচয় পাইব, নতুবা আমেরিকার স্বার্থ-বৃদ্ধি সংরক্ষিত হইবে, আমাদের কর্তব্য হইবে এই ফাঁদে পা না দেওয়া। সহিক উহার বিনিময়ে ব্যবসা-চাতুরী "রাজনীতে" পরিণত হওয়ার আশঙ্কা থাকিবে না এমন কথা কেহই জোর করিয়া বলিতে পারে না।

তাঃ প্রোভী বলেন যে, ভারতের বিদেশস্থ প্রসার লাভ করে এবং ভারতবাসীদের জীবন-যাত্রার মান উন্নত হয়। সচিন্তার জন্য ধন্যবাদ। কাগুলিওয়ালাবাবু অনুরূপ মন্তিষ্কা প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু কড়া সুদ-দোলুপতাবিমুক্ত কাগুলিওয়ালার কথা আজও শুনি নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ঢলার সঙ্কট বলিয়া কিছু নাই। এই উক্তির তাৎপর্য এই, "ধরু নাই কর আর চলার বাধ নাই। উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পার না পার, আমরা পরের দেয় দিয়া পাওনা টাকা ফেরত আদায় করিব। দেনেরা কর্জ্জ নেওয়ার ব্যাপারে বৃটেনের পথ অনুসরণ কর। মরাজনো যেতো যেন না পথঃ।"

উহা স্বীকার্য যে, আমাদিগকে উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে সর্বাধিক তৎপর হইতে হইবে। দেশী ও বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিতে হইবে। অনেকের আমাদের মধ্যেই প্রয়োজন হইবে। কিন্তু এই অর্থ লাভের ব্যাপারে সতর্কতাই ও দেশবাসী অনেক কিছু করিতে পারে। বুরোক্রেটিক গভর্নমেন্টের অত্যুৎসাহী রাজকর্মচারীরা, দেশের উপাধিধারীরা ও বিশেষ করিয়া উপাধিলোভীরা মুক্ত-হস্ত সাহায্যের যেরূপ তৎপরতা দেখাইতেছে তাহাতে আমিকটা দেশী সরকারের উৎপাদন-বৃদ্ধি সাহায্য ব্যাপারে দেখাইলেও সমস্যা অনেকটা লোকা হইয়া

যাইবে। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের যদি কিছুমাত্র মূল্য থাকে তাহা হইলে ইহাদের আওয়াজ হইয়া বলা উচিত যে, ভারত তার পাওনা ষ্টার্লিং বালেন্স একটা ন্যায্য হারে পাইতে থাকিবে এবং জগতের বলিষ্ঠ জাতি সমূহ ঋণোদ্ধারকে সাহায্য করিবে ভারতের পাওনা টাকা আদায়ী লম্ব বছরের মধ্যে বার্ষিক কিস্তিতে চুকাইয়া দিবার জন্য। কিন্তু ভারত এখন বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করিতে পারে না অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে। ডাঃ গ্রাডী বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর বহুদেশ ও ভারত খাদ্য উৎপাদনের বিলম্বাদে পতিত। আসলে খাদ্য উৎপাদন কথাটা বেশী নজরে পড়িয়াছে এইজন্য যে, মোট উৎপাদন যতটা না কমিয়াছে, তুলনায় অন্যান্য দ্রব্যের উৎপাদন কমিয়াছে অনেক বেশী। আজও আণবিক বোমার উৎপাদনে ও গবেষণায় বহু শক্তি ও অর্থ ব্যয় হইতেছে। ষ্টীল ও অ্যালুমিনিয়ম অধিকৃত জার্মেনীতে চুক্তি সত্ত্বেও বহু বহু কলকারখানা নানান কারসাজি করিয়া dismantle করা হয় নাই—এরূপ নালিশ শুনা যাইতেছে। সামরিক দ্রব্যের উৎপাদন ইহাই যে আবার দ্রুতগতিতে চলিতে থাকিবে তাহার একাধিক লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে।

খাদ্য উৎপাদন হ্রাসের কারণ—একথা সত্য। কিন্তু বণ্টনবৈষম্য তাহারও দুষ্টের কারণ। বর্তমানে মালিকরা এবং তাহাদের পক্ষ টানিয়া বহু বক্তা বলিয়া আসিতেছেন, "উৎপাদন বাড়াইয়া চল। দেখিবে, সব ঠিক হইয়া গিয়াছে।" মানে, দুষ্টী বলিয়া খুলিয়া পড়। দেখিবে, সব ঠিক হইয়া যাইবে। এদিকে শ্রমিক ও কৃষকদের জীবনযাত্রার মান ক্রমশঃ অবনতির দিকে যাইতেছে। মালিকরা মুনাফা লুটিতে হুকার হইতেছে। মজুতদার ও ব্লোবাজারের কল্যাণে কৃষকরাও বিপন্ন। ইংরেজ আমলের আইন অনুসারে শ্রমিকদের যেই সুযোগ ও সুবিধা পাওয়ার কথা মালিক-পক্ষ তাহাকেও ফাঁকি দিতেছে বিস্তর। নেতারা আশ্বাস দিয়া আসিতেছেন যে, তাঁহারা মালিক ও শ্রমিকের বিরোধ মুচাইতে কৃত-সঙ্কল্প ও কৃতসঙ্কল্প। এই মহৎকার্য সম্পন্ন করিতে পারিলে তাঁহারা সবাই সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

রাশিয়ার উপর পরোক্ষভাবে যেই সব দোষারোপ করা হইয়াছে ঐ সবের সমর্থনে ডাঃ গ্রাডী কোনও ঘটনার উল্লেখ করিতে সমর্থ হন নাই। তাহার কারারও সঙ্গে ঝগড়া করিতে চায় না। কিন্তু আমেরিকার বিশেষ প্রচারের চোটায় যারা না দিলে common friend হিসাবে ভারতের ক্ষতি ঘটিবে। বিশেষ প্রচারে ঝগড়া সৃষ্টি এবং ঝগড়া হইতে যুদ্ধ যারা অস্বাভাবিক নহে। রাশিয়া হাতা বড় বড় দেশগুলি কি কি ভাবে জগতের স্থায়ী শান্তি বাড়াইতে চেষ্টা করিতেছে, এবং রাশিয়া কি কি ভাবে তাহাতে বাধা সৃষ্টি করিতেছে—এই প্রশ্নগুলির সদুত্তর দিতে না পারিলে ডাঃ গ্রাডীর বক্তৃতা মনুষ্য উঠাইয়া নেওয়া আন্তর্জাতিক সাধুতার পরিচায়ক হইবে। মিলিত ছুটের জন্য রাশিয়া যেমন উপকৃত হইয়াছে, তুলনাভাবে উপকৃত হইয়াছে ব্রুটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্স। বস্তুঃ রাশিয়ার অর্থ-সম্পদ বাড়ে ও লোকক্ষয় হইয়াছে সব চেয়ে বেশী। ডাঃ গ্রাডীর এই নিন্দা বাদানুবাদ করা জাতিসমূহের ভবিষ্যৎ মৈত্রী ও জগতের দীর্ঘ-কালীন শান্তির পক্ষে অবশ্য হানিকর। যুদ্ধে লাল আমেরিকার পক্ষে লম্বা চৌড়া কথা বলা স্বাভাবিক হইলেও শোভন নহে। জাতি-সমূহের মধ্যে মন কষাকষি হয় এরূপ কোনও আলোচনায় ভারতের সমর্থন থাকিতে পারে না।

এই লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন গভর্ণর শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী বলেন যে, জগতের জাতিসমূহ মিলিয়া-মিলিয়া না চলিলে স্থায়িত্ব শান্তি স্থায়ী হইবে না। ভারতের এমনভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে যাহাতে তাহার রপ্তানী নোটা রকম বাড়িয়া যায় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারত পাওনাদার হয়। লোকসভায় বিতর্কমূলক আলোচনার কীর্তি আছে কিনা জানি না। তবে দেশবাসিগণকে উৎপাদন বাড়াইবার আহ্বান জানানোর সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ লোক ও গরীবদের ভবিষ্যৎ ভাগ্যের নির্ভরযোগ্য রূপ আঁকা রাজাজীর উচিত ছিল। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে অধিকাংশ আমার আর লোক বাঁচিয়া থাকিতে চাহিবে না। "ইহা" পাইবার জন্য "এইরূপ" কাজ কর, সবিশেষভাবে নেতাদের তাহা বলিতে হইবে। "এইরূপ" কাজ করিলে "ইহা" যাহাতে সাধারণ লোক পায় তাহাও নেতাদের দেখিতে হইবে। দেশের সাধারণ লোক যদি দেখে যে "এইরূপ" করিয়াও সেই তারা কপাল সেই তারা কপাল, অথচ দুষ্টিদের ধনীর ঐশ্বর্য উত্তরোত্তর পর্বতপ্রমাণ হইয়া উঠিতেছে তাহা হইলে লোকের ধর্ম-স্পৃহা ও নির্বাণ লাভ করিবেই অধিকন্তু বিপ্লব ঝঞ্ঝিতে দেশ পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। বিনা রক্তপাতে যেমন স্বাধীনতা মিলিয়াছে, তেমনি বিনা রক্তপাতে যদি অর্থনৈতিক সৌষ্ঠব লাভ ঘটে তাহা হইলে নেতারাই প্রকৃত যশের অধিকারী হইবেন। দুটীলেশ দেওয়া অতি দীর্ঘ অর্থনৈতিক কাঠামোতে জোড়াতালি দিয়া কাজ চালাইবার ভার নেতারা নেন

নিজেরা ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থা বিচার বিশ্লেষণ না করিয়া অভিজ্ঞদিগকে লোকদের স্বার্থপর প্রচারকার্যে বিভ্রান্ত হইয়া আমানত-কারীরা যদি দল বাঁধিয়া যে কোন ব্যাঙ্কের উপর ধাওয়া করিয়া থাকে, তবে অনেক ভাল ব্যাঙ্ককেও তাহারা ফেল করিয়া ছাড়িবে। বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান এইভাবে ফেল পড়িতে থাকিলে তাহাতে বাঙ্গালার ঘোরতর অনিষ্ট সাধিত হইবে। নিজ বাণিজ্যে বাঙ্গালীর আত্মোন্নতির ভিত্তি কসিয়া পড়িবে।

নাই। তাঁহাদের সব জিনিষকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিতে হইবে। তাঁহারা কোটী কোটী দেশবাসীর প্রতিনিধি—যাদের আজ একসঙ্গে প্রয়োজন অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের গরীবকে ঘুষে ঠেকাইয়া রাখিলে দেশের উন্নতির কথায় কাঁকি ও ফাঁক থাকিবে বিস্তর।

বড়ুর দেখাইবার জন্য বড় বিদেশী এখন আসাযোনা করিবে, মিথ্যা বন্ধুত্বের সম্বন্ধে আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থাকে সমপ্রভাবে গ্রহণ করিয়া আত্মমর্যাদাসম্পন্ন প্রয়াস দ্বারা ভারত যেই উন্নতি লাভ করিতে পারিবে, অন্য কোনও উপায়ে তাহা সম্ভবপর হইবে না। বণ্টন ব্যবস্থাকে সামাজিক ন্যায়ের ভিত্তিতে সুদৃঢ়-ভাবে পরিচালনা করিবার ব্যবস্থা না করিয়া কেবল উৎপাদন বাড়াইয়া যাইবার প্রয়াস করিলে আমরা একচক্ষু হরিণের মত বিপদগ্রস্ত হইব। বণ্টন ব্যবস্থা সুদৃঢ় ও সুসম্পন্ন হইলে উৎপাদন, বাড়িবে দ্রুতভালে; আর তারই সাথে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার রাস্তা সুগম হইবে। বণ্টন ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করিলে আমাদের দেশে আসিয়া জুটিবে পাশ্চাত্য অর্থনীতির হাজার রকমের গলদ।

সম্মিলিত-জাতি-পুঞ্জে ব্যক্তির স্থান

অধ্যাপক শ্রীঅমরেন্দ্রচন্দ্র পাল, এম-এ

সম্মিলিত-জাতি-পুঞ্জে ব্যক্তির স্থান কী? এ সম্পর্কে যত রকম মত আছে, সেগুলোকে সাধারণতঃ দুটো ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ইংরেজীতে যাদের ফেডারেলিষ্ট (federalist) বলা হয়, বাংলায় আমরা যাদের যুক্তরাষ্ট্রবাদী বলতে পারি, তাদের মত এই যে, সত্যিকারের বিশ্বরাষ্ট্র গড়ে তুলতে হলে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই তা গড়ে তুলতে হবে। ইরা ব্যক্তিই হবে তার প্রাথমিক ইউনিট (Unit), 'রাষ্ট্র' নয়। কিন্তু এই মতবাদের বিরোধী আর একটি দল আছে, তাঁরা এই ব্যাপারে ব্যক্তিকে একটা প্রাধান্য না দিয়ে সার্বভৌম রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে, তাকেই ইউনিট ধরে একটা উন্নত ধরনের জাতিসংঘের (League of Nations) মত নূতন একটি সঙ্ঘ গড়ে তুলতে চান।

সম্মিলিত-জাতি-পুঞ্জ-বিধানের বিভিন্ন ধারা যদি আলোচনা করে দেখি, তা' হলে দেখতে পাব, যাঁরা এর বিভিন্ন ধারা রচনা করেছিলেন তাঁরা মোটামুটি দ্বিতীয় দলের লোক। অবশ্য একথা স্বীকার করতে হবে, তাঁরা দ্বিতীয় দলের লোক হলেও প্রথম দলের আদর্শের কথা তাঁরা একেবারে ভুলে যান নি। বিধানের ধারাগুলি যেমন ভাবে রচিত হয়েছে, তাতে মনে হয় এই বিধানের খসড়াকারের মনে যুক্তরাষ্ট্রবাদী দলের আদর্শের কথাও কিছুটা অন্ততঃ জাগরূক ছিল, অন্ততঃ তাঁরা এই কথাটা বুঝতে পেরেছিলেন যে, আজকের দিনের পৃথিবী নানা দুঃখ-বেদনার ভিতর দিয়ে, নানা রকম ইতস্ততঃ করে, ক্রমাগতই বিভিন্ন রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অতিক্রম করে একটি মাত্র বিশ্বরাষ্ট্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়ার উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থানুযায়ী যাঁরা বিশ্বরাষ্ট্রের প্রবর্তন করতে চান, তাঁরা বলেন, গঠন প্রণালীর দিক থেকে এই বিশ্বরাষ্ট্রের অন্ততঃপক্ষে দুটী বিশেষত্ব থাকা চাই। প্রথমতঃ, এই বিশ্বরাষ্ট্রের পার্লামেন্টে যাঁরা প্রতিনিধি নির্বাচন তাঁরা বিভিন্ন দেশের সরকার কর্তৃক নির্বাচিত হবেন না, তাঁরা নির্বাচিত হবেন সেই সমস্ত দেশের জনগণের সাধারণ ভোটদাতা এবং দ্বিতীয়তঃ এই প্রতিনিধিদের সংখ্যা নির্ধারিত হবে বিভিন্ন দেশের লোকসংখ্যানুযায়ী। যে দেশের বেশী লোক সে দেশের প্রতিনিধি সংখ্যাও হবে বেশী।

সম্মিলিত-জাতি-পুঞ্জের বিধানে কিন্তু এই দুটী প্রস্তাবের একটিও গ্রহণ করা হয় নি। আধুনিক কালের ঈর্ষা জাতীয়তাবাদের জন্যই এই প্রস্তাব দুটীর কোনটীই গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। এই জাতীয়তাবাদের মতে ব্যক্তির চেয়ে জাতি বড়, জাতির প্রাধান্য বাড়াতে গিয়ে ব্যক্তির সুখ-সুবিধার কথা না ভাবলেও চলে, এমন কি জাতির ভয় ক্ষমতা ও গৌরব অর্জন করতে গিয়ে ব্যক্তি ব্যক্তির স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়াও চলে।

যে যাই হোক, সম্মিলিত-জাতি-পুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অঙ্গের গঠন ব্যাপারে ব্যক্তির স্থানের চেয়ে জাতির স্থান উঁচে দেওয়া হলেও একথা বলা ঠিক হবে না যে, ব্যক্তির মূল্যকে সেখানে একেবারে অবহেলা করা হয়েছে। ব্যক্তিকে যে অবহেলা করা হয়নি তার কিছুটা প্রমাণ আমরা নিরাপত্তা-পরিষদের (Security Council) গঠন প্রণালীর মধ্যেই পেতে পারি। বৃটেন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া, চীন ও ফ্রান্স এই পাঁচটী বড় বড় রাষ্ট্রকে সম্মিলিত-জাতি-পুঞ্জের বিধান অনুযায়ী স্থায়ী-পরিষদে স্থায়ী সদস্য-পদ দেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তা-পরিষদের বাকী ছয়টী অস্থায়ী সদস্যপদের জন্য সম্মিলিত-জাতি-পুঞ্জের সাধারণ সভা-কর্তৃক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। লক্ষ্যেই অনুমান করা যায়, স্থায়ী, অস্থায়ী সদস্য ছিসে এই শান্তি-পরিষদে যাঁরা বাস্তবের তাঁরা একত্রে বিশ্বের জনসংখ্যের বেশীর ভাগ লোকের প্রতিনিধিত্ব করার দাবী করিতে পারবেন।

যদি একথা মেনে নেওয়া হয় যে বিশ্বরাষ্ট্র গঠন ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রবাদী মতই ঠিক, তবে একথাও মেনে নিতে হবে, বিশ্ব রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গের গঠনের জন্য ভারতবর্ষ ও চীন দেশের ন্যায় লোকবহুল দেশ থেকে আরো বেশী প্রতিনিধি নেওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। এবং সত্যি কথা বলতে গেলে, বিশ্বরাষ্ট্রগঠনে যুক্তরাষ্ট্র-মতবাদই মেনে নেওয়া উচিত। ব্যক্তির স্বার্থ নিয়েই ত জাতির স্বার্থ, ব্যক্তির গৌরবেই জাতির গৌরব, ব্যক্তির সুখসুবিধা ও আত্মবিকাশের বন্দোবস্ত করা ছাড়া জাতির জন্য কোন উচ্চাঙ্গ থাকতে পারে না, অন্ততঃ থাকা উচিত নয়। যুক্তরাষ্ট্রবাদী মতবাদ মেনে নেওয়া হয়নি বলেই সম্মিলিত-জাতি-পুঞ্জের সাধারণ সভায় (General Assembly) ৫০ কোটী লোকের দেশ ভারতবর্ষের যা ক্ষমতা, ৫ লক্ষ লোকের দেশ আইসলিণ্ড, লিচটেন্‌ষ্টাইন, ঢিলী, কলাম্বিয়া, কোষ্টারিকা, হাইতি, ডেনমার্ক, ডোমিনিকান রিপাবলিক, ইকুয়েডর, এল সেলভেডর, গ্রীস, গুয়াটেমালা, হাইতী, হণ্ডুরাস, ইরাক, লাইবেরিয়া, লাক্সেমবার্গ, নিকারাগুয়া, নরওয়ে, পানামা, প্যারাগুয়ে, পেরু প্রভৃতির প্রয়োজনের সেই একই ক্ষমতা। অথচ এদের বিজয়ের ফলে এর চেয়ে বড় অন্যায় আর কী হতে পারে? ইউরোপ ও আমেরিকার জাতিসমূহকে সম্মিলিত-জাতি-পুঞ্জের সাধারণ সভায় কিংবা অন্যান্য অঙ্গে ভোটের ব্যাপারে, কি ভোটের ব্যাপারে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের জাতিসমূহকে দেওয়া হয়েছে তার কতটুকু? এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করা আবশ্যক।

আমাদের দেশের রাষ্ট্র মহাধুরীরা এ ব্যাপারে বুদ্ধিমত্তা কিংবা চতুরতার পরিচয় দিয়েছেন তা বলা যায় না। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের শেষ দিকটায় সোভিয়েট রাশিয়া বাইলো রাশিয়া ও ইউক্রেনকে স্বাধীনতা দিয়ে তাদের জন্য সম্মিলিত-জাতি-পুঞ্জে পৃথক সদস্যপদ ও ভোটের ক্ষমতা লাভ করে নিয়েছে। এর থেকে কী আমাদের শিক্ষণীয় কিছু নেই? আমরাও কী অনুরূপ ভাবে লাভ করে বিশ্বের রাজনীতিতে আরো সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারি না?

সম্মিলিত-জাতি-পুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের গঠন প্রণালীতে ব্যক্তির স্থানের কথা ছেড়ে দিয়ে, এই প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী দিক দিয়ে ব্যক্তির

আমাদের সঙ্কল্প ---

- স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন
- দেশের বস্ত্র-সমস্যার সমাধান
- হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রীভাব

গঠনে আমাদের অকুণ্ঠ সাহায্য প্রদানের সঙ্কল্প আমরা গ্রহণ করিয়াছি।

বিদ্যাসাগর কটন মিলস্ লিঃ

মিল: মোকপুর, ২৪ পরগণা :: :: রেজি অফিস: ১১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্থানের কথা বিচার করে দেখা যাক। এই দিক থেকে সম্মিলিত-জাতি-পুঞ্জের আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাব বিধানের বিভিন্ন ধারাতে যুক্তরাষ্ট্র-মতবাদ কিংবা তার বিরুদ্ধ মতবাদ, এ দুটীর কোনটীই সেখানে গৃহীত হয়নি, বরং বিধানের রচয়িতারা এই দুই বিরুদ্ধ মতবাদের একটী মধ্যপন্থা অবলম্বন করে চলেছেন। যদি যুক্তরাষ্ট্র-মতবাদকে তাঁরা সম্পূর্ণভাবে অবহেলা করতেন, তাহলে বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলিকে ইউনিট হিসাবে গ্রহণ করে সার্বভৌম ক্ষমতা তাদের হাতেই ছেড়ে দিতেন। কিন্তু তা তাঁরা করেন নি। কথায় অবশ্য তাঁরা বলেছেন, সম্মিলিত-জাতি-পুঞ্জের সমস্ত সদস্যেরই সার্বভৌমিক সাম্য (sovereign equality) থাকবে। কিন্তু কাজের বেলায় সকলের জন্য এই সার্বভৌমিক সাম্য রক্ষা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব হয়নি। তার কারণ সম্মিলিত-জাতি-পুঞ্জের বিধানে একটির একটী কথা রয়েছে যে, সমস্ত সভ্য রাষ্ট্রই ব্যক্তি-পরিষদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য। মাত্র একারজন সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে ব্যক্তি-পরিষদ গঠিত, যদি তার সিদ্ধান্ত সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রকেই মান্য নিতে হয়, তা হলে ঐ সমস্ত সদস্যদের সার্বভৌমতা আর রইল কোথায়? রাষ্ট্র যে এমনি করে তার সার্বভৌম ক্ষমতা কিছুটা অন্ততঃ হারিয়েছে, তাতে সন্দেহ, বিশ্বের জনমতের সাহস তার কারণ আছে বলে আমরা উল্লসিত হতে পারি। সার্বভৌম ক্ষমতার অপব্যবহার করে ব্যক্তির স্বাধীনতা কিনিয়ে নেওয়ার দুর্বিষহ রাষ্ট্রের এতে কম থাকবে। প্রয়োজন হলে ব্যক্তি-পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যক্তি এখন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গিয়েও কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে স্বাধীন ভাবে যোগ দিয়ে তার নিজস্বানুযায়ী কাজ কর্ম করতে পারে। আমরা বলতে পারি, রাষ্ট্রের এই সার্বভৌম ক্ষমতা নষ্ট হওয়ার ফলে ব্যক্তির সম্মুখে যেন এক নূতন ভবিষ্যৎ খুলে গেল।

অবশ্য এখানেও একটা খুঁৎ রয়েছে। ব্যক্তি-পরিষদে ভোটের ব্যাপারে যে ভিটোর (Veto) বন্দোবস্ত আছে, তাতে একথা বলা চলে না যে, সম্মিলিত-জাতি-পুঞ্জে যোগ দিয়ে সকলেই তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন। ফ্রান্স, রাশিয়া, চীন ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র তাঁদের ভিটোর ক্ষমতা বলে সার্বভৌম ক্ষমতা তাঁদের নিজেদের হাতেই রেখে দিয়েছেন।

স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে কি নির্বাচন, কি সার্বভৌম ক্ষমতা, যে দিক থেকেই আলোচনা করা যাক না কেন, সম্মিলিত-জাতি-পুঞ্জে ব্যক্তির চেয়ে জাতির মূল্যই আজো বেশী বলে করা হয়।

অবশ্য যদি সম্মিলিত-জাতি-পুঞ্জের উদ্দেশ্যের দিকে একবার তাকাই, তা হলে অন্ততঃ এদিক থেকে সেখানে ব্যক্তিকে কত উচ্চে স্থান দেওয়া হয়েছে সেকথা মনে করে কিছুটা আনন্দিত হতে পারি। সম্মিলিত-জাতি-পুঞ্জের বিভিন্ন উদ্দেশ্যের মধ্যে একটা প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, জাতি-বর্ণ-স্ত্রী-পুরুষ-ভাষা-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষের মনুষ্যোচিত মৌলিক অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা আয়োজন করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সম্মিলিত-জাতি-পুঞ্জের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ অন্ততঃ আলাপ-আলোচনা ও গবেষণার দিকে অনেক করেছে। এবং ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আরো বেশী করবে। এর জন্য তার কত বিভিন্ন এজেন্সী, কত কমিশন, কত সভা-সমিতি ও কত বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান। কেউ হয়ত মনে করতে পারেন যে, তার পক্ষে সম্মিলিত-জাতি-পুঞ্জ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে চিন্তা করে কোন লাভ নেই। কিন্তু একথা তিনি মনে রাখতে পারেন যে, তিনি যা-ই করুন বা না করুন না কেন, সম্মিলিত-জাতি-প্রতিষ্ঠান মানবিক দিক থেকে তার জন্য চিন্তা করছে। এর প্রমাণের জন্য বেশী কিছু বলতে হবে না, কতকগুলি কমিশন, এজেন্সী প্রভৃতির নাম করলেই চলবে। যেমন মানুষের অধিকার কমিশন (Human Rights Commission), অর্থনৈতিক ও নিয়োগ-সম্পর্কীয় কমিশন (Economic and Employment Commission), সামাজিক কমিশন (Social Commission), নারীর মর্য্যাদা কমিশন (Status of Women Commission), আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ (International Labour Organisation), খাদ্য ও কৃষি সংঘ (Food and Agricultural Organisation), বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংঘ (World Health Organisation), সম্মিলিত-জাতি-পুঞ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি পরিষদ (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation), অছি পরিষদ (Trusteeship Council).

অবশ্য ব্যক্তির লাভের পথে এখানেও একটী বড় বাধা রয়েছে। সম্মিলিত-জাতি-পুঞ্জের বিধানে এমন একটী কথা রয়েছে যে, যদি কোন বিষয় রাষ্ট্রের আভ্যন্তরিক এলাকার অন্তর্গত হয়, তবে সম্মিলিত-জাতি-পুঞ্জ প্রতিষ্ঠান সে ব্যাপারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। এই সূত্রের উপর নির্ভর করে দক্ষিণ আফ্রিকা ভারতবর্ষের অভিযোগ সত্ত্বেও সেখানকার ভারতীয়দের মনুষ্যোচিত মৌলিক অধিকার রক্ষার কোন রকম চেষ্টাই করছে না। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার যুক্তি নিতান্ত অযৌক্তিক। বিধানে আরম্ভেই বলা হয়েছে, মানুষের মনুষ্যোচিত অধিকার রক্ষার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অঙ্গ সকল রকম চেষ্টা করবে। এর পরেও যদি বলা হয় মানুষের মনুষ্যোচিত মৌলিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারটী রাষ্ট্রের আভ্যন্তরিক এলাকার অন্তর্গত, তবে তাকে মিথ্যা কথা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে।

মানুষের মৌলিক অধিকারগুলি সম্পর্কে সম্মিলিত-জাতি-পুঞ্জ আজ কি করছে সে সম্পর্কে আজো অনেক তর্কবিতর্ক চলছে। এই সমস্যা সমাধানের সব চেয়ে ভাল উপায় বোধ হয় এই যে, মানুষের মৌলিক অধিকারগুলির একটা বর্ণনা দিয়ে সর্ব-সম্মতিক্রমে একটা আন্তর্জাতিক আইন তৈরী করা হোক, এবং তার ধারাগুলির বিচারের ভার দেওয়া হোক জাতীয় আদালত ও সরকার হলে আন্তর্জাতিক আদালত (International Court of Justice) এর কাছে। তা' হলে যদি কেউ এই আইন অমান্য করে তবে রাষ্ট্রের অন্তর্গত কোর্টের রায় অনুযায়ী কিংবা আন্তর্জাতিক আদালতের রায় অনুযায়ী তার যথাযথ বিচার হতে পারবে। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, আন্তর্জাতিক আদালতের রায়কে কার্যকরী করার জন্য ব্যক্তি-পরিষদকে যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

এমনি করে মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য আমরা ব্যক্তি-পরিষদের সাহায্যই নিতে পারি। কিন্তু ব্যক্তি-পরিষদের এইরূপ সাহায্য নেওয়ার বিরুদ্ধে একটা আপত্তি থাকতে পারে। কেউ বলতে পারেন, গঠনতন্ত্র ও কার্য্যপ্রণালীর দিক দিয়ে ব্যক্তি-পরিষদকে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বলা যায় না। যদি তাকে গণতন্ত্রসম্মত করে তুলতে হয়, তবে অন্ততঃপক্ষে দুটী জিনিষ চাই। প্রথমতঃ কতকগুলি বড় বড় রাষ্ট্রকে ব্যক্তি-পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদ দেওয়ার নিয়ম তুলে দিতে হবে, এবং কোন রাষ্ট্রেরই ভিটোর ক্ষমতা থাকতে পারবে না। কিন্তু বড় বড় রাষ্ট্রগুলি কী আমাদের এই দুটী দাবী মানতে রাজী হবে? যদি এই দুটী দাবী মানার মত আত্মত্যাগ তারা না করতে পারে, তবে, মনে হয়, সম্মিলিত-জাতি-পুঞ্জের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল নয়। সম্মিলিত-জাতি-পুঞ্জ প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে তার জন্য বিশ্বের জনমতের সমর্থন চাই, কিন্তু সে সমর্থন তাদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে তখনই যখন তারা অন্ততঃ মুখে তাদের মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষা করার জন্য সম্মিলিত-জাতি-পুঞ্জ প্রতিষ্ঠান যথাসাধ্য চেষ্টা করছে।

সম্মিলিত-জাতি-পুঞ্জের গঠনতন্ত্র, ক্ষমতা ও উদ্দেশ্য যেদিক দিয়েই বিচার করা যাক না কেন, সব দিক দিয়েই একথা প্রমাণিত হবে যে আন্তর্জাতিক এই প্রতিষ্ঠানটিতে ব্যক্তির স্থান খুব উচ্চে নয়। কিন্তু তাই বলে আমাদের নিরুৎসাহ হওয়ার কোন কারণ নেই। আন্তর্জাতিক সরকার গড়ে তুলার চেষ্টা, বলতে গেলে, প্রথমবারের মতো আরম্ভ হয়েছে প্রথম মহাযুদ্ধের পরে জাতিসঙ্ঘ গঠন করার মধ্য দিয়েই। এও মাত্র বছর তিরিশেক আগেকার কথা। রাষ্ট্রের ক্ষমতা খর্ব করে ব্যক্তিকে কিছু দিতে গেলে, সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বৈরাচার সকল রকমভাবে ঠেকাবার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়। উত্তেজিত হয়ে তার প্রাচীন ভগ্ন-প্রায় সাম্রাজ্যকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এত দ্রুত আমরা এত দূরে যেতে পারি যে, দূরকে আজ আর দূর বলেই মনে হয় না। বৃহৎ পৃথিবী যেন আজ ছোট হয়ে গেছে। কাজেই আজ যেখানে ছোটখাটো একটা নগর নিয়ে সার্বভৌম রাষ্ট্র গড়ে পারত, আজ সেখানে একটা দেশ বা জাতিকে নিয়েও সার্বভৌম রাষ্ট্র করার দিন চলে গেছে, আজ চাই সার্বভৌম বিশ্বরাষ্ট্র, যেখানে ব্যক্তিকে যথার্থ মূল্য দেওয়া হবে।

কিন্তু ব্যক্তি তার দাবী, তার অধিকার পেতে পারে না যতক্ষণ না সে সমাজের প্রতি তার কর্তব্য করেছে। এখানে বিশ্বরাষ্ট্রের প্রতি তার কতকগুলি বিশিষ্ট কর্তব্যের কথা বলা যেতে পারে। সম্মিলিত-জাতি-পুঞ্জের সাধারণ সভায় যে রকম সুপারিশ করা হয় সেই অনুযায়ী কাজ করার জন্য ব্যক্তি তার নিজের দেশের সরকারকে প্রভাবান্বিত করার জন্য সক্রিয়ভাবে আন্দোলন করতে পারে। সম্মিলিত-জাতিপুঞ্জ সম্বন্ধে বিশ্বসংঘের

আন্তর্জাতী সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণের রীতি এখনও খুব বেশী করিয়াই অনুসৃত হইতেছে। বিচার বিশ্লেষণের রীতি একেবারে উঠাইয়া দেওয়া হউক, সে দাবী আমরা করি না। কিন্তু রীতিটি এবিষয়ে দেশসমূহ হইতে পর আন্তর্জাতী সম্পর্কে সে রীতির এখন আর বিশেষ কিছু প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করা যায় না।

(World Federation of United Nations Associations) আছে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের পরামর্শদাতার মর্যাদা (Consultative Status) লাভ করে পরামর্শ দেওয়ার আয়োজন করতে পারে। সাধারণ সভার কতকগুলি সুপারিশ সম্পর্কে ব্যক্তির বেশ একটা বিশেষ দায়িত্ব থাকতে পারে। যেমন, ১৯৪৭ সনে এই নবেম্বর সাধারণ সভা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল তার কথা বলা যেতে পারে। এই সিদ্ধান্তে বলা হয়েছিল যে, বিভিন্ন দেশের সরকার তাঁর প্রচার ও প্রকাশের সমস্ত রকম প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে মৈত্রীভাব স্থাপনের চেষ্টা করবে। ব্যক্তি তার চেষ্টাধারা এমন একটা মতবিরোধী ও শান্তিকামী আন্তর্জাতিক জনমত তৈরী করতে পারে। সম্মিলিত-জাতিপুঞ্জের বিরুদ্ধে কোন প্রকার যুদ্ধেই কেন সরাসরি তর্কে না একথা স্পষ্টভাবে সকলেই ঘোষণা করতে পারে। ব্যক্তি তার ভোটের দ্বারা নিজের দেশের আইন সভায় কেবলমাত্র তেমন লোকদেরই পাঠাতে পারে যারা বিশ্বের শান্তির জন্য কাজ করে। ব্যক্তি তার নেই সরকারের কাছে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা দাবী করতে পারে। যদি আশা করা যায় যে, ব্যক্তি এই সমস্ত ও আরো নানা প্রকার কাজের দ্বারা নিয়ে সম্মিলিত-জাতি-পুঞ্জের আদর্শকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং বিশ্বরাষ্ট্রই একটানা সার্বভৌম রাষ্ট্র গড়ে তুলে বিশ্বের নাগরিক হওয়ার চেষ্টা করবে, তাহলে কী আমাদের আজ সত্যিও বিশ্বাস করতে হবে?

কাগজের ব্যবসায়ে

গোপীনাথ পাল এণ্ড কোং

ভারতের
প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান
স্থাপিত ১৮৯০

বেঙ্গল পেপার মিলের ডিলার
ও
ইষ্টার্ণ এষ্টেটসের সোল ডিষ্ট্রিবিউটার্স
সকল প্রকার বিলাতী কাগজ ও বোর্ড আমদানীকারক

১০৯, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন: বড়বাজার ২৮০৭ গ্রাম: রংকাগজ

শৃঙ্খলবদ্ধ বিজ্ঞান

প্রভাতকুমার গোস্বামী

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর তিন বছর কেটে গেল। যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধ শেষ হবার পরে আমরা শুনেছি যুদ্ধকালীন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি শান্তির সময়ের জন্য অত্যাবশ্যক সম্ভাবনা নিয়ে অপেক্ষা করছে। যুদ্ধের সময় যুদ্ধের প্রয়োজনে বহু জিনিসের আবিষ্কার হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে যে পরিমাণ অর্থ ঢালা হয়, যা শান্তির সময়ে কল্পনাই করা চলে না। সুতরাং সকলেরই মনে এই আশা জাগে যে, অমানুষিক অর্থ ব্যয় করে বৈজ্ঞানিক গবেষণার দিকে যতটা অগ্রসর হওয়া গেছে তা থেকে মানুষ পিছনে হ'টে আসবে না এবং ঐখানেই থেমেও যাবে না। মানুষ আশা করে যুদ্ধকালীন আবিষ্কার সমূহ শান্তির সময়ে মানবজাতির উপযোগী কোনও বস্তুর রূপ পরিগ্রহ করবে, যুদ্ধকালীন শিল্প রূপান্তরিত হবে শান্তিকালীন শিল্পে। কিন্তু যত দিন যায় ততই হতাশ হ'তে হয়। যুদ্ধকালীন শিল্প উৎপাদনের কারখানাগুলি বন্ধ হ'য়ে যায়; গবেষণায় আসে ভাটা; রসদ ক্রমে হ্রাস হয় অতি কৃপণ হস্তে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এ সম্পর্কে অনেক অজস্র বই বেরিয়েছে এবং রাশি রাশি পত্রিকায় এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। এই ধরণের লেখাগুলিকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। যুদ্ধে বিজ্ঞানের প্রসার এবং ভবিষ্যতে শিল্প-বাণিজ্য ও দৈনন্দিন জীবনে তার কার্যকরী সম্ভাবনার উজ্জ্বল চিত্র আঁকা হ'চ্ছে এই শ্রেণীর লেখায়; আর এক শ্রেণীর লেখায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে উদ্ভাবিত মারণাস্ত্র কবে সাধারণের দিক থেকে আরও কত ভয়ঙ্কর হ'তে পারে, এগুলি থেকে আরও কত ভীষণ অস্ত্র উদ্ভাবিত হ'তে পারে তারই আলোচনা করা হ'য়েছে। আলোচনা অবশ্য এখনও শেষ হয়নি।

বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির ফল নিয়ে একদল লোক 'সভ্যতার সঙ্কট,' 'সংস্কৃতির অপমৃত্যু' প্রভৃতি লক্ষ্য করে বিজ্ঞানকে ধর্ম ও আধ্যাত্মবাদের দ্বারা প্রভাবিত করবার জন্যে ব্যস্ত হ'তে উঠেছেন এবং আর একদল লোক বিজ্ঞানের উৎকর্ষ দেখে মনে করছেন এই বিজ্ঞানের দ্বারাই পৃথিবীতে শান্তি ও সমৃদ্ধি আসবে; জীবনযাত্রা আরও উন্নত স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হবে।

এ সব আলোচনা এবং সব চিন্তার মধ্যে একটা মূলগত গলদ রয়েছে। বিজ্ঞানের প্রসার আর উন্নতি কোনও ফাঁকা পাত্রের মধ্যে হয় না; পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ভাবে শুদ্ধ কোনও গবেষণাগারেও বিজ্ঞানের গবেষণা চলে না—বিজ্ঞানের গবেষণা, বিজ্ঞানের প্রসার আর উন্নতির প্রচেষ্টা চলে এই মাটির পৃথিবীতে—রাষ্ট্রের মধ্যে, সমাজের মধ্যে থেকে মানুষই এই প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তোলে।

ধনতান্ত্রিক যুগের প্রারম্ভে বিজ্ঞানের উন্নতি অনেকখানি হয়েছিল, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ঔপনিবেশিক শোষণ প্রতিষ্ঠার জন্যেই তখন বিজ্ঞানের উন্নতিতে উৎসাহ দেওয়া এবং অর্থ ব্যয় করা হ'য়েছিল। কিন্তু অতি শিগগিরই রাশ টানতে হ'লো। বিজ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাবিত যন্ত্রকে ক্রমশঃ শোষণের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে লাগলো; এমনি করে সমাজ, রাষ্ট্র এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এই শ্রেণীর হাতের মুঠোয় এসে পড়লো।

বর্তমানে একচেটিয়া পুঁজিবাদের যুগে বিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে শক্তিশালী এক শ্রেণীর একচেটিয়া পুঁজির অধীন। বৈজ্ঞানিকদের এদের স্বার্থের দিক থেকেই গবেষণা করতে হয় এবং গবেষণাও নিয়ন্ত্রিত করে সম্পূর্ণরূপে একেই লাভিপোষ ওপরে।

ব্যক্তিগতভাবে কোনও বৈজ্ঞানিক উন্নতধরণের গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং নিজ বিচারের দিক থেকে তা কতটা অনুকূল হ'তে পারে? গবেষণার জন্য সরকারী সাহায্য কোনও কোনও দেশে কিছু কিছু পাওয়া গেলেও, গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা কার্যকরী করা বা নিয়ে প্রয়োগ করার ব্যাপারে সরকারী সাহায্য কতটুকু পাওয়া যায়?

সকল শিল্পসমৃদ্ধ দেশেই একচেটিয়া শিল্পপতিদের নিজস্ব গবেষণাগার আছে। এই সমস্ত গবেষণাগারে হাজার হাজার বৈজ্ঞানিক, কারিগর, আবিষ্কারক কাজ করে। অতিজ্ঞ রসায়নিক, পদার্থবিদ্ এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে প্রধানতঃ সিদ্ধান্তমূলক গবেষণায় নিযুক্ত থাকে। কোনও বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তা ঐ প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি। সেই সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করা অর্থাৎ নিয়ে ক্ষেত্রে তাকে প্রয়োগ করা না করা নির্ভর করে শিল্পপতিদের ওপরে। ব্যক্তিগতভাবে কেউ কিছু আবিষ্কার করলেও অর্থাভাবে তা কার্যকরী করতে না পেরে তা শিল্পপতিদের কাছে বিক্রী করে দেয়। এমনি করে এক একজন শিল্পপতি অসংখ্য পেটেন্টের মালিক হ'য়ে বসে। সুতরাং কোনও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কার্যকরী করা নির্ভর করে সেই আবিষ্কার কার সম্পত্তি এবং কার্যকরী করলে তার কতটা মুনাফা আসবে তারই ওপর। অনেকে বহু পেটেন্ট কিনে আটকে রাখে, যাতে সেই পেটেন্টের পূর্ববর্তী জিনিস বাজারে যার না যায়। তাই কোনও জিনিস আবিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা কার্যকরী করা হয় না। এমনও দেখা গেছে যে, কোনও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে কার্যকরী করতে এক শত বৎসর পর্যন্ত দেরী করা হয়েছে। কোনও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কার্যকরী করলে তাতে জনসাধারণের সুবিধা হবে—কোনও ধনতান্ত্রিক দেশেই এই যুক্তিটি থাকে না;—লক্ষ্য

মণীন্দ্র ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন

লিমিটেড

হেড অফিস : বহরমপুর (বাঙলা)

—শাখাসমূহ—

মুর্শিদাবাদ, কেলেডাঙ্গা, ঔরঙ্গাবাদ, বোলপুর,
কুড়িগ্রাম, উদিপুর (রংপুর) ও বেনারস।

রেজিষ্টার্ড অফিস :
৮ বি, লালবাজার ষ্ট্রীট, বিকানীর বিল্ডিং, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান : মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী এম-এ, এম-এল-এ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর : শ্রীবিশ্বনাথ রায় এম-এ, বি-এল
ম্যানেজার : শ্রীনকুলেশ্বর ব্যানার্জি বি-এল-সি, বি-এল

থাকে মূলতঃ এইরূপ যে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে কার্যকরী করলে বেশী মুনাফা আসবে কিনা।

এই কথা মনে রাখলে এটা সহজেই বুঝতে পারা যাবে যে, যুদ্ধকালীন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অভিযুদ্ধের জন্যে কত শীঘ্র কতখানি স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আসছে।

যুদ্ধের সময় আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে অকাতরে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে; গভর্ণমেণ্ট নিজেদের প্রয়োজনেই নিজেরা অর্থ ব্যয় করেছেন বা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে দিয়ে এই জন্যে অর্থ ব্যয় করিয়েছেন। ঐই সময় অনেকে মনে করেছিলেন যে, বিজ্ঞান সম্ভবতঃ একচেটিয়া পুঁজির কবল থেকে মুক্তি লাভ করলো। কিন্তু এ ধারণা কয় দিন তা যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারা যাচ্ছে—বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার আগেও যাদের কবলে ছিল, সম্পূর্ণভাবে আবার তাদের কবলে এসে পড়েছে। শিল্প-বিজ্ঞানে সবচেয়ে উন্নত আমেরিকার দৃষ্টান্ত ধরা যাক্। যুদ্ধের আগে আমেরিকার শিল্প-বিজ্ঞানের গবেষণাগারগুলি নিয়ন্ত্রিত হতো ১৪০টী প্রতিষ্ঠান দ্বারা। ১৯৪০ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ১৮৯৯৮৮৮৮৮ ডলার ব্যয় করেছেন। এর মধ্যে ৯১৮৮৮৮৮৮ ডলার দেওয়া হয়েছিল শিল্প-গবেষণাকেন্দ্রগুলিকে। এই টাকার শতকরা ৬৯ ভাগ পেয়েছিল মাত্র ৩০টী প্রতিষ্ঠান। যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান সরকারী অর্থ সাহায্য নিয়ে গবেষণা চালিয়েছিল সেই গবেষণালব্ধ সম্পদগুলি পরে তারা কিভাবে বাজারে ছাড়বার তারা একচেটিয়া অধিকার পেয়েছিল। আজও এই অধিকার অব্যাহত রাখলেই একমাত্র তাদের লাভের দিক রক্ষা করে, তারা যুদ্ধকালীন শিল্পকে শান্তিকালীন শিল্পে রূপান্তরিত করবে কিনা, বা যুদ্ধকালীন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত শান্তিকালীন শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োগ করবে কি না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর আবিষ্কার আণবিক শক্তির কথাই ধরা যাক্। আমেরিকার যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক বা প্রমজীবী আণবিক বোমার গবেষণা বা আণবিক বোমা তৈরীতে যুদ্ধের সময় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁরা আশা করেছিলেন যে, যুদ্ধের পর আণবিক শক্তিকে শান্তিকালীন শিল্পে নিয়োগ করা হবে। এ নিয়ে প্রচুর আলোচনা হ'য়েছে। বাস্তবিক আণবিক শক্তিকে যদি শিল্পের ক্ষেত্রে নিয়োগ করা হয় তা হ'লে এ ক্ষেত্রে একটা বৃহদাকারী পরিবর্তন আসবে। কয়লা, তেলের পর বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথে যে নূতন শক্তি আণবিক শক্তি অনুসন্ধান করেছে তা বহু সম্ভাবনার পূর্ণ।

আজ দেখা যাচ্ছে যে, আণবিক শক্তিকে শান্তিকালীন শিল্পে নিয়োগ করার সম্ভাবনা ক্রমশঃ দূরে স'রে যাচ্ছে। একচেটিয়া পুঁজি আণবিক শক্তিকে শান্তিকালীন শিল্পে নিয়োগ করতে দিতে চাইবে না। এ সম্পর্কে "The Atomic Revolution" বইতে মার্কিন বৈজ্ঞানিক হেনরী ডি. স্মীথ লিখেছেন, "পৃথিবীর কয়লা ও তেলের খনি একচেটিয়া মালিক তারা হাতে রাখবার চেষ্টা করে—এমন এক দিন এসেছে যেদিন "কালো হীরক খণ্ড" এবং "তরল স্বর্ণ" এর স্থান আণবিকশক্তি অধিকার করেছে জল অথবা বাতাসের পরমাণু এই দুটোকেও তারা মুঠে ফেলতে চায়; মুঠোও ফেলে, কিন্তু আণবিক শক্তির উন্নয়ন সম্ভাবনা আমার তাদের মাথা ধরায়।" আণবিক শক্তির ব্যবহার করলে কয়লা ও তেলের মূল্য নেমে যাবে আর আজকের মূল্যে আণবিক শক্তি যুক্ত হওয়ার মূল্যে সেই শক্তিকে তোল রাখার অর্থ ভবিষ্যতের ব্যাপক শিল্প সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

(সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক)

হেড অফিস—১৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।

ফোন : ক্যাল—৫৯৮৯

ব্রাঞ্চ

বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর,
বনগাঁ, বসিরহাট, খুলনা,
শিলিগুড়ি ও পাটনা।

উপযুক্ত জামিনে টাকা ধার দেওয়া হয়।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

মিঃ এন, সি, ব্যানার্জ্জি, এম-এ (কমার্স)
জেনারেল ম্যানেজার

আমরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, আজ তা-ই করা হচ্ছে। বৃটেন ও বিশ্বের অন্য আণবিক বিজ্ঞান সম্পর্কিত পত্রিকাগুলি যদি খোলা যায় তবে, আণবিক শক্তি তো দূরের কথা, আজ পর্যন্ত আপনি এমন একটিও তথ্য বের করতে পারবেন না যে, যুদ্ধকালীন কোনও উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারকে শান্তিকালীন শিল্পে প্রয়োগ বা উপযোজিত করা হয়েছে।

বিমানপোতের সিট কেমন ক'রে মানুষের ঘুমোবার উপযোগী করে উন্নততর প্রণালীতে করা যায়, কোন্ সিগারেট বৃষ্টির জলে ভিজে ভিজে ফেতে খেতে থাকলেও যায়, ধনবার টুলকে কেমন ভাবে দোলানো যায় এবং বৈজ্ঞানিকরা এই সমস্ত বিষয়কর অন্বেষণায় জগৎকে কত পরিশ্রম করে সার্থক হয়েছেন তার বিশদ বর্ণনা পত্রিকাগুলিতে পাবেন। কত জোর 'জিপ্' থেকে 'ট্রাক্টার' তৈরীর খবর বা বেতার-প্রক্রিয়াকে নানা ভাবে ব্যবহার করার খবর পাবেন। কিন্তু যুদ্ধে উদ্ভূত আণবিক শক্তির শান্তির (বা নূতন সৃষ্টি সৃষ্টিতে সক্ষম) সময়ের সামান্যতম ব্যবহার বা তার প্রচেষ্টার কোনও সংবাদই পাওয়া যাবে না।

অবশ্য আণবিক শক্তি নিয়ে চিন্তিত হবার কারণ নেই। এখন এসম্পর্কে এক নূতন সুর ধরা হয়েছে। মার্কিণ ব্যবসায় বাণিজ্য সম্পর্কিত পত্রিকাগুলিতে এখন আণবিক শক্তি খাতে লাগাবার কত বেশী অর্থ ব্যয় করতে হবে—এই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে; কয়লা আর তেলের তুলনায় আণবিক শক্তি ব্যবহারের খরচ কত বেশী এই নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের ছেলেখেলা সেখানে চলছে। শুধু কি এই, আণবিক শক্তির ব্যবহারে যে শক্তিশালী এবং নূতন যন্ত্র তৈরী হবে তার ফলে কত লোকের বেকার হতে হবে—তারও হিসাব দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং এর পরে সাহস করে কে বলবে আণবিক শক্তির ব্যবহার করা হোক?

আণবিক শক্তি ব্যবহারের ব্যয় অন্যের বেশী কি না এ নিয়ে তর্ক করার সময় এখনও আসেনি, কারণ কোনও জিনিস হাতে কলমে প্রয়োগ করা এবং পরীক্ষার আগে নিশ্চয় করে কিছু বলা চলে না। তবে আণবিক শক্তি চালিত নূতন শক্তিশালী যন্ত্রের ব্যবহার হ'লে বহু লোক বেকার হবে কি না, এই প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেছে। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নূতন শক্তিশালী যন্ত্র বহু লোককে বেকার করে, বহু লোকের দারিদ্র্য ডেকে আনে; আর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নূতন শক্তিশালী যন্ত্র শ্রমিকদের কাজের ঘণ্টা হ্রাস করে, তাদের জীবনে বিশ্রাম ও স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আসে।

আজও আণবিক বোমার গবেষণাই চলছে এবং এই শক্তির সাহায্যে সামরিক দিক থেকে কয়খানি ভয়াবহ অস্ত্র তৈরী করা যায় তারই চেষ্টা চলেছে। অথচ এই শক্তির দ্বারা মানুষের কত উপকার হ'তে পারতো। কেবল যন্ত্র চালানো নয় বা মোটর, এরোপ্লেন প্রভৃতিতে ব্যবহার নয়, এই শক্তির সাহায্যে মানুষ আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ, এমন কি বৃষ্টির বৃষ্টি পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারতো। আজ যেখানে অনন্ত শীতের প্রকোপে মানুষ বাস করতে পারে না, সেখানে তাপ সৃষ্টি ক'রে আবহাওয়া এমন ভাবে পরিবর্তন করা যেতো, যাতে মানুষ অনায়াসে বাস করতে পারতো। আণবিক শক্তির সাহায্যে চালিত বিমানে গ্রহ উপগ্রহে পর্যন্ত ভ্রমণ করার সম্ভাবনা ছিল। এই সমস্ত সম্ভাবনা অনেকের নিকট অদ্ভুত মনে হতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত "বিজ্ঞান বৃত্তিবদ্ধ" থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এগুলির যথার্থ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা যাবে না। বিজ্ঞান যদি একচেটিয়া পুঁজির দাস হিসাবে কেবল মুনাফা শিকার আর প্রভুত্ব বিস্তারের জন্যে অন্যায়ভাবে ব্যবহার হ'তে থাকে, তা হলে বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ নিয়ে যত আলোচনাই হোক লোকের কাছে তা অদ্ভুত ঠেকবে এবং আপামর জনসাধারণ তা থেকে বিশেষ কিছুই আশা করতে পারবে না।

আণবিক শক্তিকে শান্তিকালীন শিল্পে প্রয়োগ করা না করা যাদের হাতে নিশ্চয় করে তারাই নিজেদের এই শক্তিকে আটকে রাখবে, তা নয়—এই সম্পর্কে যাতে জনসাধারণের মনে চেতনা না হয় তার জন্যেও যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে। অনেকেই শুনে বিস্মিত হবেন যে, লণ্ডনে অনুষ্ঠিত বিশুদ্ধ ও ফলিত রসায়নের একাদশ বার্ষিক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পর্যন্ত আণবিক শক্তি সম্পর্কে আলোচনার ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করা হ'য়েছিল এবং সেখানে এই আলোচনা হ'তে পারে নি। এই সমস্ত ব্যাপার দেখেই বিশ্বের প্রগতিশীল বৈজ্ঞানিকরা আণবিক শক্তির প্রকৃতি ও গুরুত্ব সম্পর্কে বিশ্বের জনসাধারণকে অবহিত করতে "এমার্জেন্সি কমিটি অব অ্যাটমিক সায়ান্টিস্ট্স্" গঠিত হ'য়েছে। এই কমিটির পক্ষ থেকে প্রচারিত এক ঘোষণায় বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনষ্টাইন বলেছেন—"আণবিক শক্তি উৎসারিত ক'রে আমাদের ঘুমে যে মহাবিপ্লবী শক্তি সৃষ্টি হ'ল প্রাগৈতিহাসিক মানুষের আগুন আবিষ্কারের পরে তার আর তুলনা নেই। দুনিয়ার জনসাধারণের জাগ্রত চেতনা, জ্ঞান ও দাবী ছাড়া এই শক্তি নিয়ন্ত্রণেরও অন্য কোন পথ নেই। আণবিক শক্তি সম্পর্কে সহজ তথ্যগুলি এবং সমাজের ওপর তার প্রভাবের তাত্ত্বিক সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার দায়িত্ব বিজ্ঞানী হিসাবে আমাদের পক্ষে অবশ্য পালনীয়।" সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা যতদিন জনসাধারণের করায়ত্ত না হয়, ততদিন দেশের শিল্প ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলি জনসাধারণের নিজস্ব সম্পত্তি হিসাবে নিজেদের অধিকারে না আসে, ততদিন পর্যন্ত প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক-দেরই সংঘবদ্ধভাবে আঘাত হানতে হবে বিজ্ঞানকে মুখ্যতঃ মুক্ত করার জন্যে, একচেটিয়া পুঁজির মুনাফালোলুপ রাজনীতি ও অর্থনীতির নাগপাশ থেকে বিজ্ঞানকে মুক্ত করবার জন্যে।

ভারতের প্লাস্টিক শিল্পের সুযোগ সম্ভাবনা

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য, এম-এ

বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর শিল্প জগতেও যে অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, একথা আজকাল আর অস্বীকার করবার উপায় নেই। বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার ও কারখানার শিল্পক্ষেত্রের উপর ভিত্তি করেই যে বর্তমান সভ্যতা গড়ে উঠেছে, একথা আজকাল সবাই স্বীকার করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিশক্তির সঙ্গে ব্যবসায় শিল্পের আত্মীয়তার কোন নমুনা খুঁজে পাওয়া যায় না। মনে হয়, এরা চিরসুখী বাবা মিয়ে ভিন্ন দিকে মুখ করেছে। আসল দেখা যাক, বৈজ্ঞানিক পদার্থের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা খুঁজে পাবার জন্যে উৎসুক; আর, শিল্পপতিরা চান তাঁদের ব্যবসায় শিল্পের প্রসার, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক পরিবেশের উপর। এ ক্ষেত্রে, পারস্পরিক সহযোগিতা খুঁজে পাওয়া অস্বাভাবিক, তবে এটা আশা করা যেতে পারে যে, মহাযুদ্ধের প্রভাবে আর বর্তমানে সভ্যতার আওতায় এসে শিল্পপতিরাও দিন দিন বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর একান্ত নির্ভরশীল হয়ে উঠেছেন।

রাসায়নিকের গবেষণাগার প্রমাণিত উৎপাদিকা শক্তির উপর কতটুকু প্রভাব বিস্তার করেছে, তার সন্ধান পাওয়া যায় প্লাস্টিক শিল্পে। বস্তুতঃ প্লাস্টিক শিল্পের জন্মলাভের ইতিহাস সম্পূর্ণ আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত। গবেষণাগারে পরীক্ষা চালাবার সময় বৈজ্ঞানিকেরা আশাই করতে পারেন নি যে, এমনি ধারা এক নূতন জিনিষের সৃষ্টি হবে। তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, জৈব রসায়নের বিশেষ কতকগুলো অণু-পরমাণুর সংযোজন পরীক্ষা করা। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যাদের বলা হয়, 'পলিমারাইজেশন' (Polymerisation) এবং 'কনডেন্সেশন' (condensation)—এমনি ধারা রাসায়নিক প্রক্রিয়া পরীক্ষা করতে গিয়ে তাঁরা অলক্ষ্যে এক নূতন জিনিষ আবিষ্কার করে ফেললেন। পরীক্ষার প্রাথমিক অবস্থায় ঘটনাটির উপেক্ষা করা হয়েছিল, কিন্তু পরে দেখা গেল, এই প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রজন (resin)-জাতীয় এক প্রকার জিনিষ সৃষ্টি হয়, যাদের উত্তাপের তাপমাত্রার মাপ-কাঠিতে গলিয়ে অনেক প্রকার কাজে লাগান যেতে পারে। উত্তাপের প্রভাবে তাদের রমনীয়তার যে প্রকারভেদ ঘটে, এই প্রাকৃতিক গুণটির উপর ভিত্তি করেই, এদের নাম রাখা হয়েছে প্লাস্টিকস অর্থাৎ রমনীয়। আজকাল, এদের গঠন ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করবার দিকে বলা চলেছে যে, জৈব রসায়নের বিশেষ কতকগুলো অণু-পরমাণু পরস্পর মিলিত হয়ে, এক নূতনতর যৌগিক পরমাণুর সৃষ্টি করে এবং এরই ফলে এই জিনিষটির জন্ম হয়।

পৃথিবীর প্লাস্টিক-শিল্প বেশী দিনের নয়। বলতে কি, এখনও এ গবেষণাগারের গণ্ডিই পেরোয় নি। এরি মধ্যে অর্থাৎ মাত্র পঁচিশ বৎসরের ভেতর এ কতটুকু প্রভাব লাভ করেছে, তা চিন্তা করলে আশ্চর্যান্বিত হতে হয়। হিসেব করে দেখা গেছে পৃথিবীতে প্রতি বৎসর মোট ২২৪ কোটী পাউণ্ড প্লাস্টিক তৈরী করা হয়, আর খরচের দিক দিয়ে দেখতে গেলে, জার্মানীতে গড়পড়তায় খরচ হয় ১'৪০ পাউণ্ড, আমেরিকায় ১'৪০ পাউণ্ড, ইংলণ্ডে ১'০০০ পাউণ্ড আর ভারতবর্ষে ০'০০৫ পাউণ্ড। এতে সহজেই বোঝা যায়, প্লাস্টিক শিল্প জার্মানীতেই প্রাধান্য পেয়েছে বেশী, আর ভারতে এ এখনও অঙ্কুরেই বিলীন আছে।

বিশ্ব সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্লাস্টিক শিল্পের প্রসার যথেষ্ট পরিমাণে আশা করা যায়। ভারতে এ শিল্প যদিও নেই বললেই চলে কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে ভারতের এ শিল্প যে প্রসার লাভ করতে পারে তার সম্ভাবনা আছে। কারণ, ভারতে কৃত্রিম প্লাস্টিক তৈরীর উপাদানের অভাব নেই; এর উপর প্রাকৃতিক রজন-জাতীয় জিনিষ-গুলিকেও কাজে লাগানো যেতে পারে। এক-মাত্র অভাব সত্যিকার বৈজ্ঞানিক গবেষণার। এ অবস্থায়, ভারতে এ শিল্প গড়ে তুলতে হলে বর্তমানে আমাদের দেশীয় উপাদানের উপর ভিত্তি করে ব্যাবহারিকভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালানো একান্ত প্রয়োজন। তবে Advisory Planning Committee of India-এর বিশেষ হিসেবের রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সমাজ যে পরিকল্পনা নিয়েছেন, তাকে যথার্থ রূপ দান করতে পারলে মনে হয়, আমাদের দেশেও এ শিল্প বেশীদিন উপেক্ষিত হ'য়ে থাকবে না।

প্লাস্টিক-শিল্পকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। প্রথমতঃ ঢালাই বা ছাঁচ-শিল্প অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম রজন-জাতীয় জিনিষগুলোকে উত্তাপের মাত্রা হিসেবে অর্থাৎ ১২৫°-২০০° ডিগ্রির ভেতর গলিয়ে ছাঁচে ফেলে প্রয়োজনমত জিনিষে রূপান্তরিত করা হয়। পরে ঠাণ্ডা হয়ে গেলে এরা শক্ত আকার ধারণ করে। এই শক্ত হয়ে যাওয়ার ভেতরও দু'দল দেখতে পাওয়া যায়। একদল চক্ষে যাদের ঘাবড়ায় তেমন গড়ে উত্তাপের কাছে লাগান যেতে পারে। এদের বলা হয় 'থার্মোপ্লাষ্ট' (thermoplast) আবার আর এক শ্রেণীর প্লাস্টিক আছে যারা একবার শক্ত হয়ে গেলে আর ভেঙ্গে গড়া যায় না, এদের বলা হয় থার্মোসেটিং (thermo-setting) প্লাস্টিক। প্রয়োজনের তারিফমা হিসেবে ব্যবসায় ক্ষেত্রে, এদের দু'জনই সমান প্রাধান্য লাভ করেছে।

সম্পূর্ণ বিদেশী উপাদানের উপর ভিত্তি করেই ভারতে প্লাস্টিক শিল্পের সূত্রপাত। কিন্তু কাল যাবৎ ভারতে ঢালাই শিল্প বেশ লাভজনক হয়েই চলে আসছে। হিসেব করে দেখা গেছে এখানে ভারতের নানা জায়গায় ৭৫টি ঢালাই কারখানা স্থাপিত হয়েছে; এতে ২০০০ টন প্লাস্টিক উপাদানকে কাজে লাগানো যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ শিল্পকে সম্পূর্ণরূপে আমদানী করা বিদেশী উপাদানের উপর নির্ভর করতে হয় বলে এর প্রসারণের সম্ভাবনা খুব কম। Advisory Planning Committee বিবরণীতে এ শিল্পের প্রসারের ইঙ্গিত দেখতে পাই। তাদের মতে, পাঁচ বৎসরের ভেতরই ভারতে ৩০০০টন প্লাস্টিক উপাদানকে কাজে লাগান যায়, এমন শিল্প গড়ে তোলা হবে এবং এর জন্যে প্রয়োজনমত উচ্চশ্রেণীর রসায়নিক বিদেশ থেকে আমদানী করা হবে।

এ শিল্পের দ্বিতীয় অঙ্গ অর্থাৎ সবচেয়ে মূল্যবান অংশটি হচ্ছে, উপাদান তৈরীর শিল্প। প্লাস্টিকের উপাদান অর্থাৎ যা দিয়ে প্লাস্টিক তৈরী করা হয় তা সাধারণতঃ প্রাকৃতিক অবস্থাতেই পাওয়া যায়। কিন্তু বিশ্ব মহা-যুদ্ধের প্রভাবে প্লাস্টিক শিল্পে আকস্মিক প্রসারের ফলে বর্তমানে শিল্পকে একান্তভাবে কৃত্রিম উপাদানের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। এবিষয়ে অগ্রণী হচ্ছে জার্মানী, তারপর আমেরিকা ও ইংলণ্ড। এদের গবেষণাগারে এযাবৎ অনেক প্রকার কৃত্রিম উপাদান আবিষ্কার করা হয়েছে। যতটুকু জানতে পারা গেছে, তা'তে দেখা যায়, সেসব উপাদানে এই ক'টা যৌগিক পদার্থকে কাজে লাগান হয়েছে, যেমন, 'ইউরিয়া' (urea), ফর্ম্যে-লডিহাইড (Formaldehyde), ফিনল (Phenol), থেলিক এনহাড্রাইড (Pthalic Anhydride) এসিটোন (Acetone), মিথানেল (Methanol), এসিটিলিন (Acety-lene) ও গ্লিসারিন (Glycerine)। এদের সহায়তায় তাঁরা যে কয়টি প্লাস্টিক-উপাদান তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন, তাদের ভেতর 'ফিনল ফর্ম্যেলডিহাইড' (Phenol formal-

debyde), এলকিড (Alkyd resin), মিথাইল মিথাক্রাইলেট (Methyl Methacrylate), পলিস্টাইরিন (Polystyrene) পলিভিনি এসিটেট (Polyvin Acetate) এর নাম উল্লেখযোগ্য। আশাতদৃষ্টিতে, প্রচুর পরিমাণে এদের তৈরী করবার পদ্ধতিটি খুবই সহজ বলে মনে হয়। বিশেষ প্রকৃতির লঘায়কের (Catalyst)-এর উপস্থিতিতে ও সামান্য তাপ-মাত্রায় কতকগুলো যৌগিক পদার্থের ক্ষেত্রের পরস্পর যোগাযোগ স্থাপন করেই এই শ্রেণীর যৌগিক উপাদান সৃষ্টি করা যেতে পারে। যেমন, এমোনিয়া অথবা ক্লাসটিক সোডার সহায়তায় ফিনল ও ফর্মেলডিহাইডের ক্ষেত্রের পরস্পর যোগাযোগ স্থাপন করে 'ফিনল ফর্মেলডিহাইড' তৈরী করা যায়। কিন্তু রাসায়নিক পরিবর্তনের দিক দিয়ে দেখতে গেলে এর জটিলতা সবচেয়ে বেশী। যৌগিক পদার্থের পরিমাণ, উত্তাপ-মাত্রা ও লঘায়কের (Catalyst) এর সামান্য পরিবর্তনের ফলে এ পরীক্ষার আমূল পরিবর্তন দেখা দেওয়ার আশঙ্কা আছে। তাই, এ শিল্প এত গবেষণাসাপেক্ষ ও সময়-সাপেক্ষ। বর্তমানে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক লঘায় দেশীয় রাসায়নিক উপাদানের উপর ভিত্তি করে, ভারতের নানা-স্থানে ১৫০০ হাজার টন 'ফিনল ফর্মেলডিহাইড' ও ৫০০ টন 'ইউরিয়া ফর্মেলডিহাইড' তৈরী করবার শিল্প গড়ে তুলবার কল্পনা করছেন।

রিসার্চের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান ভারতে প্লাস্টিক শিল্পের যে আশার সম্প্রসারণে একান্ত দরকার হয়ে পড়েছে তা' সেলুলুজের (Cellulose) এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ফিল্ম (Film) তৈরীর কাঁচামাল হিসেবে সেলুলুজের দাম বর্তমানে সবচেয়ে বেশী। এক্ষেত্রে একে সাধারণতঃ নাইট্রো-সেলুলুজ বা সাইলোজাইলিন অথবা সেলুলুজ এসিটেট হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বিস্ফোরক হবার আশঙ্কা আছে বলে, সাধারণতঃ নাইট্রো-সেলুলুজের সঙ্গে কর্পূর মিশিয়ে এর বিস্ফোরক গুণটিকে নষ্ট করে ফেলা হয়। সেলুলয়েড হিসেবে আমাদের অতি পরিচিত জিনিষটি নাইট্রো-সেলুলুজ থেকেই তৈরী করা। এতে থাকে ১০ ভাগ কর্পূর, ৪০ ভাগ রেড়ির তেল আর ৪০ ভাগ নাইট্রো-সেলুলুজ। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এরে মাত্র ৭৫° ডিগ্রিতে গলিয়ে ইচ্ছামত কাজে লাগান যায়।

বিস্ফোরণের ভয়ে আজকাল নাইট্রো-সেলুলুজের পরিবর্তে সেলুলুজ-এসিটেট প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। এরাও প্লাস্টিক শ্রেণীভুক্ত। তবে, এদের ব্যবহারে সুবিধে এই যে নাইট্রো-সেলুলুজের মত এদের বিস্ফোরণের আশঙ্কা নেই। তুলোর টুকরোকে সালফিউরিক এসিডের উপস্থিতিতে এসেটিক এসিডে ডুবিয়ে খুব পরিষ্কার করে সেলুলুজ-এসিটেট তৈরী করা হয়। তারপর এদের সঙ্গে প্রয়োজন মত রাসায়নিক উপাদান মিশিয়ে ইচ্ছামত কাজে লাগান হয়। রায়নিয়ন ও চলচ্চিত্র ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও এদের ব্যবহার আজকাল দেখা যাচ্ছে। যেমন এর সাহায্যে নিখুঁত বতেল তৈরী করে আজ কাল কৃত্রিম অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপে ব্যবহার করা হয়। তা ছাড়া পুতুল, খেলনা ইত্যাদি তৈরীর ইতিহাস আজকাল আর কারুর অজানা নয়। সেলুলুজ-জাত প্লাস্টিকের এই প্রকার ব্যবহারের ফলে তার আবশ্যকতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। ফলে বর্তমান লড়াইয়ের বাজারটিতে হিসেব করে দেখা গেছে, এর প্রয়োজনীয়তা আজকাল সব চেয়ে বেশী। ১৯৩৭ সালের বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায় যে বছর মোট ১৫,৫৪৭,১১৬ পাউণ্ড নাইট্রো-সেলুলুজ বা পাইরোজাইলিন তৈরী করা হয়েছিল, আর সেলুলুজ-এসিটেট তৈরী করা হয়েছিল ৮৭৪:১৭৯ পাউণ্ড। এ থেকেই বুঝতে পারা যায়, বর্তমান লড়াইয়ের উপর প্লাস্টিক শিল্পের প্রভাব কিন কিন কি হিসেবে বাড়ছে।

ভারতের বর্তমানে সেলুলুজ-জাত প্লাস্টিক প্রচুর পরিমাণে তৈরী করা দরকার। আগামী পাঁচ বছরের ভেতর যদি ভারতের প্লাস্টিক ক্ষেত্রে অন্ততঃ ২০০০ টন নাইট্রো-সেলুলুজ আর ১০০০ টন সেলুলুজ-এসিটেট তৈরী করা না হয়, তা হলে ভবিষ্যতে প্লাস্টিক-শিল্পে ভারতবর্ষ কিছুতেই পৃথিবীর প্লাস্টিক শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে উঠতে পারবে না।

আজকাল, দুধ থেকেও প্লাস্টিক তৈরী করবার কথা শুনতে পাওয়া যায়। ননীটি দুধের উপরের স্তর থেকে 'কেসিন' জাতীয় যে জিনিষটিকে বের করা হয়, তাকে প্রয়োজন মত রাসায়নিক উপাদানের সঙ্গে মিশিয়ে ফর্মেলডিহাইড দ্রবণে ডুবিয়ে রাখলে প্লাস্টিকের মত একটা জিনিষ পাওয়া যায়। এ ধরনের প্লাস্টিক ভারতেও তৈরী করা যেতে পারে ; তবে এটা সময়-সাপেক্ষ।

প্লাস্টিক শিল্পের তৃতীয় পর্যায় হলো কতকগুলি বিশেষ শ্রেণীর যৌগিক পদার্থ তৈরী করা। ব্যবহার ক্ষেত্রে দেখা গেছে, প্রাকৃতিক অবস্থায় অথবা বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে যে সকল উপাদান তৈরী করা হয়, তাদের কাছ থেকে সকল সময় আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। তখন তাদের সঙ্গে প্রয়োজনমত রাসায়নিক উপাদান মিশিয়ে নিলেই কাজে লাগান সম্ভব হয়। এই শ্রেণীর রাসায়নিক উপাদান প্লাস্টিক শিল্পের বিশেষ অঙ্গ ; তাই, প্লাস্টিক শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেণীর রাসায়নিক উপাদান নিয়ে গবেষণা একান্তভাবে আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এদিকেও Planning Committeeর দৃষ্টি যথাস্থানেই পড়েছে বলে মনে হয় ; কারণ তাঁদের পরিকল্পনায় সবরাই ১৫০০ টন 'উড ফ্লাওয়ার' (Wood-flour) তৈরী করবার কারখানা গড়ে তোলার নির্দেশ রয়েছে।

প্লাস্টিক শিল্পের ক্রমোন্নতির যে পর্যায়টি আমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীদের একান্ত নিজস্ব সেটা হচ্ছে দেশীয় উপাদান নিয়ে গবেষণা। ভারতবর্ষ বনজ দেশ, তাই তার প্রাকৃতিক উপাদানের অভাব নেই। তাদের ক্ষেত্রের শ্রেণী বিভাগ করে দেখা গেছে যে, আমাদের দেশীয় উপাদানে অনেকগুলি উচ্চশ্রেণীর প্লাস্টিকের উপাদান আছে। বহু অবস্থায় এদের পাওয়া যায় বলে আপাততঃ এদের কাজে লাগান সম্ভব নয়। এদের নিয়ে ধারাবাহিকভাবে যদি গবেষণা চালান যায়, তাহলে খুব সহজেই এটা আশা করা যেতে পারে যে, অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ তার প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়েই পৃথিবীর কৃত্রিম সম্পদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালাতে পারবে।

প্লাস্টিক শিল্প গড়ে তোলবার উপযুক্ত পরিবেশ ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে দেখা গেল, ভারতে প্লাস্টিক শিল্প ভালোভাবে গড়ে তোলবার উপযোগী উপাদান ও পরিবেশের অভাব নেই। তা ছাড়া ভারতের বনজ প্রাকৃতিক সম্পদ এ শিল্প বিস্তারের উপর অবেক্ষবাদি প্রভাব বিস্তার করেছে। একমাত্র অভাব দেখা যায়, বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রের আর শিল্পগত কয়েকটি অসুবিধার উপর। প্লাস্টিক শিল্পকে যাতে আমাদের জাতীয় শিল্পে রূপান্তরিত করা যায়, এই শ্রেণীর গবেষণা আমাদের দেশে এখনো হয়নি। আমাদের দেশীয় উপাদানগুলি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়ে পড়ে আছে ; আর এদিকে আমরা একান্তভাবে বিদেশী উপাদানের উপর নির্ভর করছি। তা ছাড়া, আমাদের শ্রম-কেন্দ্রগুলি সম্পূর্ণভাবে অবৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিচালিত হচ্ছে। তবে এ কথা আশা করা যায়, ডাইফো-ইলেক্ট্রিক প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অচিরেই আমাদের শিল্প জগতে, অন্ততঃ প্লাস্টিক শিল্পে 'রিনাইসেন্স' আসবার সম্ভাবনা আছে।

Indian Planning Committeeর সর্বশেষ প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে ভারতে প্লাস্টিক শিল্পের ভবিষ্যতের আভাস পাওয়া যায়। তার মারফৎ জানতে পারা গেছে, ভারতে প্লাস্টিক শিল্পের আশু প্রসারের সম্ভাবনা ও সমস্যা নিয়ে গবেষণা করবার জন্য Council of Scientific and Industrial Research Committee তার বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে National Chemical Laboratories নামে নতুন একটি বিভাগ স্থাপনের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। তাঁদের সুদীর্ঘ পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতের প্লাস্টিক শিল্প জগতের শিল্পের সঙ্গে অচিরেই যে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবে, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই।

জীবন-বীমা ও গণ-সংযোগ

শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

মানব জাতির সেবার দিক থেকে—অর্থাৎ তার সামাজিক উন্নয়নের প্রকৃত কার্যকারিতার দিক থেকে জীবন-বীমার সার্থকতার তুলনা হয় না।—এ কথা যে বিজ্ঞানসম্মত তা' সত্য বলে স্বীকৃত হয়েছে।

আমরা জানি বিধবা ও পিতৃহীন শিশুর পক্ষে, এবং বৃদ্ধ ও অক্ষমের পক্ষে জীবন-বীমার দান কতখানি; আমরা জানি একেবারে কালের উপযুক্ত হবার মূলে জীবন-বীমা কি ক'রে তাদের রক্ষা করেছে; আমরা এখনও জানি যে, জাতির কাছে দেশের পক্ষে প্রত্যেক নরনারী ও শিশুর সকল অবস্থায় জীবন-বীমার মূল্য সর্বাধিক—কেন না, জীবন-বীমার দ্বারা মানুষের আর্থিক স্বাধীনতা, তার সামাজিক উন্নতি, স্বস্তি ও আনন্দ পূর্ণ-মাত্রায় লাভ হ'তে পারে।

অনেক দিক থেকেই জীবন-বীমা মানুষের মনকে আকৃষ্ট করতে পারে: নিয়মিত সঞ্চয়ের অভ্যাস এর দ্বারা আয়ত্ত হয়, যে টাকা টানা বাঁধন দিতে হয়—লক্ষ্মী ভাণ্ডারের মত সে টাকা লোকসান হওয়ার আশঙ্কা থাকে না; বীমাকারীর টাকা খাটে: কিন্তু তার জন্য ঝঞ্ঝা নাই, জীবন-বীমায় নিরাপত্তার অনুপাতে টাকা খাটিয়ে অন্য কোনওভাবে এ পরিমাণ সুদ অর্জিত হ'তে পারে না, জীবন-বীমার জন্য প্রদত্ত টাকার উপর কোনও তাগাদা দিতে হয় না। এই সকল বিষয়ের সঙ্গে যদি মৃত্যুজনিত আর্থিক ক্ষতি থেকে জীবন-বীমার দ্বারা রক্ষা পাওয়ার সুবিধার কথা বিবেচনা করা যায় তা হ'লে ভবিষ্যতের দুর্দিনের জন্য সঞ্চয় করার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অন্য কোনও উপায় এ পর্যন্ত উদ্ভাবিত হয় নাই।

এইগুলি হচ্ছে জীবন-বীমার তথ্য: শুধু তথ্য কেন এগুলির সত্যতাও আজ অবিসম্বাদী। যারা জীবন-বীমার কাজে নিযুক্ত আছে তারা এ তথ্য বা সত্য সম্বন্ধে অবহিত; এমন কী যারা জীবন-বীমার সম্বন্ধে বই পড়েছেন এ বিষয়ে তাঁহাদেরও কিছু জ্ঞান থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণ লোকের এ বিষয়ে কোনও জ্ঞান বা ধারণা নাই, জ্ঞানও নাই—তার প্রমাণ আমরা পাই তাদের মধ্যে অধিকাংশের বীমার প্রতি বিমুখতা দেখে। সেই জন্য প্রত্যেক বীমা কোম্পানীর কাছে এটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, কি উৎকৃষ্ট উপায়ের দ্বারা সহজ ও সরলভাবে চির যত আবশ্যকীয় ক'রে তাঁরা জীবন-বীমার এই সকল তথ্য বা সত্য জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে পারেন। ভবিষ্যতে যাঁরা বীমা করবেন বলে প্রস্তাব করা যায় তাঁদের মধ্যে বীমা সম্বন্ধে প্রচারকার্য চালিয়ে, এ বিষয়ে তাঁহাদের অবহিত ও উৎসাহিত করে তুলতে হবে যাতে ক'রে তাঁদের মনে বীমা করবার ইচ্ছা আপনা থেকেই জেগে ওঠে। বস্তুতঃ বীমাপত্র বিক্রয়ের আগের এই অবশ্যকরণীয় বীমা কোম্পানীগুলিকেই সম্পাদন করতে হবে।

জীবন-বীমার অফিসে অন্যান্য অফিসের মত প্রচারকার্য (Publicity) বা গণ-সংযোগ (Public Relations) ব্যাপারটার অস্তিত্ব কিন্তু এ ছাড়াও "গণ-সংযোগের" অর্থ আরও ব্যাপক এবং তার কার্যক্ষেত্র আরও সুপ্রসারী। কারণ, গণ-সংযোগের সূচনা হয় ব্যক্তিতে,—সমাজ-জীবনে এর প্রগতি, পরিণতি লাভ করে জাতির মধ্যে: গণ-সংযোগ হচ্ছে ব্যক্তি সংযোগের কারণ এবং সমষ্টি ব্যক্তিরই সম্পর্ক নিহিত আছে। মানুষ যখন পরস্পর পরস্পরকে জানতে পারে, বুঝতে পারে তখন তাদের সম্পর্ক ও যোগাযোগ প্রীতিকর হয়ে ওঠে। অনেকে যে লোকের কাছে প্রিয় হয়ে পড়ে তার কারণ তারা তাদের সম্বন্ধে মানুষকে ভাল ভাবে জানবার সুযোগ দিয়ে থাকে: একটা বড় কোম্পানী বা সমষ্টিভাবে যে কোনও শিল্প তেমনি এই একই উপায়ে জনপ্রিয় হ'তে থাকে।

আজকাল দিনে গণ-সংযোগের প্রশ্ন বীমা কোম্পানীর কাছে খুব বড় করে দেখা দিয়েছে —এবং তাদের সে প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তেই হবে। কেন বিনা আয়াসে নির্ঝঞ্ঝাটে লোক-চক্ষুর অন্তরালে থেকে কাজ করে চলে যাবার দিন আর নাই। এখন তারা পরিচিত হয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং তাদের পক্ষে জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের আবশ্যকতা এড়াবার উপায় নির্ণয় করতে বাধ্যতামূলক প্রচারকার্যের উদ্ভব।

(ক) বীমা ব্যক্তি বা সংঘের প্রয়োজন নিয়ে জনসাধারণের কোনই মাথা ব্যথা নাই।

কিন্তু যাঁরা বীমাপত্র বিক্রয়ের কাজে লিপ্ত আছেন তাঁরা নিশ্চয়ই কি জানেন বা বিশ্বাস করেন যে, বীমা জনসাধারণের সেবক। বীমাপত্রের সর্ত ও আনুষঙ্গিক চুক্তি প্রভৃতি খুলে কি এরই ঘোষণা—অর্থাৎ জনসাধারণ কি জানেন বা বোঝেন কি সেবা তাঁরা চান করছেন?

না, তাঁরা বুঝেন না:

আমরা জানি এমন অনেকে আছেন যাঁদের ধারণা—"Insurance is a dull mystery to almost to every one: an irritation to a lot of people, and a swindle to a larger number than some of us can possibly imagine." অর্থাৎ প্রায় সকলের কাছেই বীমা একটি দুর্বোধ্য প্রহেলিকা, অনেকের কাছে বীমা বিরক্তি মাত্র, আবালের কল্পনার অতীত বহু ব্যক্তির কাছে ইহা প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই কারণেই জনসাধারণের মন থেকে

আপনার দেশ চায়

ভবিষ্যতের সংস্থান আপনি এখন থেকেই করতে থাকুন। নিশ্চয়ভাবে অনেক কিছু করা যায় না কিন্তু প্রয়োজনের বাণী আজীবন থাকবে। যত বয়সে আপনি নিজে ও আপনার পরিবারের দেখবে পারেন যতদিন আছে এ ধন দেশের এখন থেকেই কিছু কিছু করে আপনার করুন। সুযোগের সন্ধান করুন সুযোগের বীমার সুযোগ যে এসেছিল, এ বিষয়ে ভবে সন্দেহ নেই।

অধিকৃত মূলধন	...	৬,০০,০০,০০০৲
গৃহীত "	...	৩,৫৩,৫৩,০০০৲
আদায়ী "	...	৭১,২১,০০০৲
মোট তহবিল	...	১৮,৪১,৪২,০০০৲
মোট সম্পত্তি	...	১৯,৭৪,৩৭,০০০৲
মোট দাবী মেটান হয়েছে অন্যূন	...	১৪,০০,০০,০০০৲
চলতি জীবনবীমার পরিমাণ অন্যূন	...	৮০,০০,০০,০০০৲

নিউ ইণ্ডিয়া

জীবন :: অগ্নি :: মৌ :: দুর্ঘটনা

প্রভৃতি সর্বপ্রকার বীমার কাজ করে।

হেড অফিস :
বোম্বাই

তদ্বিরকারী অফিস :
৯, নেতাজী সুভাষ রোড

কলিকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী, জলন্ধরসিটি, ঢাকা, করাচী, প্রভৃতি স্থানে অফিস আছে।

ভ্রান্ত ধারণা দূর করবার জন্য চাই প্রত্যেক কোম্পানীতে 'জন-সংযোগ' বিভাগ প্রবর্তন।

জনসাধারণের মনে জীবন-বীমা সম্বন্ধে ভাল ধারণার সৃষ্টি করা, পরস্পরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার ব্যাপারে 'জন-সংযোগ' বীমার ক্ষেত্রে খুব অল্প দিনই স্বীকৃত হয়েছে এবং তার উন্নতি সাধনের চেষ্টা চলছে। জনসাধারণ আজ বীমার বিষয় আরও বেশী জানতে চায়—বীমা পরিচালকগণ সে দাবী আজ স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু সে দাবী মানতে হলে জনসাধারণের মনকে তৈরী করার উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

আমাদের অগণিত বীমাকারী এবং জন-সাধারণের সঙ্গে আমাদের ব্যবহার আন্তরিক হওয়া দরকার—মানুষের মনকে আকৃষ্ট করতে হলে চাই মানুষেরই দৈনন্দিন জীবনে বীমার কার্যকারিতার উদাহরণ দেওয়া। যাকে ইংরাজীতে বলে—"The story of Life Insurance in action." সত্যকার ঘটনা-গুলির অতিরিক্ত বিবরণ—বীমার দায় শোধের সঙ্গে বীমাকারী ও তাহার উত্তরাধি-কারীর জীবন-নাটকে যে আশ্চর্য্য রকম পরিবর্তন ঘটে সেটার ছবহু চিত্র দিয়ে মানুষকে জীবন-বীমার প্রতি উন্মুখ করে তুলতে হবে।

আমরা জানি ভারতীয় বীমা কোম্পানীতে বীমাপত্র বাতিল হওয়ার পরিমাণ খুব কম নয় এবং সে কারণে নিত্যকারিতার সঙ্গে কোম্পানী পরিচালনে যথার্থ সৃষ্টি হচ্ছে। গণ-সংযোগ দ্বারা পরীক্ষা করতে হবে —জনসাধারণ কোম্পানীকে ভাল ক'রে বুঝলে, প্রান্ত ধারণা দূরীভূত হ'লে, বিশেষ জরুরী এই বাতিল বীমার সংখ্যা হ্রাস করা যায় কি না;—আমাদের বিশ্বাস, যায়।

গণ-সংযোগ (Public Relations) কথাটি আমেরিকায় প্রথম প্রচলিত হয় বলে আমরা শুনেছি এবং যে উদ্দেশ্য নিয়ে কথাটির উৎপত্তি আমেরিকায় তার সাফল্যও দেখা গিয়েছে। দৈনন্দিন সংযোগ বা সম্পর্ক যদি আমরা বুঝে থাকি তা'হলে 'গণ-সংযোগ' কথাটির তাৎপর্য্য বুঝতে পারা কঠিন নয়। নামটা নূতন হ'লেও সে সম্বন্ধে ধারণাটা আমাদের বহু আগে থেকেই আছে।

গণ-সংযোগের উপাদানগুলির মধ্যে আছে (১) দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকায় বা প্রাচীর পত্রে সময়োচিত বিজ্ঞাপন প্রকাশ, (২) পুস্তিকা বা ঐ ধরণের মুদ্রিত কাগজপত্রের সাহায্য নেওয়া এবং (৩) সাধারণসভার মারফতে আপন আপন বক্তব্য বিষয়ের প্রচার, (৪) ছায়াচিত্রের মধ্য-দিয়া ছোট ছোট গল্প, ঘটনা ও বাস্তবজীবনের উদাহরণ দেওয়া, (৫) বেতারযোগে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনা, (৬) যে কোনও প্রকার জোগার সহিত আলাপ করা, (৭) লোকের মন কোনদিকে ঝুঁকছে সেটা নির্ণয় করা। বিভিন্ন বিভাগে এসকল কাজের ভাগ করে দিয়ে বিশেষজ্ঞের দ্বারা অথবা অনেকগুলি কাজ এক সঙ্গে ক'রে কয়েকটি বিভাগের দ্বারাও কাজ করতে পারে।

অফিসের মধ্যে গণ-সংযোগ নিয়ে যিনি কর্তৃত্ব করবেন তাঁর কর্তব্য হ'বে উপদেশ দেওয়া এবং সরাসরি ভাবে কোনও কোনও কাজ নিজের হাতে করা; তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পরিকল্পনা করা বা পরামর্শ দেওয়াই হবে তাঁর কাজ।

গণ-সংযোগের জোড়ার কথা তিনটি—এবং তার ব্যতিক্রমে স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। যথা:—লোকের সঙ্গে সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার ও কথাবার্ত্তা—এর মধ্যে এসে পড়ে টেলিফোন ও চিঠিপত্র লেখা। এ ব্যাপারে লোকের তুষ্টিবিধান করতে পারলে অর্দ্ধেক কাজ হাসিল হয়ে গেল মনে করা যেতে পারে।

গণ-সংযোগ ব্যাপারে অফিসের প্রত্যেক বিভাগের সহযোগিতা এবং বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সংযোগ ও সহকারিতা একান্ত আবশ্যক। যখন বিভাগীয় সহযোগিতা ও পারস্পরিক যোগাযোগ ত্রুটিশূন্য ও অবিচ্ছিন্ন হয় তখন অফিসের মধ্যে কার্য্যব্যপদেশে আগত সকলকে সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট করা খুবই সহজ হয়ে পড়ে। বীমাকারীদের মধ্যে কেহ অফিসে কোনও কাজে এসে যদি সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যান তাহলে নিজের অজ্ঞাতেই তিনি অপরকে নিজের সন্তুষ্টির কথা প্রচার করে থাকেন—এবং এতে করে সেই কোম্পানীর প্রতি অনুকূল মনোভাবের সৃষ্টি হয় জনসাধারণের মধ্যে—"গণ-সংযোগ"এর অন্যতম উদ্দেশ্য সাধিত হয় ক্রমশঃ লোকপরম্পরায়।

"গণ-সংযোগ" জীবন-বীমার ক্রমোন্নত পরিচালন-ইতিহাসের সম্প্রতি-সংযোজিত একটি বিশেষ অধ্যায়। কথাটির উৎপত্তিও খুব আধুনিক। সেজন্য আজকার দিনে জীবন-বীমা ব্যবসায়ে তৎপ্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। কোম্পানীর জীবনের এটি জীবন্ত প্রবহমান ধারা। যে-দায়ীত্ব প্রতিষ্ঠান হিসাবে বীমা কোম্পানীগুলি সমাজের কল্যাণে যে অতি মহৎ ও মূল্যবান কাজ করছেন, জন-সাধারণের মনে তৎপ্রতি শুভেচ্ছা ও বিশ্বাস সৃষ্টি করাবে এই "গণ-সংযোগে"র চেষ্টা। সেজন্য প্রত্যেক বীমা কোম্পানীর প্রধানতম লক্ষ্য যথাসম্ভব অধিক সংখ্যক লোক যাতে কোম্পানী সম্বন্ধে যতটা সম্ভব জানতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

সততার সঙ্গে সুনাম রক্ষা করাই গণ-সংযোগের লক্ষ্য। সেই কারণে গণ-সংযোগের কাজ হচ্ছে—জনসাধারণের মনে কোম্পানীর কাজকর্ম্মে কি প্রতিক্রিয়া হবে সেই দিক থেকে তার দৈনন্দিন পরিচালন ব্যবস্থা ও কাজকর্ম্ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করা এবং এমন রীতি পদ্ধতি অবলম্বনে সাহায্য করা যাতে ক'রে জনসাধারণের মধ্যে কোম্পানীর প্রসার সাধিত হয়।

গণ-সংযোগের নানাদিক আছে। এটা এমন একটা ব্যাপার নয় যে, আজ সূচনা

আসাম বেঙ্গল পেপার মিলস্

লিমিটেড

৭, হেষ্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন : এক কোটী টাকা

—ডিরেক্টর বোর্ড আছেন :—

১। কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর।
২। মণিপুরের রাজা শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সিং বাহাদুর।
৩। শ্রীযুক্ত মুকুন্দবিহারী মল্লিক, ভারতীয় গণ-পরিষদের সদস্য।
৪। শ্রীযুক্ত বিরাটচন্দ্র মণ্ডল, পাকিস্তান গণ-পরিষদের সদস্য।

এবং আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ম্যানেজিং এজেন্টস : এ, সি, মুখার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স লিমিটেড

ক'রে কালই তাকে পরিচালনা করা। এর দ্বারা চলবে ক্রমাগত; কোম্পানীর সঙ্গে জন-সাধারণের প্রীতিপ্রদ সম্বন্ধ গড়ে তোলা এর কাজ, সেই গড়ে তোলার কাজ চলবে ধীরে ধীরে, স্তরে স্তরে। এর সাফল্যের জন্য চাই, কোম্পানী ও তার কর্মচারীদের এবং গ্রাহক-গণের মধ্যে সহযোগিতা। তার অর্থ হচ্ছে এই যে, ক্রমাগত সমাজের মধ্যে আমাদের সেবা-কার্যের ইতিবিবরণ করা, প্রসার বৃদ্ধি করা। তাতে এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে যার জন্য বীমা-শিল্পের খ্যাতি বাড়বে এবং যাঁরা এ শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাঁদের সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

জন-সংযোগের প্রথম চেষ্টা হওয়া উচিত যাঁরা বীমার কাজে ব্রতী আছেন তাঁদের ওয়াকিবহাল করে তোলা। যদি বীমা-কর্মীরা শিক্ষিত হয় অভিজ্ঞ হয়, বীমা সমাজের যে কল্যাণসাধন করছে—তার বাণী জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে প্রস্তুত হয় তা'হলে আমরা অবিলম্বে আমাদের লক্ষ্য-স্থলের দিকে অনেকখানি অগ্রসর হয়ে যেতে পারব। আমরা অতি সাধারণ লোকের মনেও এ ধারণা জাগিয়ে দিতে পারব যে, জীবন-বীমা অনন্যসহায় বন্ধু।

কোনও কোম্পানী সম্বন্ধে সাধারণের বিরুদ্ধ সমালোচনা অথবা জীবন-বীমার লাভ ও সংরক্ষণ শক্তি সম্বন্ধে অপপ্রচার অতীতে যে না হয়েছে তা' নয়। এই প্রকার সমালোচনা বা অপপ্রচারের মূলে আছে বীমা সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানের অভাব বা দুরভিসন্ধি। কারণ যাই হোক না কেন—ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, লাভ্রিই কোম্পানী এতে সাধারণের আস্থা হারিয়েছেন অনেকখানি। হতে পারে উক্ত প্রচার বিদ্বেষ বা উদ্দেশ্যমূলক কিন্তু তাতে কোম্পানী খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং সাধারণের চোখে অনেকখানি নেমে গেছেও হয়েছে। কিন্তু জনসাধারণ যদি আসল ঘটনা আগে থেকে জানতে পায় এবং বস্তুতঃ ব্যাপারটা কি বুঝতে পারে তা'হলে বিদ্বেষ-মূলক প্রচারকার্য বা মিথ্যা বিবরণ দিয়ে জন-সাধারণকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ অনেকখানি কমে যাবে।

যে সকল কোম্পানী জনসাধারণের অসুবিধা দূর করার কথা চিন্তা করে তাদের মতামত জানবার আগ্রহ আছে সেখানে জন-সংযোগের কাজ সুচারুরূপে সম্পাদিত হ'তে পারে। সেক্ষেত্রে জন-সংযোগকে বলা যেতে পারে "a finger on the pulse of public opinion." অর্থাৎ সোজা কথায় বলতে গেলে বলতে হয় জনমতের নাড়ী-জ্ঞান জন-সংযোগেরই আছে।—দিনের পর দিন জনমত কিভাবে এবং কোন পথে পরিবর্তিত হচ্ছে—সেটা জানা জন-সংযোগের পক্ষেই সম্ভব।

বস্তুতঃপক্ষে জীবন-বীমা সম্বন্ধে সাধারণ লোকের ভ্রান্ত ধারণা এমনি প্রবল যে, বীমা কোম্পানীর কোনও কার্যেরই বুদ্ধি বিবেচনাহীন প্রচারকার্য যথাযথ আলোলনকে আমরা কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারি না। "জন-সংযোগ"কে জনসাধারণের ভ্রান্ত ধারণা, মিথ্যা প্রচারে আস্থা স্থাপন, অজ্ঞতা প্রভৃতি দূরী-করণের দায়িত্ব গ্রহণ করতেই হ'বে।

জন-সংযোগের বিভাগীয় কর্তব্য হবে—

(১) জনসাধারণের অনুযোগ অভিযোগ সম্বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা করা

(২) জনসেবা ও তার বিস্তৃতির দিকে লক্ষ্য রাখা

(৩) বীমাকর্মী ও এজেন্টদের শিক্ষিত করার ব্যবস্থা করা

(৪) সাধ্য তালিকা বচনা, মৃত্যু বা জীবনকালে প্রাপ্ত টাকার অঙ্ক ও প্রাপকের নামের তালিকা, মৃত্যুর সঙ্গলতা দাবি, দেশের স্বাস্থ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও নিখুঁতভাবে বিবরণ, বাস্তবজীবনে সফলতা লোকের জীবন-বীমার সার্থকতার দৃষ্টান্ত ইত্যাদি

(৫) অফিসের মধ্যে সহযোগিতা, সহকারিতা ও সম্প্রীতির উৎকর্ষ-সাধন।

(৬) বীমাকারীদের সহিত এক একবারে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা।

১৯৪৮ সাল থেকে লেখক কোনও একটি শ্রেষ্ঠ বীমা কোম্পানীতে জন-সংযোগের কাজ করে আসছেন। অভিজ্ঞতা থেকে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, যে কোনও বীমা কোম্পানীর পক্ষে এ ব্যবস্থা অপরিহার্য। দৈনন্দিন কাজে অফিসের কর্মচারীদের মধ্যেই সহযোগিতা পাওয়া যায়—বীমাকারিগণও

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

আমেরিকান হোমিওপ্যাথিক ও আমেরিকান ঔষধ, ইংলণ্ডী, বাংলা, বিলে ও ইন্ডিয়ে কেমিক্যাল সুলভমূল্যে এবং অন্যান্য ঔষধাদি বিক্রয় করিয়া থাকে।

বি, সি, ঘর এণ্ড ব্রাদার্স লিঃ

৮১, মেছুয়া বাজার রোড, কলিকাতা।

দেশের জাতীয় সরকারের কর্মচারীরা যে এখনও ঘোড়াগাড়োয়ানদের মতন করিতে চাহারের যথাশক্তি নিয়োগ করিতে বদ্ধ-পরিকর নহেন, কংগ্রেসী লাট বড়লাটদের অবাধিত হস্তক্ষেপে শক্তিমন্ত্র ব্যবস্থা পরিবর্তে দুর্নীতি গ্রাহ্য মাফেতিং বিল বা ঘোড়াবাজার মহন বিলের সোসেলিস্টিক অনুচ্ছেদের ব্যবস্থা দেখিয়া তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়েছি।

অতএব লক্ষণ; তবে কাজের প্রচলিত রীতি-পদ্ধতির পরিবর্তনের অনেক অবকাশ আছে বলে আমাদের বিশ্বাস। লেখক চাই কর্তৃপক্ষের তৎপরতা ও সজাগ মনোভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত থাকার আন্তরিক চেষ্টা। চেষ্টার ত্রুটি না থাকলেও ব্যবস্থার ত্রুটি সংশোধনের যেখানে প্রয়োজন আছে সেখানে আধুনিক মন নিয়ে বিষয়গুলির সম্মুখীন হতে হবে, নিত্য নূতন সমস্যার সমাধান করতে হ'বে—জনসাধারণের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে—, যে কাজের সুষমা ও পরিণতির পথে জন-সংযোগের প্রয়োজন ও সার্থকতা অবিসম্বাদিত।

সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিমিটেড

এবং

ব্যাঙ্ক অফ ময়মনসিংহ, গৌরীপুর লিঃ

সংযুক্ত

চেয়ারম্যান :—শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত, আই. সি. এস (অবসরপ্রাপ্ত)

ভাইস-চেয়ারম্যান :—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বি. এ
ডিরেক্টার, হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

ম্যানেজিং ডিরেক্টার
শ্রীদেবিদাস রায়

জেনারেল ম্যানেজার ও সেক্রেটারী
শ্রীসুরেন্দ্রকুমার মিত্রৌধী

ভারতে ইন্‌ফ্লেশন

শ্রীসন্তোষকুমার বসু

সবচেয়ে যে কথাটি আজ সবাইকে বেশী পরিমাণে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে, তাহা হইতেছে 'ইন্‌ফ্লেশন' অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি। যুদ্ধের সময় এদেশে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন হ্রাস পায়, আর অপর পক্ষে পণ্য মূল্যের মান ক্রমেই বাড়িতে থাকে এবং যুদ্ধকালীন টাকার এই কাঁপা বাজারকেই "ইন্‌ফ্লেশন" বলা হইয়া থাকে। যুদ্ধ শেষ হইয়াছে প্রায় ৩ বৎসর হইতে চলিল—অথচ এর ঝোঁক এখনো তারতবর্ষ সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই; উপরন্তু গত কয়েক মাস ধরিয়া এর ক্রমাবনতিই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। তাই সরকার, দেশনায়কীয় ব্যক্তি, অর্থনীতিবিদ সবাই বিশেষ আগ্রহের সহিত এর সমাধানে তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন।

মোড়ার কথা

(১) মুদ্রাস্ফীতির সময়ে কাগজী মুদ্রার সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলে। ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বরের হিসাবে জানা যায় প্রচলিত কাগজী মুদ্রার পরিমাণ ছিল ১৭১'৫৮ কোটী টাকা। জানুয়ারী মাসে ছিল ৯৩৭ কোটি টাকা। এতে দেখা যায় যে, এই নয় মাসে মুদ্রার চাহিদা ৫ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রচলিত মুদ্রা আসে বাড়িয়া গত জানুয়ারী (১৯৪৭) ১২০৭ কোটী টাকায় দাঁড়ায়। এ হইতে আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে, পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৪৭ সালে ৭ গুণ বৃদ্ধি পায়। এই বর্ধিত টাকার আমদানী হিসাবে ১৯৩৯ সালে ২৮% এবং তারা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪৫ সালে ৮৮% দাঁড়ায়।

(২) শিল্প প্রসারের দিক হইতে ভারত অনেক পশ্চাৎপদ। যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া আমাদের প্রয়োজন মিটাইতে হইত। কিন্তু যুদ্ধের সময় বিদেশী আমদানী বন্ধ হইয়া যায়, উৎপাদনও হ্রাস পায়। তথাপি যুদ্ধশক্তিকে সাহায্য করার কাজে যে কোন মূল্যে "বেন তেন প্রকারেণ" প্রয়োজনীয় পণ্যাদি সরবরাহ করিতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নাই। তাঁহারা টাকাকে টাকা বলিয়াই গ্রাহ্য করেন নাই। সেই সুযোগ লইয়া এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি নিজেদের স্বার্থ পুষ্ট করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন এবং অল্পকালের ভিতরই এঁরা পুঁজিপতির কোঠায় পা বাড়াইতে লাগিলেন। যোগান এবং চাহিদার তারতম্যের উপর পণ্যমূল্য নির্ভারণ হইয়া থাকে। যুদ্ধকালীন সস্তা টাকার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ পণ্যমূল্য বাড়িয়া যায় এবং মুদ্রাস্ফীতির ভাব এখনো কাটিয়া উঠিতে পারে নাই বলিয়া পণ্যমূল্যের অগ্নিমূল্য এখনো হ্রাস পাইতেছে না।

(৩) যুদ্ধের সময় যানবাহনের উৎপাদন কমিয়া আসিয়াছিল এবং যুদ্ধের পরও তাহা সমানভাবেই চলিতেছে। ১৯৪৫ সালে চাউল, ডাল, গম, যবজা, কৃষি, খনি ইত্যাদি বিলাইয়া তারতে প্রধান যানবাহনের মোট উৎপাদন দাঁড়াইয়াছিল—৪ কোটী ৪০ লক্ষ টন। ১৯৪৬ সালে তাহা হ্রাস পাইয়া ৪ কোটী টন এবং ১৯৪৭ সালে ৪ কোটী ১০ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। কেবল কৃষিক্ষেত্রেই নহে, শিল্পক্ষেত্রের দিক হইতেও তারতে যথেষ্ট ক্রমাবনতি পরিলক্ষিত হইতেছে। ১৯৪৫ সালে কাপড়ের কলসমূহে ৪৮০ কোটী গজ বস্ত্র উৎপন্ন হয় এবং বর্তমানে বস্ত্রের বাৎসরিক উৎপাদন হ্রাস পাইয়া ৩৮০ কোটী গজে দাঁড়ায়। উপাদের উৎপাদন ১১ লক্ষ ৮০ হাজার টন হইতে ৮ লক্ষ ৭০ হাজার টনে এবং সিমেন্টের মাসিক উৎপাদন ১ লক্ষ ৩০ হাজার টন হইতে ১ লক্ষ ১২ হাজার টনে নামিয়া গিয়াছে। একেই দেশে উৎপাদন কমিয়া যাইতেছে, তারপর বিদেশী আমদানীতে বাধানিষেধ, অতএব উহার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ পণ্যদ্রব্যের অভাব এবং সঙ্গে সঙ্গে মূল্য বৃদ্ধি ঘটিতেছে।

(৪) মুদ্যমান দেশগুলিকে স্বভাবতঃই দুইটী কারণে মুদ্রাস্ফীতির অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। প্রথমতঃ সরকার যুদ্ধের প্রয়োজনে যে কোন মূল্যে সামরিক পণ্যাদি ক্রয় করিয়া থাকেন। পণ্যের যোগান কম হওয়ায় চড়া দামেই তাঁহাদের কিনিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ সামরিক কার্যে নিয়োজিত সৈন্যদের বেতন ও মাগ্‌গী ভাতা এবং পুরাতন লোকদের মাগ্‌গী ভাতা ইত্যাদিতেও প্রভূত অর্থ ব্যয়িত হইত। এই বিপুল ব্যয়ভার বহন করিবার নিমিত্ত সরকারকে বাধ্য হইয়াই নোট ছাপানোর ব্যাপারে রক্ষণশীলতা শিথিল করিতে হইয়াছিল এবং প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়াছিল।

(৫) প্রত্যেক দেশেই যুদ্ধের ব্যয়ভার মিটাইতে অধিক পরিমাণে নোট ছাপাইতে হয়। যুদ্ধের প্রথম বৎসরে তারতেও হাজার কোটী টাকার বেশী নোট ছাপাইতে হইয়াছিল। কিন্তু নোটের জামিন হিসাবে সরকারী কোষাগারে পূর্বের ন্যায় স্বর্ণ-সম্পদ কিছুই রক্ষা করা হইত না। ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে ১৮৮ কোটী টাকার নোটের পরিবর্তে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে ৪৪ কোটী ৪১ লক্ষ টাকার স্বর্ণ ছিল। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে নোটের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২০৭ কোটীতে, অথচ সে অনুপাতে সঞ্চিত স্বর্ণ-সম্পদের পরিমাণ এক কপর্দকও বাড়ে নাই। ১৯৪৭ এর ৭ই ফেব্রুয়ারীর হিসাবে জানা যায় যে, ১২০৭ কোটী টাকার সঞ্চিত সিকিউরিটির হিসাবে ১১৫৪ কোটী ৩২ লক্ষ টাকার জমা ছিল। এই টাকার কোন মূল্যই দেওয়া যাইতে পারে না, যেহেতু নগদ মুদ্রা নয়। একথা বলিলে অতিশয়োক্তি করা হইবে না যে, মুদ্রাস্ফীতির একটি কারণ এই টাকা জমাও বটে।

(৬) সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি যদি ব্যক্তি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে অধিকমাত্রায় ঋণ প্রদান করিতে আরম্ভ করেন এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি বেশী পরিমাণে বাজার হইতে সিকিউরিটি ক্রয় করিতে থাকে, তবে দেশে টাকার ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। জনসাধারণ যদি তাহাদের সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিতে আরম্ভ করে এবং যৌথ কোম্পানীসমূহ অতিরিক্তমূল্যে শেয়ার প্রদান করিতে থাকে, তবে তাহাতেও কিছু পরিমাণ অর্থের যোগান বাড়িতে পারে। ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ব্যাঙ্কসমূহে ব্যবহার্য্য ঋণের পরিমাণ ছিল ৪১৩ কোটী টাকা। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাহা ৪৯৮ কোটীতে দাঁড়ায়।

(৭) সরকারী বাজেটে ঘাটতি রেখা গেলে সরকার নিজেদের আদায় বা সঞ্চিত নগদ তহবিল খরচ করিলে দেশে বেশী অর্থ প্রসারের কারণ ঘটিতে পারে। সর্বোপরি নূতন নোট ও টাকা ছাড়িবার যে ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তথা সরকারের রহিয়াছে, তাঁহারা তাঁহাদের সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াও দেশের অর্থ প্রচলন বাড়াইয়া দিতে পারেন।

(৮) স্বর্ণঘটের ফলে উৎপাদন অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়। স্বর্ণঘটের ব্যাপকতা। একটি তালিকা দিয়া দেওয়া গেল :—

বৎসর	কত তারিখে	কতদিনের তরে
	বন্ধ হইয়াছিল	বন্ধ হইয়াছে
১৯৩৯	৪০৬	৪৯,৯৪,৭৯৪
১৯৪০	৩৫২	৭৫,৭৭,৪৮১
১৯৪১	৩৫৯	৬৮,৩৩,৪৩০
১৯৪২	৬৪৪	৪৩,৭৯,২৬২
১৯৪৩	৭১৬	৪৩,৪১,২৮৭
১৯৪৪	৬৪৮	৩৪,৪৭,০৭৬
১৯৪৫	৮৫০	৪৭,৫৩,৪২৮
১৯৪৬	১,৬৪৯	১,২৭,১৭,৭৬৫
১৯৪৭	৩,২৪১	১,৯৫,৪৪,৩৬৯
১৯৪৮(মে পর্যন্ত)	৭৫৯	৪৭,৭০,৬৬৭

(৯) সিডিউল্ড ব্যাঙ্কগুলিতে চাহিদাজাত পরিশোধনীয় দায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৮-১৯৩৯ সালে উহার

পরিমাণ ছিল ১০০ কোটী টাকা; উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪৪-৪৫ সালে ৫৮৯ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪৫-৪৬ সালে ৭২৬ কোটী টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৪৬ সালের ১৫শে জুনে, ১৯৪৭ সালের ২৭শে জুনের তুলনায় ১১৩ কোটী টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৭৮০ কোটী ৭০ লক্ষ টাকায় উঠে। এগুলি ভারত ও পাকিস্থানের যুক্ত হিসাব। এর পর ১৯৪৮ সালের ২৫শে জুন উহার পরিমাণ ৬৯৩ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা ছিল।

(১০) যুদ্ধোদ্যমে সরকারী ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অথচ সেই অনুপাতে কর ধার্য্য করিয়া অতিরিক্ত ব্যয় পূরণ করা যায় নাই। আরো একটি কথা হইতেছে যে, বিদেশে অর্থ বিনিয়োগের মাত্রা বৃদ্ধি। মিত্র-শক্তির পক্ষে যুদ্ধসামগ্রীর যোগান দিতে যাইয়া ভারত সরকারকে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হয়। অবশ্য যে-সাময়িক খাতে বাবিয়া উহা ঋণ হিসাবে ইহার কতকটা শোধ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এইভাবে বিদেশে যে কি পরিমাণ অর্থ নিয়োজিত হইল, যুদ্ধের কয়েক বৎসরের প্রাপ্য হাতিয়ে হইতেই তাহা সম্যক উপলব্ধি করা যাইবে।

বাজারে

ভারত সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টার বিবৃতি অনুযায়ী ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে খাদ্যমূল্যের সূচক সংখ্যা ১০০ ধরিলে ১৯৪৭ সালের ৪ঠা জানুয়ারী উহা ২৬৮'৪ হইয়াছে। মুদ্রাস্ফীতির এই দ্রুতর গতিকে প্রতিরুদ্ধ করিতে হইলে ধনিক সমাজের নিকট হইতে সক্রিয় সহযোগিতা আবশ্যক। সেটা যখন সুদূরপরাহত, তখন শিল্পপতিদের হাতের টাকা কমাইবার জন্য চোরাকারবার বন্ধ, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তৎপর হইতে হইবে। যুদ্ধের লেলিহান শিখা ভারতকেই গ্রাস করিয়াছে সর্বাধিক পরিমাণে। এখন কি যুদ্ধরত ব্রটেনেও এমন অবস্থার উদ্ভব হয় নাই।

খাদ্যদ্রব্য মূল্য ও জীবনযাত্রা ব্যয়ের তুলনামূলক সংখ্যা

বৎসর	ভারতবর্ষ মূল্য—ব্যয়	যুক্তরাজ্য মূল্য—ব্যয়	যুক্তরাষ্ট্র মূল্য—ব্যয়
১৯৩৮	৯৯—১০২	১০৯—১০২	১০০—১০২
১৯৩৯	১০৩—১০২	১০৯—১০৩	১০১—১০৩
১৯৪০	১২১—১০৮	১৪০—১২০	১০৩—১০১
১৯৪১	১৩১—১২০	১৫৭—১৩০	১১৫—১০৯
১৯৪২	১৮৭—১৫১	১৬৫—১৩৮	১২৯—১১৮
১৯৪৩	৩১১—২২০	১৮৭—১৪৯	১৩৫—১২৫
১৯৪৪	৩৩২—২২৯	১৯১—১৩১	১৩৬—১৪৭
১৯৪৫	২৯৫—২২৭	১৯৪—১৩৫	১৩৬—১৩৩
১৯৪৬	৩৫৯—২৪০	১৯৩—১৩২	১৪৬—১৪১
১৯৪৭(জা:)	৩৭৭—২৪৮	১৯৭—১৩৩	১৪৫—১৪৩

উৎপাদনের স্বল্পতায় ভিন্ন দেশের অর্থ প্রসারণের গতি স্বভাবতই পণ্যমূল্যের তীব্র বাড়াইয়া দিয়াছে এবং দিতেছে। যুদ্ধ বন্ধের মাসে জিনিষপত্রের পাইকারী দর যাহা ছিল, পর বে মাসে তাহা সমষ্টিগতভাবে ১১% বৃদ্ধি পাইয়াছে। খাদ্য সামগ্রীর মূল্য ঐ সময় শতকরা ১৭ ভাগ বাড়িয়াছে। ব্যবসায়ী কাঁচামালের দর ১৭% ভাগ বাড়িয়াছে। তৈয়ারী মালের মূল্য ১৩% বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বর্দ্ধিত দামের সহিত জীবনযাত্রা ব্যয় প্রসারের খাপ খাওয়াইয়া উঠান যাইতেছে না। শ্রমিক, মজুর, কেরানী, চাকর সকলেই মাসিক বেতনের জন্যে একটির পর একটি দাবী পেশ করিতেছে। পরই তাদের দাবীদাওয়া মিটান হউক না কেন, কিছুতেই তাহারা নিজেদের স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে পারিতেছে না। বাজারের এই ক্রমবর্দ্ধমান মূল্যের গতির সহিত তাহাদের চলা সবাই এক দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে।

মাসের এই অগ্নিমূল্য সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। কাগজের মারফৎ কিছুদিন আগে একটি সংবাদ পরিবেশিত হইয়াছিল যে, "ফিল্ম ডিলার্স এসোসিয়েশনের" উদ্যোগে ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে মাসের একটি নির্দ্দিষ্ট দর বাঁধিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু বাজারে গিয়া সে আশা বৃথা হইল—পূর্বদিনের তুলনায় আজ আরো আকারায় কিছুটা হইতেছে। জানিনা এই এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতার কতদূর করিয়াছি। তবে জনসাধারণের কাছে কি আমি অনুরোধ করিতে পারি না যে, তাঁহারা অন্ততঃ ১ সপ্তাহের জন্য মাছ খাওয়া হইতে বিরত থাকুন? এইভাবে ফিল্ম ডিলার্সের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকার সার্থকতা কোথায়? কয়েকদিন এই ধারায় চলিলে আবার নিশ্চিত বিশ্বাস মাছের দর নামিয়া আসিবে। অবশ্যি এই সময়টা মাছের বদলে অন্য জিনিষ দিয়া তাহার স্থান পূরণ করা যাইতে পারে।

সমাধান

মুদ্রাস্ফীতি আজ ব্যাপক সঙ্কটরূপে সমগ্র দেশকে গ্রাস করিতে উদ্যত। অতিরিক্ত অর্থের প্রসারণ, উৎপাদন হ্রাস, বর্দ্ধিষ্ণু ব্যয়-বিস্তারের ফলে মূল্য স্ফীতের ভারসাম্যের অভাব, সরকারের আমদানী কর ও রপ্তানীতির ফলে মূলধন সঞ্চয়ে বাধা প্রভৃতি কারণে স্বাধীন ভারতেও সাধারণ লোকের জীবনকে মিলিয়ে করিয়া মুদ্রাস্ফীতি ভয়াল হইয়া উঠিয়াছে। এই দুরবস্থাকে রুখিতে হইবে। নিম্নে কতকগুলি পথ নির্দ্দেশিত হইল :—

(১) নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন :—ভারত খাদ্যের দিক হইতে যেরূপ সঙ্কটময় অবস্থার ভিতর দিয়া অতিক্রান্ত হইতেছে, তাহাতে নিয়ন্ত্রণ প্রথা সর্ব্বত্র চালু করাই বুদ্ধিমানের কাজ হইবে। এর মধ্যে চাউল, ময়দা, গম, চিনি, কাপড়, জোয়ার, বস্ত্র, তৈল, লবণ, ঘি ইত্যাদি নিত্যব্যবহার্য্য সবগুলি জিনিষই পড়িবে। ভারতের ঘাটতি অঞ্চলগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে ইহা অতি প্রয়োজন। শেষ বিভাগের পর ভারতে মোট ঘাটতির পরিমাণ ৩০ লক্ষ টন, অপর পক্ষে পাকিস্থানের উদ্বৃত্তের পরিমাণ ২৪ লক্ষ টন। ভারতের এই ঘাটতি মিটাইতে হইলে বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হইবে। আমার আমদানীকৃত খাদ্যশস্য যাহাতে সমভাবে এবং প্রয়োজনানুরূপ যাহিত হয়, সেজিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে অর্থাৎ "নিয়ন্ত্রণ প্রথা" প্রচলন অপরিহার্য্য। শুধু খাদ্যশস্য নয়, অন্যান্য সব জিনিষের 'পরই 'কনট্রোল' প্রবর্তন করিতে হইবে। আমরা স্বাধীনতার নামে বলিব একমত, তথাপি বলিব, "দেশে চোরা-কারবারী, মুনাফাখোর, সাধারণ সরবরাহ নায়েস্তা না হইবে, ততদিন 'নিয়ন্ত্রণ' প্রথার আশু ফল পাওয়া সম্ভব ও সহজসাধ্য ব্যাপার হইবে না।" বহুর উপর পুনঃনিয়ন্ত্রণ আরোপ করিলেই এই ভিত্তি অতিক্রান্তের পুনরালোচনা করিব।

(২) আয়কর ধার্য্য :—শিল্পপতি, বণিক, ধনিক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উপর এমন আয়কর বসাইতে হইবে, যাহাতে তাঁহারা টাকার গরমে কাঁপিয়া না উঠিতে পারেন। দরিদ্র সাধারণ ভারতবাসীর "মাথার উপর কাপড়ের আঁটি" না বসানোর নীতিই অধিকতর কার্য্যকরী ও সাধনসক্ষম হইবে।

(৩) চোরাকারবার দমন :—শিল্পপতি, ধনিক সম্প্রদায়ের হাতে টাকা যথেষ্ট পরিমাণে না থাকিলে চোরাকারবারে লগ্নী করিয়া টাকিতে পারিবে না—ক্ষুধা আজে আজে সমাজের অঙ্গস্বরূপ এই মুদ্রাস্ফীতি রোধ হইয়া আসিবে।

(৪) জাতীয়করণ :—শিল্প, কারখানা প্রভৃতি জাতীয়করণ করিতে হইবে। সরকারের হাতে উৎপাদন ও তাহার যথোপযুক্ত বণ্টন করিবার অধিকার থাকিবে। তাহাতে একদিকে উৎপাদন বাড়িবে, অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। সরকারের ১০ বৎসরের মধ্যে জাতীয়করণ পরিকল্পনা অন্তের তাল হিসাবে আমরা গ্রহণ করিতেছি। আরো একটি কথা, জাতীয় যুক্তরাষ্ট্র এমন কতকগুলি অসুবিধার মধ্য দিয়া চলিতেছে, যাহার জন্য তাহার এর বেশী কিছু করা বুদ্ধিমানের কাজ হইত না। "সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে"—এ যুক্তিটা এখানে খুবই মিলিয়া গিয়াছে।

(৫) বাজেটে ঘাটতি :—বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের জন্য ভারত সরকারের ১৯৪৮-৪৯

সাল পর্য্যন্ত মোট ঋণ হয় ১৭৭০ কোটী টাকা। ইহা ছাড়া ১৯৩৯—৪০ সাল হইতে ১৯৪৫—৪৬ সাল পর্য্যন্ত ভারত সরকারের বাজেটে ৭৯৫ কোটী টাকা ঘাটতি পড়ে। ইহার ফলে মোটের উপর ভারত সরকারের যুদ্ধকালীন অর্থ ব্যবস্থার ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫৩৫ কোটী টাকা। অবশ্য এই সময়ে 'ডিফেন্স বণ্ড' প্রভৃতি ঘাটতির পরিমাণ ১,২০৩ কোটী টাকা হ্রাস পাইয়া ১২৯২ কোটী টাকায় দাঁড়ায়। গত ফেব্রুয়ারী মাসে অর্থসচিব শ্রীযুক্ত চৌধুরী যে বাজেট পেশ করিয়াছেন, তাহাতেও ঘাটতির পরিমাণ আছে ২৮ কোটী ৮৫ লক্ষ টাকা। একদিকে বাজেটে ঘাটতি, অন্যদিকে জাতীয় দুঃখে বার্ষিক ১ কোটী টাকা চলে যায়, ৫৫ লক্ষ বাস্তুহারার ভাসমান, আরও ইত্যাদিতে একটা মোটা টাকা ব্যয়িত হইবে। এ ছাড়া লণ্ডনস্থ হাইকমিশনারের ৫০,০০০ হাজার টাকা দিয়া একখানি "ইকোনাই" মোটরগাড়ী, গভর্ণর জেনারেলের মাসিক বেতন ৯৯ হাজার টাকা ইত্যাদি আপত্তিকর। একটির পর একটি শুধু বাড়াইয়া মন্ত্রী নিয়োগ করা হইয়াছে। অতএব এখনিই যদি বন্ধ করিতে না পারিলে মুদ্রাস্ফীতি রুখিবার আশা কোথায় ?

(৬) উৎপাদন বৃদ্ধি :—গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধকালীন "Grow More Food Campaign" কথা পালিত করিতে হইবে। বিদেশ হইতে চাউল, লবণ, তৈল, বস্ত্র, চিনি, দিয়াশলাই ইত্যাদি কতকগুলি অপরিহার্য্য জিনিষের উৎপাদন বাড়াইতেই হইবে। কৃষি-জাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে ভারত অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে। দামোদর, ময়ূরাক্ষী ইত্যাদি পরিকল্পনা এই দিকেই সাহায্য করিবে। পরিকল্পনা ও সর্ব্বাঙ্গীণ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য একাধিকবার জনসাধারণের কাছে অনুষ্ঠ আবেদন জানাইয়াছেন এবং শ্রমিক-শ্রমিক বিরোধ যাহাতে না ঘটে সেজন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন।

(৭) কুটীর শিল্পের প্রসার :—অল্প মূলধন এবং মূলধনে, অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত উৎপাদন করিতে হইলে "কুটীর শিল্প" সেদিক দিয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়। ভারতবর্ষে লক্ষকরা ৮০ জনেরও বেশী শ্রমিক ; অথচ উপযুক্ত মজুরীর নাই যে তাহা দ্বারা উন্নত ধরণের, কারুকার্য্য করিতে পারেন। বিশেষ করিয়া পশ্চিম বঙ্গে বাস্তুহারাদের যে ভীড় জমিয়াছে, তাহাদের অন্নসংস্থান করিতে হইলে কুটীর শিল্পের প্রসার অবিলম্বে প্রয়োজন, নতুবা পূর্ব্ববঙ্গের এই হতভাগাদের প্রাণ রক্ষার পরাস্তর নাই।

(৮) যন্ত্রপাতি আমদানী :—বিদেশ হইতে উপযুক্ত পরিমাণে বিদেশী যন্ত্রপাতি আনাইয়া উন্নত ধরণের কৃষি, শিল্প ইত্যাদিতে অগ্রসর হইতে হইবে। বৃটিশ সরকারের সহিত ডলার ব্লকের ব্যালেন্স পাওনার সময় এ বিষয়ে একটি চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল ; কিন্তু তথাপি ডলারের সহিত ব্লকিত ব্যালেন্স হইতে ভারত ইচ্ছামত টাকা আদায় করিতে পারেন নাই। ৮ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ডের মধ্যে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের কলকব্জা তাঁহারা সরবরাহ করিতে সম্মত হইয়াছেন। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের বিবৃতি হইতে আরো বুঝা যায় যে, আমাদী কিছুদিন তাঁহারা বৎসরে ৫০ কোটী টাকার অধিক মূল্যের কলকব্জা ভারতবর্ষকে সরবরাহ করিতে সক্ষম হইবে না। তাহার তাই যুক্তরাষ্ট্র, চেকোস্লোভেকিয়া, জাপান ইত্যাদি দেশের সহিত বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছে।

(৯) আমদানী বাণিজ্যের প্রসার :—ভারত সরকারকে আমদানী বাণিজ্য নীতি সম্পর্কে কিছুটা শিথিল হইতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত ভারত সরকার আত্মনির্ভরশীল হইতে না পারে, ততদিন প্রয়োজন বোধে অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কতকগুলি জিনিষ বিদেশ হইতে আমদানী করিলে বাস্তবিক ভুল করা হইবে না। মুদ্রাস্ফীতির দিক হইতেও তেমন ভয়ের কারণ নাই।

(১০) সঞ্চয়ে উৎসাহ দান :—জন-সাধারণকে তাহাদের আয়ের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ে উৎসাহ দিতে হইবে। সরকার স্বল্পকাল মেয়াদি সার্টিফিকেট, প্রাইজ বণ্ড, ডিফেন্স বণ্ড, ডিফেন্স সার্টিফিকেট প্রভৃতি দ্বারা জনসাধারণের দৃষ্টি এদিকেই টানিতেছেন।

(১১) সরকারের সহিত সহযোগিতা :—পরিশেষে, সরকারের মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে অভিযান একমাত্র জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা দ্বারাই সম্ভব। তাই পূর্ব্বোক্ত সব গুলি কার্য্যকরী করিতে হইলে, চোরাকারবারী, মুনাফাখোর, ধনিক সমাজের বিরুদ্ধে এই অভিযানকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে হইলে সর্ব্ব শ্রেণীর জনসাধারণের কাছ হইতে 'সহযোগিতা' একান্ত প্রয়োজন।

মুদ্রাস্ফীতি দমনকল্পে ভারত সরকার একটি অর্থনীতিবিদ্‌দের কমিটি আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহারা ও শ্রীজগৎপ্রকাশ নারায়ণ, অধ্যাপক রয়, শ্রীবিনয় সরকার যে সব পন্থা সুপারিশ করিয়াছেন আমরা আশা করি সরকার অচিরেই তাহা কার্য্যকরী করিবেন।

রাষ্ট্রপতির dignity রক্ষার জন্য বেহিসাবীভাবে অতিরিক্ত বেতন ও ভাতা ধরাও করার এই বুদ্ধি নিতান্তই অদ্ভুত। আড়ম্বরহীন জীবনযাত্রা ও নামমাত্র কটিবাস পরের যে দেশে মহাত্মা গান্ধীকে আপামর জনসাধারণ জাতির জনক ও গুরু হিসাবে পূজা করিয়াছে সে দেশে মোটা মাহিয়ানা অনুসারে রাষ্ট্রিক ডিগনিটি ও ব্যক্তিগত মর্য্যাদা রক্ষার এই নূতন মাপকাঠি সৃষ্টি করিয়া পণ্ডিত নেহেরু কংগ্রেসের সমুচ্চ আদর্শকে ধূলিসাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

সিটিজেন্স অব ইণ্ডিয়া
মিউচুয়াল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ
একটি প্রগতিশীল
জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান
চীফ অপারেটিং অফিস :
১৭৭-এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা।
শ্রীপি, গ্রেস, নাম্রাক্রণ,
জেনারেল ম্যানেজার।
শ্রীএইচ, চক্রবর্ত্তী, বি-এল,
সেক্রেটারী।
শ্রীপি, চক্রবর্ত্তী, বি-এ,
এজেন্সী ম্যানেজার।

সোভিয়েট কৃষি ও বিজ্ঞান

শ্রীরেবেন্দ্রনাথ মল্ল, এম-এস্‌সি

সোভিয়েট রাশ্যা আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শক্তি, কিন্তু মাত্র ছিল বছর আগেও রাশ্যা এমন দেশ ছিল না। জারের যুগে রাশ্যার নামে ইউরোপের প্রত্যেক দেশের লোক ঘৃণায় নাসিকাকুঞ্চিত করত। সে যুগে বাস্তবিকই রাশ্যা অতি অনুন্নত ছিল। শিক্ষার কোন সুব্যবস্থাই ছিল না। দেশের লোকের নৈতিক চরিত্র ছিল অতি নিম্নে। মেয়েরা খোটখাট উপার্জন করত আর পুরুষরা তাদের ঘাড়ে বসে খেত, আর খেলা করে বেড়াত; কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে হঠাৎ দেশের চাকা ঘুরে গেল। রাশ্যার লোক যেন উপলব্ধি করতে লাগল সারা বিশ্ব তাদের অবজ্ঞা করে। তারপর প্রথম মহাযুদ্ধের ঢাকঢোল বেজে গেল বিশ্বের গগন ভিরে। রাশ্যার হাজার হাজার ছেলে মেয়ে পিতৃমাতৃহীন হলো। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান এরা সব থেকেই বঞ্চিত। দেশ এদের প্রতি উদাসীন। যখন এই ভিখারী বেজপ্রিজোরিদের দল দেখলে সরকারিভাবে তাদের জন্যে কিছুই করবে না, তখন তারা এক বিরাট দল গড়ে বসল। এই দল পঙ্গপালের মত এক এক জায়গায় গিয়ে পড়ে আর লুঠতরাজ করে। দেশের লোক এদের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল; কিন্তু এমন বেশীদিন চলো না। দেশের কয়েকজন উচ্চমনস্কলোক এদের নিয়েই রাশ্যাকে পৃথিবীর একটী আদর্শ দেশে পরিণত করার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। এর পরেই নেতারা নিজেদের একটী দল গড়ে নিয়ে কাজ সুরু করে দিলেন।

গত প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক পরেই দেশের চারদিকে শিক্ষাগুরু গড়ে উঠতে লাগল, নবীনপন্থী নেতারা বুঝেছিলেন,—ওঁদের দেশের অধোগতির মূল কারণই হলো শিক্ষার অভাব। "Mass education"-এর ব্যবস্থা না করলে দেশের সে দুর্গতি যাবে না; এই কারণেই তাঁদের প্রথম নজর পড়ে শিক্ষার বিস্তার সাধার প্রতি। তারপর তাঁরা দেখলেন দেশকে অতি দ্রুত উন্নত করতে হলে চাই ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রসার। বিশ্ববিখ্যাত রাশ্যান বৈজ্ঞানিক—অধ্যাপক, ইভানফ্‌ এই উদ্দেশ্যে লেনিনগ্রাডে "লাইকো-টেকনিকাল-ইনস্টিটিউট" নামে কেবল বৈজ্ঞানিক বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণার জন্যে এক বিরাট প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন। দশ বছরের মধ্যে ঐ প্রতিষ্ঠানে গবেষকের সংখ্যা হলো ২০,০০০। এর পর ঐ সমস্ত গবেষকদের গবেষণার বিষয় অনুসারে এক এক দলে ভাগ করে কারকর্ড, টিফলিস্‌ উমস্ক, সামারকাণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলে এক একটী পৃথক গবেষণাগার স্থাপিত হলো। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে গবেষণা করে যাঁরা বিখ্যাত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে ভাভিলফ্‌, বাচুলেভ, লইবিসেঙ্কো, লাইসেঙ্কো প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সোভিয়েট রাশ্যার নেতারা উপলব্ধি করেছিলেন,—রাশ্যা হলো একটী কৃষি-প্রধান দেশ। সুতরাং রাশ্যাকে উন্নত করতে হলে তার কৃষির দিকেই দিতে হবে প্রথম দৃষ্টি। সুতরাং আজে বাজে বিষয়ে অযথাসময়ে গবেষণা না করে সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকরা একেবারে কৃষিরই এক একটী বিষয় নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করে দিলেন। তাঁদের কেউ গবেষণা করতে লাগলেন কেমন করে রাশ্যার উত্তর-দেশের বরফাবৃত অঞ্চলে চাষ করা যায়, কেমন করে মরুদেশে নাবি তুলাগাছ ও নাবি গ্রীষ্ম থেকে রক্ষা করা যায়। কেউবা গবেষণা করতে লাগলেন, বিভিন্ন উদ্ভিদের মধ্যে সঙ্কর উৎপাদন প্রথা প্রবর্তন করে (Hybridization) কেমন করে ফলের পরিমাণ বাড়ান যায়। এই ভাবে ব্যবহারিক কৃষি-বিজ্ঞানের দিকে তাঁরা সমস্ত যত্ন ও আয়ত্ন প্রয়োগ করে গবেষণা করে চল্লেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সুরুর সোভিয়েট রাষ্ট্রে এইভাবে কাজ সুরু হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কিছুটা ফল-ফলা করা হয়।

উল্লেখযোগ্য প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার অধ্যাপক এইচ্‌-জে মুলর (H. J. Muller) আবিষ্কৃত 'Mutation'-এর * প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে বিভিন্ন জাতের তুলা-লতা ও ধানের মধ্যে সঙ্কর উৎপাদন প্রথা প্রবর্তন করে রাশ্যায় নানাজাতের নতুন নতুন ধান-লতা ও ফলের গাছের আবির্ভাব সম্ভব হয়। এ জাতীয় বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া প্রয়োগে দেশের অধাবস্তুত অঞ্চলে রোপণের উপযুক্ত নানা রকম নতুন গাছ উৎপাদন করা হয়। তারপর বিভিন্ন জাতের গাছের মধ্যে সঙ্কর উৎপাদনের ফলে গাছ যেমন বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে আর ফলনের মাত্রাও খুব বেড়ে যায়। সুতরাং আমরা দেখি "ইন্টারন্যাশনাল" ও প্রজননবিদ্যা-বিশারদদের (Geneticists) কল্যাণে সোভিয়েট রাষ্ট্রের কৃষিক্ষেত্রে আজ আমূল পরিবর্তন। বর্তমানে কেবল 'জেনেটিসিস্টদের' গবেষণার জন্যে সোভিয়েট রাষ্ট্রে একটী বিরাট পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে বিরাট বিরাট ক্ষেত আছে। তাতে নিত্য নতুন ফলের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। এই সমস্ত নতুন নতুন ফলের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করার জন্যে অনেক তরুণ বৈজ্ঞানিককে নিযুক্ত করা হয়েছে এই সূত্রে ভাভিলফ্‌, বলেন;

"The profound changes in Soviet Agriculture offer immeasurably vast opportunities for pure and applied work in Genetics, and Geneticists are enjoying the stimulation of working in an atmosphere where

* 'Mutation' হলো বিশেষ কোন চরিত্র বা প্রকৃতির মধ্যে হঠাৎ এক নতুন অপরিচিত উদ্ভিদ বা প্রাণীর আবির্ভাব ঘটা।

There is no Love Sincerer than the Love of Food

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এজেন্সী

—যার চলাচল সকলেরই বন্ধু বাঙালীর ব্যবসায়ে যে অকৃত্রিমতা অন্যায় থেকে অমৃত, সে অন্যায়কে বরণে নেওয়াই আমাদের সংকল্প। আর তারই পরিচয় এই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এজেন্সী আর তার নবী ও নবতোরণ।

ম্যানেজ :
২৬, প্রসন্ন ঠাকুর ষ্ট্রীট,
জনুবাজার, কলিকাতা।

যাদের সঙ্গে মানুষের আদান-প্রদানের সম্পর্ক নিবিড় সহজ। মানিকতলার সভাতা থেকে দুবেলাকার দরদ দুই-ই পুরা আর ঘরের সন্ধান।—দেশের মধ্যে যে সেরা, মানুষের অন্তরে যে নিখাদ খাদ সাকটাই তাদে কারবার।

আর এই জন্য সকলে সমবায়ের জন্যই যে অকৃত্রিম নির্ভরযোগ্য সেবকরী অকাতর সাধনা করে চলেছেন, তাঁদেরই প্রতিষ্ঠান এই—

পিওর ফুড সাপ্লাই কর্পোরেশন লিঃ

শিশুর কুসুম 'পেয়ার-পত্র' এই বন্ধুর দুর্দিনে বাঙালী মৌল পরিবারের অমূল্য বন্ধু, অকৃত্রিম বাহির অনিবার্য প্রয়োগ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

প্রধান কার্য্যালয়— ১৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১
ফোন : কলিকাতা ৪১৪৬

খেলা ধূলা

—ভারতের সর্বাধিকপ্রচারিত পত্রিকা—

'আমিও তবে জীবনপ্রাতে
চিনতে হবে আমি,
হারাধা তাই তের উঁচুতে থাকি।'

—জীবন ক্ষেত্র, জলের সমাজ জীবের অধিকারের সৌধাবাস ও পরিচয়ের মধ্যে উঠে—সেই আমি অধিকারী বাহিনীর পথ নির্দেশই "খেলা ধূলায়" পরিচয় প্রকাশ।

কার্যালয় : ২৭, বলরাম দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

there is an immense thirst for results. The collectivization of the land has provided the possibility for introducing new methods of cultivation, and new crops, throughout the whole of the U. S. S. R."

অধ্যাপক র‍্যাগেল্‌স্ লেইসের অবদান সোভিয়েট সঙ্কর-কৃষির ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সঙ্কর উৎপাদন দ্বারা অপর যে প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে সোভিয়েট কৃষির বিশেষ উন্নতি হয়েছে সোভিয়েট ভাষায় তার নাম হচ্ছে "ভারোভিজ্যাট্‌সিয়া" (Varovizatcia) যার বাংলা করা যেতে পারে "বাসন্তীকরণ"। রাশিয়ার কৃষিক্ষেত্রে এটা একটা অতি বিস্ময়কর আবিষ্কার। এ প্রক্রিয়াটী পরিপুষ্ট করেছেন রাশিয়ার কৃষিবিষয়ক বৈজ্ঞানিক লাইসেঙ্কো (Lysenko)। এর আগে বিশ্বে কোথাও এ বিষয়ে কিছুমাত্র গবেষণা হয় নি। অবশ্য লাইসেঙ্কোর পূর্বে তাঁরই সহকর্মী জাভিলভ, অনেকটা এই ধরণের গবেষণা করেন।

জাভিলভ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়ই দুটী বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন। তার একটী হচ্ছে,—যে সমস্ত গাছের ফল বা মূল খাদ্য সরবরাহ করে তার আকার ও ওজন বৃদ্ধি ও অপরটী হলো: বিভিন্ন তাপমাত্রায় বীজ নিয়ে চাষের আগে সেগুলির ওপর নানারকম বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে তারপর সেগুলি রোপণ করা। এতে শস্যের পরিমাণ, ফল, কাণ্ড ও মূলের আকারের অনেক পরিবর্তন ঘটে। এ ছাড়া তিনি কতকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন, যা প্রয়োগ করলে অতি শীঘ্র বীজের অঙ্কুরোৎপাদন করা যায়। গাছের বীজের ওপর যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে তার অঙ্কুরোদ্গমের কাল হ্রাস করা যায় বা তার ফসলের আকার, আয়তন, সময় প্রভৃতি পরিবর্তিত করা যায় সেই সব প্রক্রিয়ার একটী বিশেষ নাম দেওয়া হয়েছে, এটী আগেই উল্লেখ করেছি। ভারোভিজ্যাট্‌সিয়া, যার ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো "Vernalisation" আগে ভার্ণালিজেশানের সংজ্ঞা ছিল এই,—"Vernalisation is the process of stimulating the early development or sprouting of the seeds by various sorts of treatment".

সোভিয়েট কৃষি বিজ্ঞানে যে বিভিন্ন গবেষণার সূচনা করেন জাভিলভ, লাইসেঙ্কো তাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করে তোলেন। জাভিলভ কেবল বলেছিলেন,—তাপমাত্রার বীজের ওপর নানা রকম বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করলে দ্রুত অঙ্কুরোদ্গম হবে। কিন্তু লাইসেঙ্কো বীজের ওপর তাঁর আবিষ্কৃত কতকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে বহু বিস্ময়কর ফল দেখিয়েছেন। বীজের উপর তাঁর আবিষ্কৃত ভার্ণালিজেশানের প্রক্রিয়া করে তিনি দেখিয়েছেন,—একেবারে বন্ধ্যা জমিতে ঐ বীজ রোপণ করলেও তা থেকে কেবল গাছই জন্মায় না, তাতে প্রচুর শস্যও ফলে। এই প্রক্রিয়া প্রয়োগে আজ বন্ধ্যা জমা উপত্যকা ফসল শস্যক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ভি-ভূষারাবৃত সোভিয়েটের যেসব অঞ্চলে অতিরিক্ত ঠাণ্ডার জন্যে পূর্বে কোন চাষ হত না, এখন ভার্ণালিজেশানের প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে এমন সব বীজের সৃষ্টি হয়েছে যার থেকে সেসব অঞ্চলেও ফসল জন্মাচ্ছে। আজ সোভিয়েট রাষ্ট্রের যেসব অঞ্চলে ও জমা উপত্যকায় প্রচুর ফসল ফলছে। তারপর তিনি দেখিয়েছেন ঐ প্রক্রিয়া প্রয়োগে বছরে দুটীর স্থানে তিনটী ফসল পাওয়া যায়; এক একটী সাধারণ শস্যের শীষে যে পরিমাণ ফল বা শস্য ধরে, ঐ প্রক্রিয়া প্রয়োগের পরে এক একটী শীষে শস্যের পরিমাণ তিন থেকে চারগুণ বেড়ে যায়। আগে রাশিয়ার অনেক অঞ্চলে শস্য পাকার আগেই শরৎ-তুষারপাত সুরু হয়ে যেত, যার ফলে সমস্ত শস্য নষ্ট হয়ে যেত। লাইসেঙ্কোর প্রক্রিয়া প্রয়োগে এই সব শস্য এখন তুষারপাতের অনেক আগেই পেকে যায়। আবার অনেক অঞ্চলে শস্য পাকার আগেই ফাঁকাৎ গরম পড়ে যাওয়ায় সমস্ত শস্য জ্বলে যেত। এখন লাইসেঙ্কো ভার্ণালিজেশানের দ্বারা এই শস্যের বীজকে এমন করেছেন যে, গ্রীষ্ম আসার অনেক আগেই ঐ বীজজাত শস্যের ফসল পেকে যায়।

"By the application of the process of Vernalisation, the winter-varieties of wheat were converted into spring-varieties and late-varieties into early ones".

এছাড়া লাইসেঙ্কো দেখিয়েছেন কেবল বীজ নয়, মূল, ফল, শেকড় প্রভৃতির ওপরও এ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। ছোট ছোট বীজ-আলুর ওপর এই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে তারপর তা রোপণ করলে যে গাছ জন্মায় তাতে কেবল আলুর সংখ্যাই বাড়ে না, প্রত্যেক আলুর আকার ও আয়তন দুইই স্বাভাবিকের চেয়ে বহুগুণ বেড়ে যায়। মূলো, গাজর, বিট-পালং প্রভৃতির চাষ আজ ঐ পদ্ধতিতে করায় খুব অল্প পরিশ্রমে ফসলের মাত্রা সেই বহুগুণ বেড়ে। লাইসেঙ্কো ভার্ণালিজেশানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "Vernalisation is that scientific magic which has created miracles in the Soviet agriculture."

তাপ, শীতলতা, রৌদ্র, আলো প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করে, কোন পরিবেশে উদ্ভিদ জন্মাতে ফল ধারণ করতে ঠিক কি পরিমাণে কোন উপাদানের প্রয়োজন সুক্ষ্মানুসুক্ষ্মভাবে তা নির্দ্ধারণ করে, তারপর বীজ কিম্বা মূল বা অন্য কোন বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। অনুকূল পরিবেশে বীজের ভেতর থেকে বীজে ধীরে সেই শক্তি বার হয়ে উদ্ভিদের পুষ্টি, বৃদ্ধি ও ফলধারণে সহায়তা করে এই হলো ভার্ণালিজেশানের মূল কথা।

যবা রাশিয়ার দিনের আলো থাকে প্রায় ষোল ঘণ্টা। দিনের আলো এত দীর্ঘ হওয়ার ফলে, যে সব উদ্ভিদের মূল বা কন্দ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তার আকার যায় বিশেষ ছোট হয়ে। দীর্ঘকাল গবেষণার পর লাইসেঙ্কো আবিষ্কার করলেন, দীর্ঘ দিনের আলোই ঐ সব উদ্ভিদের মূল ও কন্দের আকার ছোট করে দেয়। তখন তিনি গাছে কয়েক ঘণ্টা কাল সূর্য্যালোক লাগানর পরই অতি সন্তর্পণে গাছগুলিকে চতুর্দ্দিক থেকে একেবারে জাল পরদা দিয়ে ঢেকে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। এই অতি সাধারণ প্রক্রিয়াটী কিছুকাল প্রয়োগ করার পরই দেখা গেল ঐ সব উদ্ভিদের মূল আকার স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। এ বিষয়ে লাইসেঙ্কো তাঁর ব্যাপক গবেষণার ফলে যে সব প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেছেন তা যেমন অদ্ভুত তেমনি বিস্ময়কর। তাঁর সাম্প্রতিক আবিষ্কারে সারা বিশ্বের বৈজ্ঞানিক মহলে সাড়া পড়ে গেছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে সোভিয়েট রাষ্ট্রের কৃষির উন্নতির মূলে আছে বৈজ্ঞানিক মুলারের "মিউটেশান্" (Mutation), র‍্যাগেল্‌স্ লেইস্ ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের সঙ্কর-উৎপাদন প্রণালী (Hybridization) ও জাভিলভ ও লাইসেঙ্কোর ভার্ণালিজেশান্। মূলতঃ এই সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের বিস্ময়কর প্রক্রিয়াগুলি প্রয়োগ করার আগে সোভিয়েট রাষ্ট্রে দিনে আট ঘণ্টা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যে পরিমাণ ফসল ফলত, এখন সেই জায়গায় দিনে মাত্র চল্লিশ মিনিটকাল পরিশ্রম করে সেই পরিমাণ ফসল ফলে, অর্থাৎ এই সব অভিনব বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে পঞ্চবার্ষিকীর দিনে সোভিয়েট রাষ্ট্রের কৃষক ও শ্রমিকদের সাত ঘণ্টা ফুর্ত্তি মিলিট করে সময় বাঁচে। এই সময়ে তারা অন্যান্য বিষয় দেখে, কলকারখানার কাজ দেখে, সামাজিক শিক্ষা নেয় ও খেলাধুলা ও বিশ্রামের প্রচুর অবকাশ পায়। সোভিয়েট কৃষি-বিজ্ঞানের সাফল্যই আজ সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষা ও সংস্কৃতির এত উন্নতি ঘটিয়েছে; এরই ফলে আজকের রাশিয়ার এত অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটেছে এবং রাষ্ট্রটী বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম দেশের অন্যতম বলে পরিগণিত হয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়ার শক্তির মূলে আছে তার কৃষি-বিজ্ঞানের সাফল্য।

পূর্ব্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গ

সুধাংশু মিত্র

বাংলা আজ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। যে অখণ্ড বাংলা দেশকে রাষ্ট্রগুরু কল্পনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, "দশ কোটি কণ্ঠকলে নিনাদ করালে" গাহিয়া ঐক্যবদ্ধ বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ রূপ ধ্যান করিয়াছিলেন, যে বাংলা দেশকে একান্তভাবে ভালবাসিয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ভাবাবিষ্ট কণ্ঠে গাহিয়াছিলেন "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি", যে বাংলার আপন-ভোলা শহীদদের কণ্ঠে সুর দিয়া যে বাংলার কবি নজরুল ইসলাম গাহিয়াছিলেন, "শিকল-চেঁড়া ওল আমাদের শিকল-চেঁড়া ওল এই শিকল পরেই শিকলকে মোরা করবরে বিকল" সেই বাংলা আজ ভাগ হইয়া গিয়াছে।

সাম্রাজ্যবাদীদের ও প্রতিক্রিয়াশীলদের নিষ্ঠুর চক্রান্ত এমন করিয়া সফল হইবে এ কথা কে ভাবিয়াছিল? তবু তাহা সফল হইয়াছে। বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলমান আজ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। নদীমেখলা শ্যামলা বাংলার অঞ্চলে লালিত, এক ভাষাভাষী বাংলার মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী পাশাপাশি বাস করিয়া একই সাথে সুখ দুঃখের ভোগ করিয়া, পরাধীনতার দুঃখের ভার বহন করিয়া বিশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পৃথক হইয়া গেল। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ভোজসীয় ঘটনা বোধ হয় আর কোথাও ঘটে নাই। এমন ভুলের মূল্যে বোধ হয় কোন জাতি স্বাধীনতা লাভ করে নাই। অনেকে আত্মনিয়ন্ত্রণের দৃষ্টান্ত দিবেন, কিন্তু আয়ার্ল্যাণ্ডের দৃষ্টান্তও বাংলার পক্ষে খাটে না। কারণ সেখানে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীরা উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে সুনির্দ্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করিয়া ইংরাজ অধিবাসী শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল এবং পরে তাহাদেরই সাহায্যে সেখানকার জনসাধারণের একটি বড় অংশের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া আয়ার্ল্যাণ্ডকে স্বাধীনতা দিবার সময় দ্বিখণ্ডিত করিতে পারিয়াছিল। ইংরাজ ও আইরিশ জাতি এক নহে, কাজেই কোন দেশের একটী অঞ্চলে বিদেশী অন্য জাতির প্রাধান্য স্থাপন করিয়া সেই বিভাগ করা সাম্রাজ্যবাদী কৌশলের পরিচায়ক হইলেও ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। এতদ্ব্যতীত আইরিশ রাষ্ট্রনায়ক মিঃ এমন ডি' ভালেরা শেষ পর্য্যন্ত আপোষের নীতি গ্রহণ না করিলে আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা লাভে হয়ত বিলম্ব ঘটিত, কিন্তু আয়ার্ল্যাণ্ড দ্বিখণ্ডিত হইত না। কারণ যাবতীয়ের পূর্ব্বে কি' ভালেরা পরিচালিত 'দি আইরিশ প্রেস' পত্রিকার ১৯৪ এপ্রিলের সংখ্যায় আয়ার্ল্যাণ্ডের ডেডেলীয় অধিবাসীরা সকল করাইয়া নিয়া ভারতের জাতীয় নেতাদের প্রতি যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হইয়াছিল তাহাতেই উহা প্রমাণিত হয়।

বাংলায় ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীরা বিদেশী আমদানী করিতে পারে নাই, সুতরাং কোন জাতির প্রভুত্ব কোন অঞ্চলে স্থাপন করিতে পারে নাই তথাপি বঙ্গভঙ্গ হইল। একই জাতির পৃথক একটী ধর্মগত সম্প্রদায় নিজেকে পৃথক জাতি বলিয়া দাবী করিয়া সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্য সাধন করিল; ইহার জন্য শুধু সাম্রাজ্যবাদীদের দোষ দিলে চলিবে না, ইহার জন্য শুধু প্রতিক্রিয়াশীল লীগ নেতৃত্বের স্কন্ধে সমস্ত দায়িত্ব চাপাইয়া দিলে চলিবে না, ইহার জন্য জাতীয়তাবাদী নেতাদের ও আমাদের সকলের দায়িত্ব কম নহে। আমরা সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত ব্যর্থ করিতে পারি নাই, প্রতিক্রিয়াশীল লীগ নেতৃত্বকে দূরে

শারদীয়ার সাদর সম্ভাষণ

● এক নম্বর ●

হিন্দুস্থান মার্ট

বালীগঞ্জ ও দক্ষিণ কলিকাতাবাসিগণের পক্ষে আরামে এবং সুলভে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার ক্রয়ের জন্য বিভাগীয় বিপণিমালার একটি বিরাট সম্ভাবেশ

● দুই নম্বর ●

হিন্দুস্থান মার্ট

এক নম্বর মার্টের বিপরীত দিকে বালীগঞ্জ ও গড়িয়াহাটার মোড়ে ২১০-১এ'বি, রাসবিহারী এভিনিউতে পাঁচতলা বিরাট সৌধে নবপরিকল্পনায় ইহা গড়িয়া উঠিতেছে

সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়িগণের জন্য এখনও কয়েকটি দোকান ও অফিস বন্দোবস্ত দেওয়ার বাকী আছে

অনুসন্ধান করুন ঃ—সুশান্ত পাঠক (পাবলিক রিলেশনস অফিসার)

হিন্দুস্থান মার্ট

১৫৯-১বি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা

অপসারিত করিয়া মুসলমান জনসাধারণকে স্বাধীনতা আন্দোলনে টানিয়া আনার মত উপযুক্ত ভাবাদর্শ গ্রহণ করিতে পারি নাই। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আমলে প্রজাস্বত্ব আইন সম্পর্কে যদি অধ্যাপক বিজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাব গৃহীত হইত, বৌসনী কমলদল হক পরিচালিত কৃষক প্রজা দল নির্বাচনে সাফল্য লাভ করিবার পর কংগ্রেস যদি প্রগতিশীল কর্মসূচী লইয়া মিলিত মন্ত্রিসভা গঠন করিত তাহা হইলে বোধহয় বাংলায় লীগ নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা হইত না, বাংলা আজ বিভক্তিত হইত না।

কিন্তু যাহা হয় নাই, তাহা লইয়া হা-হুতাশ করিয়া লাভ নাই। যাহা হইয়াছে তাহাকে মানিয়া লইয়াই ভবিষ্যতের কর্মপন্থা স্থির করিতে হইবে। আমি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে বাদ দিয়া কোন প্রদেশের পক্ষে কোন নীতি বা কর্মপন্থা স্থির করা কঠিন, জানি সাম্প্রদায়িকতার তাণ্ডবের পর আজ ভারত ও পাকিস্তানের অন্যত্র কোন ঘটনা ঘটিলে উত্তর বাংলা তাহার দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া পারে না, তবু তাহারই মধ্যে স্থিরচিত্তে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করিতে হইবে। বাঙ্গালী জাতি এক থাকিবে, বাংলা তাহাই উত্তর বঙ্গের বাঙ্গালীর ভাষাভাষা হইবে, বাঙ্গালীর সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং উত্তর বঙ্গের মধ্যে পূর্ণ সৌহার্দ্য থাকিবে এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়াই আজ উত্তর বঙ্গের নিয়ন্ত্রাধীন ও জনসাধারণকে অগ্রসর হইতে হইবে, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করিতে হইবে।

যে লক্ষ্যের উল্লেখ করিয়াছি সেই লক্ষ্যে উপনীত হইতে হইলে অর্থনৈতিক সহযোগিতাকে ভিত্তি করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। মুসলমান ধনী ও মধ্যবিত্তের সহিত হিন্দু ধনী ও মধ্যবিত্তের বিরোধই ভারত ব্যবচ্ছেদের প্রধান কারণ। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাই সুকৌশলে এই বিরোধ সৃষ্টি করিয়াছিল এবং এই বিরোধকে সাম্প্রদায়িক আকার দিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত যখন ভারতবর্ষকে অধীন রাখা সম্ভব হইল না তখন তাহারা সেই বিরোধের সুযোগ গ্রহণ করিয়া ভারত ব্যবচ্ছেদ করিয়া চলিয়া গেল। কাজেই অর্থনৈতিক সহযোগিতার দ্বারাই আবার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মিলনের সেতু রচনা করা সম্ভব।

উত্তর বঙ্গে কি ভাবে এই মিলনের সেতু রচনা করা যায় তাহাই সংক্ষেপে দেখাইবার চেষ্টা করিব।

পাট-সমস্যা

পাট বাংলার সর্বপ্রধান সম্পদ। সারা জগতে ইহার চাহিদা। বহুকালের ফলে পাট শিল্প গুরুতর সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে। পাকিস্তান সরকার ডাবিডেন্ডের পাট আঁশের দেশের স্বর্ণতন্তু (Golden fibre), স্বর্ণ-লক্ষ্মীকে আমরা এই তত্ত্ব দিয়াই বাঁধিয়া রাখিব। সারা জগতে যে পরিমাণ পাট উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ৮০ ভাগই উৎপন্ন হয় পূর্ববঙ্গে। সমগ্র বাংলায় বৎসরে পাঁচ কোটি মণ পাট কেনা-বেচা হয়, উহার মধ্যে চার কোটি মণের বেশী পাট পূর্ববঙ্গের। আবার পাট-কলগুলি সবই পশ্চিমবঙ্গে, পূর্ব বঙ্গে একটিও পাট-কল নাই। সাধারণভাবে সারা গাঁইট বাঁধায় যে কয়টী কল আছে সেগুলিতে মাসে মাত্র ২ লক্ষ ৩০ হাজার গাঁইট পাট বাঁধা হয়।

এই অবস্থায় সুরু হইয়াছে উত্তর বঙ্গের মধ্যে যোগাযোগি এবং ইহার ফল হইতেছে মারাত্মক। ভারত সরকার পাটের উপর শুল্ক বসাইলেন, পাল্টা জবাবে এবং অতিরিক্ত অর্থাগমের জন্য পাকিস্তান সরকারও শুল্কশুল্ক বসাইলেন। শুল্ক-যুদ্ধের ফলে ব্যবসায়ীরা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে, পাটচাষী বিপন্ন পড়িতেছে, পাট-কলের মালিকরা পাটের মূল্যবৃদ্ধির আশিকা সম্বন্ধে অভিযোগ করিতেছেন। তবু এখানেই শেষ নহে। পূর্ববঙ্গে পাটকল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া পশ্চিমবঙ্গকে জব্দ করিবার চেষ্টা চলিতেছে, পাল্টা জবাবে পশ্চিমবঙ্গে ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে পাট চাষ বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। পূর্ববঙ্গ শিল্প-প্রধান নহে, পাটও সেখানে হয় প্রচুর, কাজেই সেখানে কারখানা গড়িয়া উঠুক, শিল্প স্থাপিত হউক, ইহা সকলেই কামনা করে। কিন্তু সমস্যা হইল যে অর্থ-নৈতিক কাঠামো গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে হাতাহাতি বদলাইয়া ফেলিবার চেষ্টা বাতুলতামাত্র। পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গ সমস্যা সঙ্কটের সম্মুখীন মাত্র। কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী প্রভৃতি বিরাট শিল্পাঞ্চলের ৪০ লক্ষাধিক নরনারী অন্নের জন্য ইহার বাহ্য অন্নের উপর নির্ভরশীল এবং সমপ্রত্যাবের পশ্চিম বাংলায় খাদ্যের ঘাটতি হইয়াছে। এই অবস্থায় খাদ্যশস্যের চাষ বৃদ্ধি না করিয়া পাটচাষ বৃদ্ধি করার চেষ্টা নিতান্তই অবিবেচনাপ্রসূত ও জিদের পরিচায়ক।

উত্তর বঙ্গই মিলিয়া মিলিয়া পাট সমস্যার সমাধান করিতে পারে, স্বাভাবিক অর্থনীতিকে অব্যাহত রাখিয়া উত্তর বঙ্গেই সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিতে পারে। দশ বৎসরের মেয়াদে উত্তর বঙ্গের গবর্ণমেণ্ট একটা সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা স্থির করিয়া চুক্তি করিতে পারেন দশ বৎসরের মধ্যে পূর্ববঙ্গে কয়টী পাটকল স্থাপিত হইতে পারে তাহা স্থির করিয়া এক-দিকে পূর্ববঙ্গ সরকার পশ্চিম বাংলায় কি পরিমাণ পাট সরবরাহ করিবেন তাহা স্থির করিতে পারেন, অপর দিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নূতন পাটকল প্রতিষ্ঠা বন্ধ করিয়া শিল্পপতিদের সহযোগিতায় নির্দ্দিষ্ট সাধ্যক কলকে অন্যান্য শিল্পোৎপাদনের কাজে লাগাইতে পারেন। জগতের বিভিন্ন দেশ যখন পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, যখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারের উপর জোর দেওয়া হইতেছে, তখন বাংলার দুইটী প্রতিবেশী অঞ্চল কেন পরস্পরের সহিত বোঝাপড়িতে পিছু হইবে ইহা বুঝা কঠিন। পাট সম্পর্কে যদি উত্তর বঙ্গ সম্মিলিত সিদ্ধান্তে উপনীত না হইতে পারে এবং পরস্পরের সহিত সহযোগিতা না করে তাহা হইলে ভবিষ্যতে পাটচাষী ও পাট শিল্পের অদৃষ্টে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিবে। ইতিমধ্যেই অন্যান্য দেশে পাটের পরিবর্তে কাগজের ব্যাগ এবং অন্যান্য পাটজাত দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত জিনিষ ব্যবহার করা হইতেছে। অর্থব্যয় করিয়া বিজ্ঞানের সর্বপ্রকার সাহায্য গ্রহণ করিতে এই সকল দেশ পরাঙ্মুখ নহে, কাজেই পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ বিপদ ডাকিয়া উঠাইয়া দেওয়া চলে না।

খাদ্য-সমস্যা

উত্তর বঙ্গেই খাদ্যের ঘাটতি আছে এবং দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলা দেশ ঘাটতি পূরণের জন্য অন্য প্রদেশ অথবা বিদেশের উপর নির্ভরশীল। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা ছুই কোটিরও অধিক। পশ্চিমবঙ্গে চাউল উৎপন্ন

ইষ্ট ইণ্ডিয়া
ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ
৮৯নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ভারতের অন্যতম প্রগতিশীল
জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান
সর্বত্র কর্মনিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও সততিক কর্মী আবশ্যক।
মিঃ বি, এম, সেন
ম্যানেজার
তাঃ এস পি দত্ত
ডিরেক্টর-ইন-চার্জ
ব্যাঙ্কার্স ডিরেক্টর
ন্যুমিজা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হয় ১০ হইতে ১২ কোটি মণ। কৃষিক কমিটির হিসাব অনুসারে উৎপন্ন চাউলের শতকরা ৭১ ভাগ চাউল বাজারে বিক্রয় হয় এবং বাকী শতকরা ৫৮ ভাগ উৎপাদনকারীরা খায়। এই হিসাব অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের বাজারে বিক্রয়যোগ্য চাউলের পরিমাণ সাড়ে চার হইতে পাঁচ কোটি মণের মত। কলকাতা ও সহরতলীর লক্ষাধিক লোকের চাহিদা মিটাইতেই কিনিতে হয় দুই কোটি মণেরও বেশী চাউল, কাজেই বাকী দুই হইতে তিন কোটি মণ চাউলের উপর ভেড় কোটিরও অধিক লোকের চাহিদার চাপের ফল কি হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। এই কারণে পশ্চিমবঙ্গকে বার বার কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারস্থ হইতে হইতেছে।

পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থাও অনুরূপ। আয়তি হিসাবে দেখা পূর্ব্ববঙ্গে বেশী বটে, কিন্তু লোক সংখ্যাও তেমনি বেশী। পূর্ব্ববঙ্গের কেন্দ্রীয়ভিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এন, এম, খাঁর মতে স্বাভাবিক বৎসরে পূর্ব্ববঙ্গে (ত্রিপুরা বাদে) ৬৭ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হয়, কিন্তু ন্যূনতম প্রয়োজন হইতেছে ৬৮ লক্ষ টন। অর্থাৎ স্বাভাবিক বৎসরেও এক লক্ষ টন (প্রায় ২৮ লক্ষ মণ) খাদ্যের ঘাটতি পড়ে। ইহার অর্থ স্বাভাবিক বৎসরে শতকরা দশজন এবার জন লোককে খাদ্যের জন্য বাহিরের উপর নির্ভর করিতে হয়। অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের মতে ঘাটতি আরও বেশী। তাঁহারা বলেন, সাড়ে বাইশ লক্ষ মণের মত চাউল উৎপন্ন হয়। লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে চার কোটি ধরিলে মাথাপিছু দৈনিক আধ সের চাউলের হিসাবে প্রয়োজন হয় ১৯ কোটি মণ চাউলের অর্থাৎ প্রকৃত ঘাটতি ৯ কোটি মণ। অবশ্য, আমাদের এই ধরিত্রী মোট লক্ষ লক্ষ লোক অভাবের অনশনে থাকে, কাজেই পুরাপুরি বেসামরিক প্রবরণ না ধরিলে ঐ পরিমাণ ঘাটতি সত্য অনুভব নহে তবু ঘাটতি যে পড়ে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। এই ঘাটতি পূরণের জন্য পূর্ব্ববঙ্গ ও সিন্ধু, পাঞ্জাব ও বম্বাই উপর নির্ভরশীল।

খাদ্যের এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া উভয় বঙ্গের গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজন সম্মিলিতভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি, বেসামরিক ব্যবস্থা ও বিদেশ হইতে আমদানী সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের উচিত চাষী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি সহর এবং জেলার বিভিন্ন ঘাটতি অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গের অনুরূপ বেসামরিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। নিজ নিজ প্রদেশে উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া বিদেশ, ভিন্ন প্রদেশ ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভরশীলতা যথাসম্ভব হ্রাস করা উভয় বঙ্গের সরকার আমদানি বিষয়ে উভয় বঙ্গের মধ্যে সহযোগিতার ব্যবস্থা অবলম্বন করার দরকার। উভয় বঙ্গে একই সরকার বেসামরিক ব্যবস্থা বহাল থাকিলে স্বাভাবিক বাণিজ্যের ফলে কোন সঙ্কটই সৃষ্টি হইবে না, এবং স্বাভাবিক অর্থ-নৈতিক অবস্থা ফিরিয়া আসার পক্ষে সুবিধা হইবে।

পূর্ব্ববঙ্গে মহাজন, তহবিলদারী, চাল-ব্যবসী, মিল, হুণ্ডি প্রভৃতির ছাড়পত্র আছে এবং এইগুলির উৎপাদনও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা সম্ভব। বন্যার প্রকোপে এবং কর্তৃপক্ষের অবহেলার ফলে এই সকল জিনিষ আজকাল বাজারে যে সকল বাধা বিপত্তির সৃষ্টি হইয়াছে সেগুলি অবিলম্বে অপসারিত করিলে উভয় বঙ্গের খাদ্য সমস্যা বহুল পরিমাণে দূরীভূত হইবে। খাদ্যোৎপাদনের সঙ্গে জমিদারী প্রথা একটি ঘনিষ্ঠ ব্যাপার। জমিদারী প্রথার লোপ করিয়া কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন করিয়া অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে Economic Holding) করিয়া তুলিতে না পারিলে কৃষির উন্নতির আশা সুদূর পরাহত। কাজেই গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ববঙ্গে জমিদারী প্রথা তুলিয়া দিবার পক্ষপাতী, কারণ জমিদার অধিকাংশই হিন্দু, আবার কংগ্রেস জমিদারী প্রথা বিলোপের পক্ষপাতী হইলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এ বিষয়ে বেশ দ্বিধা আছে। উভয়

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং
কর্পোরেশন লিঃ
হেড অফিস
৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ভারতের সর্ব্বত্র শাখা অফিস আছে।

ভারতের বাহিরে এজেন্সি :—
গ্রেট বৃটেন, আমেরিকা,
অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা,
সিঙ্গাপুর ও পেনাঙ্গ।

সম্প্রতি যে পাঁচটী শাখা খোলা হইয়াছে :
- চন্দননগর
- সিউড়ী (বীরভূম)
- চুঁচুড়া
- মেদিনীপুর
- দার্জ্জিলিং

কলিকাতা বন্দর ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্র টাকা ও হুণ্ডির বিনিময় করা হয়।

জি, কে, বসু,
ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর

এম্, সি, বসু,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

ঢাকার
লালমোহন সাহা শঙ্খনিধির
কয়েকটি জগদ্বিখ্যাত আবিষ্কার

খোস পাঁচড়ায় অব্যর্থ
কণ্ডুদাবানল
TRADE MARK

মেদনার শ্রেষ্ঠৌষধি
শূলাশ্বন
দাদে আশ্চর্য্য কার্য্যকরী
সর্ব্বদদ্রুহুতাশন
জ্বরে অমোঘ
সর্ব্বজ্বর-গজসিংহ

এল,এম,শাহ শঙ্খনিধি
এণ্ড কোং লিঃ
রেজিষ্টার্ড অফিস, ৩২-ই, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

প্রকার মনোভাবই ধারণ করে। কারণ পূর্ব-বঙ্গে জমিদারী প্রথা লোপের সঙ্গে যদি হিন্দু জমিদারদের সরাইয়া দিয়া নূতন ধরণের মুসলমান জমিদারী সৃষ্টি করা হয় তাহা হইলে কৃষকরা উৎসাহ পাইবে না, ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। আবার পশ্চিমবঙ্গে যদি জমিদারী প্রথা তুলিয়া দেওয়া না হয় অথবা অন্তরূপে জমিদারী প্রথার অভিব্যক্তিকে আমরা রক্ষা করি তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গকে চিরকালই বাহিরের জন্য অন্নের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইবে। কাজেই এই গুরুতর অর্থ-নৈতিক পরিবর্তন সম্পর্কের উভয় বঙ্গে একই ধরণের কর্মপন্থা অনুসৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বস্ত্র-সমস্যা

আমের ন্যায় কাপড়ের বেলাতেও উভয় বঙ্গ পরমুখাপেক্ষী। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা কিছুটা ভাল। পশ্চিমবঙ্গে মোট ৫৯টী কাপড়ের কল আছে। পূর্ববঙ্গে আছে ৭টী কাপড়ের কল। ৫৯টী কাপড়ের কল থাকিলেও পশ্চিমবঙ্গের কাপড়ের চাহিদা পশ্চিমবঙ্গের কলগুলি মিটাইতে পারে না, বোম্বাই, আমেদাবাদের উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হয়। পূর্ববঙ্গের অবস্থা আরও শোচনীয়। ৭টী কাপড়ের কলে খুব বেশী হইলেও কয় কোটি গজের বেশী কাপড় উৎপাদন করা যায় না, অথচ বাৎসরিক কম পক্ষে হিসাবেও বার্ষিক ৪০ কোটি গজেরও বেশী কাপড়ের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে পরনির্ভরতা দূর করার জন্য উভয় বঙ্গই পরিকল্পনা অনুযায়ী বস্ত্রশিল্প সংগঠনে মনোনিবেশ করিতে পারে। বাহির হইতে কাপড় আমদানি বন্ধ করার কোন প্রশ্ন না তুলিয়াও উভয় বঙ্গ বস্ত্রশিল্প সংগঠনের ক্ষেত্রে অনেক কিছু করিতে পারে। উভয় বঙ্গে বর্তমানে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার উপর জোর না দিয়া সূতা কল প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেওয়া উচিত, কারণ উভয় বঙ্গেই বহু লক্ষ তকুলের অভাব রহিয়াছে। সূতা সরবরাহের অভাবে আজ বাংলার তাঁতশিল্প ধ্বংস হইতে বসিয়াছে, অথচ তাহাদের বস্ত্রশিল্পে তাঁতশিল্প আজও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সূতা কল প্রতিষ্ঠিত হইলে বাংলার তাঁতশিল্প রক্ষা পাইবে, আধুনিক সমবায় প্রথায় বহু রকমের বস্ত্রশিল্প গড়িয়া তোলা যাইবে এবং ইহার ফলে একদিকে যেমন লক্ষ লক্ষ নর-নারীর জীবিকা সংস্থানের উপায় হইবে, তেমনই অন্যদিকে বস্ত্র-সমস্যার অনেকখানি সমাধান হইবে।

অন্যান্য শিল্প

চিনি-শিল্পে সমগ্র বাংলাই পশ্চাদ্‌পদ, অথচ উভয় বঙ্গেই চিনি-শিল্প গড়িয়া তোলার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। বঙ্গভঙ্গের পর তিনটী চিনির কল পূর্ববঙ্গের ভাগে পড়িয়াছে।

পূর্ববঙ্গের ৩টী চিনির কলে ১৯৪৬-৪৭ সালে মোট ১২ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল। উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিলেও এই ৩টী কলে ২২ হাজার টনের বেশী চিনি হইবার সম্ভাবনা নাই, অথচ চাহিদা হইতেছে ৫৫ হাজার টন। লোকসংখ্যা কম হইলেও অধিবাসীর সংখ্যা বেশী হওয়াতে পশ্চিম বঙ্গের চাহিদাও কম নহে। পূর্ববঙ্গে গ্রামাঞ্চলের লোকসংখ্যাই বেশী এবং গুড় সহজও কম, কাজেই গুড়ের ব্যবহার খুব বেশী। গুড় উৎপাদনও হয় পূর্ববঙ্গে বেশী। পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা চিনি ও গুড়ের ব্যাপারে উভয় বঙ্গ অনেক বেশী স্বাবলম্বী হইতে পারে।

পূর্ববঙ্গে কাগজের কল নাই, ফলে বর্তমানে সেখানে কাগজের হুড়িক দেখা দিয়াছে। কিন্তু কাগজের উপাদান পূর্ববঙ্গেই বেশী। সাম্প্রতিক আন্তঃ ডোমিনিয়ন চুক্তি অনুযায়ী পূর্ববঙ্গ হোগলা, শ্রীহট্ট, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ফুটীরা হইতে ২৫ হাজার টন বাঁশ দিবে এবং উহার বিনিময়ে পূর্ববঙ্গকে ৬ হাজার টন কাগজ দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। পূর্ববঙ্গে কাগজ শিল্প প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে কাগজ প্রস্তুত করার উপাদান সরবরাহ সম্পর্কে উভয় বঙ্গই মিলিতভাবে একটী দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা স্থির করিতে পারেন।

পূর্ববঙ্গে নারিকেল প্রচুর, অথচ তৈলের কোন কারখানা নাই। সমগ্র পাকিস্তানে নারিকেল তৈলের বার্ষিক চাহিদা হইতেছে ২১ হাজার টন। পশ্চিমবঙ্গে নারিকেল কম হয়। এক্ষেত্রেও উভয় বঙ্গের মধ্যে সহযোগিতা ফলপ্রসূ হইবে।

সরিষার তৈলের চাহিদা উভয় বঙ্গেই অত্যধিক, এই সরিষার জন্য উভয় বঙ্গই পর-মুখাপেক্ষী। এই পরমুখাপেক্ষিতা কি ভাবে দূর করা যায় এ বিষয়ে উভয় বঙ্গের কৃষি বিভাগ তৎপর হইতে পারেন। পূর্ববঙ্গে মাত্র ২টী সরিষার তৈলের কল আছে। এই দুইটি ছোট কলে যাহা উৎপন্ন হয় তাহা উল্লেখযোগ্য নয়। পূর্ববঙ্গে সরিষার তৈলের বার্ষিক মোট ঘাটতির পরিমাণ ৫০ হাজার টন। পারস্পরিক সহযোগিতা থাকিলে পশ্চিমবঙ্গ এই ঘাটতির অনেকখানি মিটাইয়া বহু রকমের বাজার হাতে রাখিতে পারে।

কয়লা, পেট্রোল, কেরোসিন, লৌহ ও ইস্পাত—এইকয়টী জিনিষ পূর্ববঙ্গে একে-বারেই নাই। ইহার ফলে পূর্ববঙ্গে যানবাহন, কারখানা প্রভৃতি চালু রাখা, সুষ্ঠুভাবে নির্মাণ করা ও নূতন শিল্প প্রভৃতি গড়িয়া তোলার পক্ষে গুরুতর বাধার সৃষ্টি হইয়াছে। আজ ময়মনসিংহে তৈলের খনি পাওয়া গিয়াছে, কাল চট্টগ্রামে কয়লার খনি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া নানারকম আজগুবী খবর কাগজে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল আজগুবী খবরের কোন প্রকৃত ভিত্তি নাই। অবশ্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মত বিভিন্ন অঞ্চলে অনুসন্ধান আশু নিশ্চয়ই চালানো উচিত, কিন্তু ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিলে এই সকল জিনিষ পূর্ববঙ্গে অনেক পরিমাণে সহজলভ্য হইতে পারে। সহযোগিতা রক্ষার জন্য পশ্চিম বঙ্গেরও কর্তব্য হইবে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ দিয়া উক্ত জিনিষগুলি পূর্ববঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

সামান্য সহযোগিতার অভাবে ছোটখাট খুটির শিল্পের ক্ষেত্রেকিরূপ অসুবিধার সৃষ্টি হইতে পারে তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বঙ্গভঙ্গের পর পশ্চিম বঙ্গে বিশেষ করিয়া কলিকাতার মানুষ, চাটাই প্রভৃতির দাম অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। বর্তমান বৎসরে ১লা মার্চ হইতে ভারত সরকার পূর্ববঙ্গ হইতে আমদানী মাদুর প্রভৃতির উপর শুল্ক ধার্য্য করার ফলে এই দাম আরও বাড়িয়াছে, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় তিন লক্ষ স্বাবলম্বীর ব্যবসা বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে এবং পূর্ববঙ্গের খুটির শিল্পীরা কঠিন সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে। বঙ্গভঙ্গের পূর্বে পূর্ববঙ্গ হইতে বৎসরে ৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের মাদুর, চাটাই প্রভৃতি আমদানী হইত, কিন্তু সে হইতে জুলাই এই তিন মাসে মাত্র ২৫ হাজার টাকার মাল আসিয়াছে। এই সামান্য জিনিষগুলির উপর শুল্ক ধার্য্য করিয়া জনসাধারণকে বিব্রত করার কোন অর্থ হয় না।

নদী নিয়ন্ত্রণের সমস্যা

উত্তরিক ক্ষেত্রগুলি ছাড়াও নদীবহুল বাংলা দেশে নদী নিয়ন্ত্রণ ও নদী পুনরুদ্ধারের সমস্যা দুরূহ ও জটিলতম সমস্যাগুলির অন্যতম। দেশ ভাগ করা গেলেও প্রকৃতিকে ভাগ করিয়া নদী প্রভৃতি ভাগ করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে উভয় বঙ্গ সহযোগিতা না করিলে কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য কোন দিকেই বাংলা দেশের সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব হইবে না।

উভয় বঙ্গ পরস্পরের উপর কতটা নির্ভরশীল তাহা আজ উভয় বঙ্গের জন-সাধারণকে বুঝিতে হইবে এবং ইহা বুঝাবার দায়িত্ব বাংলার চিন্তানায়ক ও রাজনৈতিক নেতাদের। উভয় বঙ্গেই আজ অ-বাঙ্গালী হিন্দু ও অ-বাঙ্গালী মুসলমানের রাজত্ব চলিয়াছে। বাঙ্গালী হিন্দু ও বাঙ্গালী মুসলমানকে ইহা বুঝিতে হইবে। অ-বাঙ্গালী বিদ্বেষ ইহার প্রতিকার নহে, ইহার প্রতিকার বাঙ্গালী মুসলমান ও বাঙ্গালী হিন্দুর সহযোগিতায়, পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সহযোগিতায়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য উভয় বঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানের সম্মিলিত সংগ্রামের উপরেই আজ বাঙ্গালী জাতি, বাঙ্গালীর সংস্কৃতি ও সভ্যতা এবং সমগ্র বাংলার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

আর্থিক জগতের রাজা-প্রজা

অধ্যাপক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাষ্ট্রনৈতিক সমাজের কথা আপাততঃ আমরা নি, কিন্তু আর্থিক জগতের রাজা-প্রজার সম্বন্ধগুলি যে কিরূপ বহুমুখী, বিচিত্র, বিষম জটিল রূপ ধরে উঠেছে,—জীবনের যে কোন ক্ষেত্রেই থাকুন না কেন, আধুনিক জীবনের এই ক্রমবর্দ্ধমান, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ অভিঘাত থেকে আপনার আমার কারুরই মুক্তি নেই। মানব সভ্যতা, সৃষ্টি প্রভৃতি কথার যদি সত্যই কোন মানে থাকে, তাহলে আর্থিক জগতের। শুধু একজনের টাকা বেশি আছে বলেই সে সেই জগতের হবে রাজা, অন্যান্যেরা ব্যক্তিগত গুণাবলীতে যত শ্রেষ্ঠত্বই দেখাক না কেন তারা সেই কৃত্রিম ব্যবস্থায় গড়ে-তোলা রাজাকে কর, খোরাকে মাথা, এবং চাইবে অন্যায়, লজ্জাকর আর কিছু হতে পারে না। অথচ, প্রথমে বিলাসী ঔপনিবেশিকেরা এবং বিশেষ করে পরে ইউরোপীয়েরা সামরিক বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তারতেও যে নূতন মূল্যবোধ, সামাজিক ও ব্যবহারিক সম্বন্ধগুলির আপেক্ষিক মাননির্ণয়ের দ্বারা আমদানী করেছিল, তা ক্রমবিবর্ত্তিত হয়ে সভ্যতার জটিলতাবৃদ্ধির সাথে সাথে পুঁজিবাদী-নিয়ন্ত্রিত এ দেশের সমাজকেও তার বর্ত্তমান অসহায়ক, ভারসাম্যহীন আশাহীন অবস্থাতে আসতেই সাহায্য করেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন-প্রণালী, সম্পদ সৃষ্টি ও তা বণ্টনের পদ্ধতি জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। অন্যান্য চাকচিক্যময়, অন্যান্য সুখ, দুঃখ-দুরের এই সভ্যতার দ্বারায় খুব বেশির ভাগ লোকেরই বিবেক 'হ্যাণ্ডাইক্যাপ্ড' হয়ে গিয়েছে। তাই, কৃত্রিম মূল্যবোধের উপর স্থাপিত আর্থিক জগতের এই ক্ষুদ্র রাজা-প্রজার সম্বন্ধ দীর্ঘকাল ধরে স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। ক্রমশঃ এই রাজা-প্রজা সম্পর্কটা বহুক্ষেত্রেই প্রভু ও সদা-ঘুমাপেক্ষী দাসের সম্পর্কে এসে দাঁড়িয়েছে,—পাওনা পরকাও উঠে গেছে।

কতগুলো ক্ষেত্রে এই সম্পর্কটা অবশ্য স্পষ্ট—যেমন, মিলমালিকের মালিক বনাম শ্রমিক, সরকারী বা বেসরকারী অফিস এবং ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ বনাম কর্মচারীরা ইত্যাদি। কোন কোন ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা এত স্পষ্ট নয়, যদিও সামান্য একটু তলিয়ে দেখলেই জিনিষটা ধরা পড়ে। যেমন, পুস্তক-প্রকাশক বা সম্পাদক বনাম নূতন লেখক, হলমালিক বনাম নাট্যকার, প্রকাণ্ড পাইকারী ব্যবসায়ী বা কোন কোম্পানীর সেল এজেণ্ট বনাম ছোট খুচরো দোকানদার, স্কুল কলেজের গভর্নিং বডি বনাম শিক্ষক অধ্যাপকেরা, বাজারের ফড়িয়ারা (middlemen) বনাম নৈমিত্তিক ক্রয়বিক্রয়কারী প্রভৃতি মাঝার থেকে নিয়ে আসা গরীব লেবেলের লোক, সাধারণতন্ত্র-আফিসের সাড়ে লেলন ম্যানেজার বনাম সেই কারখানের বিভিন্ন স্থানের এজেণ্টরা, উপার্জনক্ষম স্বামী বনাম তার সাধারণ-রূপগুণসম্পন্না উপার্জন-অক্ষমা, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলা স্ত্রী, ইত্যাদি সব দৃষ্টান্ত। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দৃষ্টান্তগুলোর কোন কোনটা অনেকের কাছে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বা কিঞ্চিৎ-অবিশ্বাস্যও মনে হতে পারে। কিন্তু একটু অকপট বিশ্লেষণ করে দেখলেই দেখা যাবে যে, নিছক চমকপ্রদ নূতনত্বের ঝোঁকে এগুলোর উল্লেখ করা হয় নি। যাঁরা হয়তো প্রথম ধরণের অবাক হবেন, তাঁরাও অনেকে আশপাশ দেখলেই যে, তাঁরা নিজেরাই চারপাশের পরিবেশ থেকে আরো সব অনুরূপ দৃষ্টান্ত খুঁজে পাবেন। বর্ত্তমান সমাজের অস্বাভাবিক অর্থনৈতিক সংগঠনই বিষ ছড়িয়ে মানুষদের এরকম করে তুলেছে।

রাষ্ট্র এবং গবর্ণমেণ্ট, অফিস, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, পরিবার এবং সমাজ,—এ সমস্ত সুষ্ঠুভাবে চালাতে হলে যোগ্যতা অনুযায়ী কিছু লোক ওপরে থাকা এবং কিছু নীচে থাকা, কর্তৃপক্ষ এবং কর্মচারী, রাখাতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা, এসবের দরকার আছে একথা তো কেউ অস্বীকার করে না। কিন্তু কথা হচ্ছে, যাঁরা ওপরের দিকে আছেন,—মালিক, কর্তৃপক্ষ, বা আর্থিক জগতের ছোট বড় রাজাদের দলে আছেন, নীচে যাঁরা আছেন তাঁদের অনেকের তুলনায় তাঁদের সেখানে থাকবার বিশেষ কোন যোগ্যতা বা নৈতিক অধিকার আছে কি? ধনীবাদের জন্মের মত নিছক একটা আকস্মিক ঘটনা এবং তজ্জনিত পরিবেশগত বহু রকমের সুযোগ সুবিধা লাভ, অথবা বড়লোকদের চাটুকারিতা এবং বুর্জোয়া সমাজে সদাবহমান দুর্নীতির সুযোগ নিয়ে টাকা জমিয়ে ওপরে উঠে যাওয়া, তাদের অনেকের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ এই-ই প্রধানতম কারণ নয় কি? অর্থ নৈতিক অব্যবস্থার ফলে সৃষ্টিসের একটি শ্রেণীর হাতে এসে জমেছে অনেক পুঁজি, জমি, ভাড়া দেওয়ার মত বাড়ী, ব্যাঙ্কে টাকা, ঐশ্বর্যপুষ্ট প্রভাব প্রভাব সম্পর্ক (connections)। তার ফলে জীবনযুদ্ধে তারা পেয়েছে অন্যায় পক্ষপাতদুষ্ট সুবিধা, তাদের ছেলেদের পক্ষে ছোটবেলা থেকেই জীবনযুদ্ধ হয় অনেক সহজ, যাঁরা রাস্তায় এগিয়ে যাওয়ার নিশ্চয়তাজনক, আরামকর। দীর্ঘ কঠিন প্রয়াসে মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ গুণাবলী অর্জন নয়, অধ্যবসায়ের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করা নয়, আখার ঘাম পায়ে ফেলে চাকরীর যোগাড়ে বের হওয়ার-অভিজ্ঞতা মূলতঃ নয়,—এ সবের কোন কিছু দরকার নয়, প্রধানতঃ উপরি-উক্ত পথেই তারা ওপরে উঠে যায় এবং ওপরে থেকে যায়। তারপরই শুধু, শিক্ষা, প্রতিভা, যোগ্যতা-নির্বিশেষে অন্য সমস্ত মানুষকে সামান্য অর্থের বিনিময়ে স্বাধীন শ্রম বা অভিজ্ঞতার প্রয়োজনের সুযোগহীন নগণ্য চাকরীর পদে নিযুক্ত করে। তারাও জন্মে রাজা না হয়ে পারে না, কারণ বর্ত্তমান সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো উচ্চে ওঠেই এমনভাবে সংগঠিত, যাতে করে তারা তাদের নিজেদের নৈতিক দিক দিয়ে অযথা দরকার রাজী না হয়ে তাদের যোগ্যতানুরূপ আরো বেশি অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্র সাধারণতঃ না পায়। ফল সংক্ষেপে থেকে শোষিত হও এবং অতি সামান্য আরো আধপেটা খেয়ে থাক। নয় তো শিক্ষা, ভদ্রমজুরী, ঘুষ, চোরাকারবার, মারীদেহের দালালী (বিশেষতঃ আধুনিক সব সভ্য, 'রিফাইন্ড' পদ্ধতিতে এবং অর্থবান মালিকদের সক্রিয় অনুগ্রহে লাভের মূলধনরূপী, ইত্যাদি সব পথে মোটা টাকা কর। বর্ত্তমান সমাজের বাস্তব অবস্থা থেকে শুধু এই দুটো বিকল্প-পথই (alternative) আমাদের সামনে রয়েছে। অত্যন্ত অভিশপ্ত, ভয়ঙ্করকম অবস্থা নিশ্চয়,—কিন্তু প্রতিকারের কোন্ পথে?

পুঁজিবাদী সমাজের নিজস্ব নিয়মগুলির প্রক্রিয়ায় ক্রমে ও অল্পক্রমে সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থার অভূতপূর্ব রূপ পরিবর্তন এসে গিয়েছে এবং যাচ্ছে। সম্ভবতঃ নূতন পথের আসবার আগে এই পথেরই এই শেষ স্তর। যাদি লাখি লাখি টাকা যাদের হাতে জমছে, তারা নিজেরা ভদ্রমজুরীহীন, জীবনের মূল্যবোধহীন যন্ত্রে পরিণত হচ্ছে, এবং অন্যান্য মানুষকে শুধু নিজেদের ভোগভাবনায়, অফিস, ব্যাঙ্ক চালাবার ও মুনাফাবৃদ্ধির নিছক যন্ত্রতপে দেখতে অভ্যস্ত হচ্ছে। শুধু সহানুভূতিহীন, মনুষ্যত্বসম্পর্কহীন প্রতিযোগিতা,—পরস্পর পরস্পরকে ভয়াবহ, পরস্পরের বিচার ও শোষণের ক্ষেত্র বলে মনে করা,—পুঁজিবাদী সমাজের এই কেন্দ্রীয় সৃষ্টি-ভঙ্গীর বিষ বহুধা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে,—এমন কি গরীব বা মধ্যবিত্ত, যাদের টাকা নেই, তাদের ছেলের কোথাও কোথাও অজ্ঞাতসারে সব হয়ে। কৃষি, সভ্যতা, পারিবারিক জীবন, সামাজিক বন্ধন প্রভৃতির মতো যা কিছু গভীর

পরিত্র, মূল্যবান, সব কিছু খান খান হয়ে ভেঙে পড়ছে। মার্কস্ বলেছেন :

The bourgeoisie has left remaining no other nexus between man and man than naked self-interest, than callous 'cash payment.' It has drowned the most heavenly ecstasies of religious fervour, of chivalrous enthusiasm, in the icy water of egoistical calculation. It has resolved personal worth into exchange value, and in place of the numberless indefeasible chartered freedoms, ……it has substituted naked, shameless, direct, brutal exploitation.

সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থার ওপর এর ফল হয়েছে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী, ভয়ানক। স্নেহ, প্রীতি, শ্রদ্ধা, করুণা, বন্ধুত্ব, পারস্পরিক বিশ্বাস প্রভৃতি মানুষে মানুষে সম্পর্কের জায়গায় ক্রমশঃ একমাত্র যুক্তি, আর্থিক স্বার্থ ও লেন-দেনের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। টাকাকে তার নিজস্ব আভ্যন্তরিক মূল্যের চাইতে অনেক বেশি মূল্য দেওয়া হয়েছে। ফলে জীবনের অন্যান্য শ্রেষ্ঠতর মূল্যবোধগুলোর (values) আপেক্ষিক গুরুত্ব কমানো হয়েছে ও হচ্ছে। আবার মার্কস্ থেকে উদ্ধৃত করি :

The bourgeoisie has stripped of its halo every occupation hitherto honoured and looked up to with reverent awe. It has converted the physician, the lawyer, the priest, the poet, the man of science, into its paid wage labourers. The bourgeoisie has torn away from the family its sentimental veil, and has reduced the family relation to a mere money relation.

মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ, সভ্যতার গতির ঐতিহাসিক-প্রবাহ এইভাবে বিনষ্টির পথে। এই অভিশাপ-বেষ্টনী থেকে তাহলে মুক্তির পথ কোথায়? রাষ্ট্রের ওপর, গবর্ণমেণ্টের ওপর ভরসা করা যেতে পারে না কি? অবশ্যই করা যেতে পারে, যদি রাষ্ট্রযন্ত্রকে জনসাধারণের স্বার্থে আমূল বদলিয়ে ফেলা যায়। কারণ, এ কথা মনে রাখলে কাজের বেলায় বাস্তব দৃষ্টিটা স্বচ্ছ থাকবে যে খুব বেশির ভাগ দেশেই আজো "The executive of the modern State is but a committee for managing the common affairs of the whole bourgeoisie." (মার্কস্)

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ভারতকে সর্বপ্রকার শোষণমুক্ত দেশে পরিণত করতে হবে, যেখানে গরীব এবং নিম্ন মধ্যবিত্তেরাও স্বচ্ছন্দে বাঁচবার ও পূর্ণ আত্মবিকাশের সুযোগ পাবে, এমনি সব কথা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বার বার উচ্চারিত হয়েছিল মহাত্মাজী ও পণ্ডিতজীর বহু বক্তৃতা ও লেখায় :

(১) According to me the economic constitution of India should be such that……everybody should be able to get sufficient work to enable him to make the two ends meet. And this ideal can be universally realised only if the means of production of the elementary necessaries of life remain in the control of the masses."

—Gandhiji ('Young India' —15. 11. 28)

(২) "Under Swaraj……for years to come, India would be engaged in passing legislation in order to raise the down-trodden, the fallen, from the mire into which they have been sunk by the capitalists, by the landlords, by the so-called higher classes, and then subsequently and scientifically, by the British rulers. If we are to lift these people from the mire, then it would be the bounden duty of the National Government of India, in order to set its house in order, continually to give preference to these people and free them from the burdens under which they are being crushed."

—Gandhiji ('Nation's Voice', Vol. No. 71)

'অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে'র (এ, আই, টি, ইউ, সি) প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে (১৯২৯) সভাপতির আসন থেকে পণ্ডিত নেহরু বলেছিলেন : "ভারতের জনগণের শাদা মনিব চলে গিয়ে শুধু কালো মনিব এলেই শ্রমিকদের অবস্থার কিছু উন্নতি হবে না। শ্রমিক ও গরীবদের অনাহার করে রেখে শোষণের ভিত্তিতে গড়া বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোই চল্লে সব কিছু পালটে যাবে। এই পুঁজিবাদী কাঠামো বজায় রেখে শ্রমিকদের (তথা জনসাধারণের) অবস্থার সামান্য পরিবর্তনই সম্ভব; তাই এর একেবারে মূলোচ্ছেদ করতে হবে।"

পুরানো সংবাদপত্রের ফাইল থেকে এরূপ আরো বহু উদ্ধৃতি সংগ্রহ করা যেতে পারে; কিন্তু তা নিষ্প্রয়োজন। ভারতবর্ষ বর্তমানে অনেকাংশে স্বাধীন হয়েছে। গান্ধীজীর আদর্শ এবং পণ্ডিতজীর ঐ রকম সব উক্তির মানদণ্ডেই আজ বিচার করতে হবে যে সেই পথেই দেশ আজ চলেছে কিনা,—দেশের কৃষক, শ্রমিক, কেরানী, গরীব বুদ্ধিজীবী, বিত্তহীন মধ্যবিত্ত —এক কথায়, দেশের শতকরা নিরেনব্বুই জন মানুষের স্বার্থে আমাদের জাতীয় গবর্ণমেণ্টের যাবতীয় নীতি ও কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কিনা,—জাতীয় সরকারের উদ্যম থেকে কংগ্রেসের বহু-ঘোষিত সমাজতান্ত্রিক আদর্শের বাস্তি-নিরপেক্ষ কঠোর প্রয়োগের সকল দুর্বলের আশ্রয়, অত্যাচারী মালিক, চোরাকারবারী মুনাফা-শিকারী সমাজের মস্তরূপী ধনী শোষকের দল সব অত্যন্ত ভয়ানক হয়ে উঠেছে কিনা। গান্ধী-নির্দিষ্ট পথে যে অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়ে রাজনৈতিক বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করতে, জনগণের এই অসহনীয় অবস্থার অবসান করতে কংগ্রেস প্রতিশ্রুত, তার অন্তত সরকারী সূচনাও করা হয়েছে কিনা, নিঃসন্দেহে, অকপট কংগ্রেসকর্মী মাত্রকেই আজ এই প্রশ্ন নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে, উত্তর খুঁজে পেতে হবে। সারা দেশ জুড়ে আজ অন্নহীন, বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন, চিকিৎসাহীন, বর্তমান-ভবিষ্যৎহীন, মুমূর্ষু, অনাহার, জীবন-শ্রান্ত নরনারীর অন্তহীন ছায়া-মিছিল চলেছে। জনসাধারণের বাজার থেকে একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনবারও ক্ষমতা ক্রমে নিঃশেষিত হচ্ছে, অসহনক্লিষ্ট পরিজনবর্গের কান্না ও দীর্ঘশ্বাস বেকারীর জ্বালা সহ্য না করতে পেরে আত্মহত্যা করতে কর্মক্ষম যুবক, এতদূর ভারতবর্ষে একটু মাথা গুঁজবারও ঘর যার মিলছে না হাজার হাজার নরনারীর, ক্রয়মূল্য বৃদ্ধির শেষহীন ফাঁস ক্রমশঃই ভয়াবহভাবে এঁটে বসছে জনসাধারণের গলায়। এ কথা আজ আমাদের প্রত্যেকের নিজেকে জিজ্ঞেস করেই হবে যে 'স্বাধীন' ভারতে—'স্বাধীন' ভারতেও—এ রকম অকল্পনীয়রূপ শোচনীয় অবস্থা কেন অব্যাহতভাবে হয়ে উঠল। যদি আমরা ভাবের ঘরে চুরি না করি, চুলচেরা-করা লাজানো জবাবে নিজেকে ও অন্যকে ভোলানোর চেষ্টা না করে সমস্ত ব্যাপারটার তলায় যেতে সাহসী হই, তবেই শুধু প্রশ্নটার পুরো মানে আমাদের নিজেদের কাছেও পরিষ্কার হবে, এবং তার পুরো জবাবও মিলবে। জবাবের মূল কথাটা অবশ্য নূতন কিছু নয়।

একমাত্র পূর্ণ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাতেই, অর্থের ন্যায়সঙ্গত পুনর্বণ্টনব্যবস্থাতেই সকলের প্রতি ন্যায় করা সম্ভবপর, সকলকে সুখী হবার পথ খুলে দেওয়া সম্ভবপর। ইতিহাস ও প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম অনুসরণ করে অনিবার্য পরিণতিতে এই যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, সমাজ ও রাষ্ট্রের আমূল রূপান্তরের দিন এগিয়ে আসছে, একে মানুষের সেই আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের উপযুক্ত করে সম্পূর্ণ অহিংস ও শান্তিপূর্ণভাবে সংঘটিত করবার একান্ত ইচ্ছা ছিল মহাত্মা গান্ধীর। তাঁর বহুমুখী জীবন-সাধনার একটা প্রধান লক্ষ্যই ছিল এই। আর্থিক পরিবর্তনের ওপরই তিনি তাই বার বার জোর দিয়েছেন। ধনীরা শোষণপ্রবৃত্তি

ও অধিকারযুক্ত হয়ে নিজেদের শুধু অছি (trustee) বলে মনে করবে, অন্যায় ও নিষ্ঠুরভাবে অপরিমিত অর্থোপার্জনের বেপরোয়া নেশা থেকেও তারা এইভাবে মুক্ত হবে, এবং অন্যদের অন্যায় প্রয়োগপ্রবৃত্তির হাত খুলে দেওয়ার ব্যাপারে যেসব প্রধান অন্তরায় রয়েছে, এই নীতি তিনি প্রচার করেছেন এবং তা কার্যকরী করার জন্য চেষ্টা করেছেন। ভারত-বন্টন ভেদী-সংগ্রাম, এবং তজ্জনিত বিষম বিক্ষুব্ধতা, সংঘর্ষ, রক্ত পরিণামে সম্ভবতঃ একাকে গণ-বিপ্লব থেকে শুধু এইভাবেই ভারতের ভবিষ্যৎকে রক্ষা করা যেতে পারে, একথা মহাত্মাজী আমৃত্যু অন্তরে বুঝেছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবৎকালে তিনি এদিক দিয়ে অধি সামান্যই সফলতা লাভ করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বিরাট দৃষ্টান্ত এবং অনুকরণীয় প্রভাব সত্ত্বেও ধনীদের বাস্তবক্ষেত্রে এ কথা তিনি বোঝাতে পারেন নি। নিঃসন্দেহ মহাত্মাজী এবং অকপট কংগ্রেসকর্মী মাত্রেই অনুভব করেন যে, তাঁর চলার পর অবস্থার আরো অবনতি ঘটেছে। ভারতে সকল মানুষেরই জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ন্যায়প্রতিষ্ঠার সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা কোন পথে যায় বিস্তৃত পরিণতি লাভ করবে, আগামী দিনগুলিতেই শুধু তার চূড়ান্ত উত্তর মিলবে। শোষণমুক্ত খাঁটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে প্রথম কথা। তারই সঙ্গে সঙ্গে শোষণের মূল অবস্থাগুলি ও দৃষ্টিভঙ্গীর অন্যায় যে সব সূক্ষ্ম ও স্থূল তাত্ত্বিক গলদ মানুষের (বর্তমানের সবারও) সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে সেগুলিকে তার কয়েকটী অত্যাবশ্যক দৃষ্টান্ত দিয়েছি, সে সব ক্রমশঃ ধীরেধীরে বিদায় নেবে।

বালিগঞ্জ রিয়েল প্রপার্টি এ্যাণ্ড বিল্ডিং সোসাইটি লিমিটেড

(পূর্ব্বে বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ নামে অভিহিত ছিল)

★ আমাদের ডিরেক্টরবর্গ ★

১। কুমার প্রমথনাথ রায়
২। শ্রীসতীশচরণ সাহা
৩। শ্রীসুধীরচন্দ্র নান
৪। শ্রীসুনিরুদ্ধ রায়
৫। শ্রীনিমাইচরণ মৈত্র
৬। শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষ
৭। ডাঃ এস্, এন্, সিংহ

আমাদের সম্পত্তি ও দায়

আমাদের দায়		আমাদের সম্পত্তি		সম্পত্তির বর্ত্তমান মূল্য
আমাদের মূলধন—		(ক)	কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত ১২২৮ কাঠা জমি (বেঙ্গল ল্যাণ্ড দক্ষিণ কলিকাতা)	৬১,৪০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত	১০,০০,০০০৲ টাকা	(খ)	টালিগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত ১৪৮৪ কাঠা জমি	৩১,৯০,০০০৲ "
আদায়ীকৃত	৬,৬৪,২০০৲ "	(গ)	অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত ১৬১৮০ কাঠা জমি	৩২,৩৬,০০০৲ "
স্থায়ী ও অন্যান্য জমা ৩১-৮-৪৮ পর্য্যন্ত	৬৯,১০,৫৩৭৲ "	(ঘ)	কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত বাড়ীর মূল্য	১৪,৫০,০০০৲ "
		(ঙ)	এ্যাসানসোলে ৬৫০০ বিঘা জমি	৬,৫০,০০০৲ "
	৮৫,৭৭,৭৩৭৲ টাকা			১,৫২,৪৭,০০০৲ টাকা

আমাদের দায়ের উপর সম্পত্তির উদ্বৃত্ত অর্থ

৭০,৬৬,২০৩৲ (সত্তর লক্ষ ছেষট্টি হাজার দুইশত তিন টাকা)

আমাদের অর্থ বিনিয়োগ

আমরা জমি উন্নয়ন করিয়া ও বাড়ী তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যেই কেবলমাত্র টাকা বিনিয়োগ করি।

আমাদের ক্রমোন্নয়নী কার্য্যাবলী—আমরা ১৫০টি বিল্ডিং প্লট তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করিয়াছি, বহু বাড়ী এবং লেক ও মোটর রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ করিয়াছি এবং আমাদের ৫০টি বাড়ী বর্ত্তমানে ব্যক্তিদের দ্বারা ভাড়া খাটান হইতেছে। আরও বাড়ী তৈয়ার করা হইতেছে।

আমাদের অফিস বিল্ডিং

কলেজ-বিহারী এ্যাভেনিউ এবং পরিচালনাধীন লেকের সংযোগস্থলে, ৩৭ কাঠা জমির উপর আমাদের অফিস বিল্ডিংটীর ভিত্তিস্থাপন কর্পোরেশন কর্ত্তৃক অনুমোদিত দক্ষিণপ্রান্ত 'আইডেন্সার্স'। ইহার ৩০ ফুট গভীর 'আণ্ডার-গ্রাউণ্ড ভল্ট' এবং ভিতীয় তলা নির্ম্মিত হইয়া গিয়াছে। বাকী অংশ নির্ম্মিত হইতেছে।

আমাদের স্থায়ী জমা

আমরা কেবলমাত্র ১, ২, ৩, ৪ এবং ১০ বৎসরের জন্য 'স্থায়ী জমা' গ্রহণ করি। আজই করিলে উহার হার জানান হইবে।

আমাদের নূতন পরিকল্পনা—১৯৪৯ সালের জন্য

আমাদের বিভিন্ন পরিকল্পনায় ১০০টি বিল্ডিং প্লট ছাড়া আমরা ১৯৪৯ সালে ৫০টি বাড়ী তৈয়ারী করিব। এর একটির জমিসহ দর ২৮,৫০০৲, ২৫,০০০৲ এবং ৩৫,০০০৲ টাকা। ইহার শতকরা ৫৲ টাকা অগ্রিম এবং পূরণিমাধ্যমে অবশিষ্ট অবস্থায় যখন ইচ্ছা সময় শতকরা ৫০৲ টাকা দেয়। ১৯৪৮ সালে ১৯শে অক্টোবর তারিখে ইহার প্লান দেখিতে পাওয়া যাইবে।

ডাঃ এস্ এন্ সিংহ　　শ্রী এন্ সি মৈত্র
ম্যানেজিং ডিরেক্টরদ্বয়

মার্শাল পরিকল্পনা

অতুল বসু

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অতি সন্তর্পিত ভাবে অগ্রসর হইতেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তাহার গায়ে প্রত্যক্ষভাবে আঁচড় লাগে নাই এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে ও মূলধনের লাভের অঙ্ক বৃদ্ধিতে যুদ্ধ সহায়কই সৃষ্টি হইয়াছে। যুদ্ধ শেষ হইবার পর এখন ইউরোপ রণ-বিধ্বস্ত এবং রাজনৈতিক হাঙ্গামা উৎপন্ন; উপনিবেশিক দেশগুলিতে আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন আজ প্রবল। বর্ধিত পণ্য বিক্রয় দূরে থাকুক, পূর্বের বাজারই এখন অত্যন্ত সঙ্কুচিত। অনাবশ্যক অর্থনীতি অটুট রাখিতে হইলে এবং মূলধনের মূল্যমান অক্ষ অপরিবর্তিত রাখিতে হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক ও বেসামরিক পণ্যের জন্য বাজার চাই-ই। সামরিক পণ্য বিক্রয়ের জন্য পৃথিবীব্যাপী একটা যুদ্ধের আবহাওয়া প্রয়োজন, একটি কাল্পনিক আক্রমণকারীও উপস্থাপিত করা আবশ্যক। আবার এদিকে বেসামরিক পণ্য বিক্রয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আশু অথবা সুদূরবর্তী স্বার্থ যাহাতে বিনষ্ট না হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সুতরাং ইউরোপের পুনর্গঠনে অথবা উপনিবেশিক দেশগুলিতে শিল্পপ্রতিষ্ঠায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব চাই। ভারতবর্ষে বিমানের ইঞ্জিন তৈয়ারীতে সাহায্য করিয়া আমেরিকা তাহার নিজের বিমান শিল্পের সুতন প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টির সহায়ক হইতে পারে না। কুটনৈতিক জাহাজ শিল্পকে পূর্বের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইতে দিলে যুদ্ধের সময় আমেরিকার যে বিশাল জাহাজ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার যে ক্ষতি হয়।

মার্শাল পরিকল্পনার মূলকথা

যুদ্ধোত্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রয়োজন এবং এই মনোভাব হইতেই তথাকথিত মার্শাল পরিকল্পনার উদ্ভব। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ইউরোপের ১৬টি রাষ্ট্রকে সাহায্য দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই পরিকল্পনার মূলকথা—আমেরিকা অর্থ সাহায্য প্রদান করিবে, কিন্তু অধমর্ণ দেশ এই অর্থ কিভাবে ব্যয় করিবে, তাহা মার্কিন পুঁজিপতিরা স্থির করিয়া দিবেন। এই অর্থে মার্কিন পণ্য ক্রয় করিতে হইবে; সেই পণ্যের জন্য আমেরিকার দাবী অনুযায়ী মূল্য দিতে হইবে। অধমর্ণ দেশ কেবল সেই সব শিল্পে এই অর্থ ব্যয় করিতে পারিবে, যাহা মার্কিন শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিবে না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অধমর্ণ দেশটিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলে যোগ দিয়া সোভিয়েট রুশিয়ার বিরোধিতা করিতে হইবে; সোভিয়েট-বিরোধী যুদ্ধের জন্য সামরিক আয়োজন চালাইয়া যাইতে হইবে। "প্রচার করা হইতেছে যে, এই মার্শাল পরিকল্পনা আমেরিকার বিশ্বমানবতার নিদর্শন; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা মার্কিন পুঁজিপতিদের বাস্তব স্বার্থ অনুযায়ী পরিকল্পিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান পররাষ্ট্র নীতির মত এই মার্শাল পরিকল্পনাও সমগ্র পৃথিবীর উপর—বিশেষতঃ ইউরোপের উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রচিত।"

উৎপাদন বৃদ্ধিতে আমেরিকার সমস্যা

যুদ্ধের সময় আমেরিকার উৎপাদন প্রসারিত হয় পূর্বাপেক্ষা প্রায় তিন। ১৯৩৯ সালে উৎপাদনের মান ১০০ ধরিয়া ১৯৪৩ সালে এই মান উঠিয়াছিল ১৮৭তে। সমরোপকরণ উৎপাদনে মার্কিন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি তখন অত্যন্ত ব্যস্ত। সকল রকম টাক্স পরিশোধ করিয়া মার্কিন পুঁজিপতিদের লাভের পরিমাণ ১৯৪৩ সালে ২ হাজার কোটি ডলারে পরিণত হইয়াছিল। ১৯৩৬ সাল হইতে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত মার্কিন পুঁজিপতিদের গড়পড়তায় যে লাভ হয়, এই লাভের পরিমাণ তাহার আড়াইগুণ। যুদ্ধ শেষ হইবার পর এই লাভের পরিমাণ ঠিক রাখিবার জন্য মার্কিন পণ্যের বাজার একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে। বিশেষজ্ঞরা হিসাব করিয়া দেখান যে, আমেরিকার বাৎসরিক রপ্তানীর পরিমাণ ১১ হাজার কোটি ডলারে পরিণত হওয়া দরকার: ১৯৩১-৩৯ সালে আমেরিকার বার্ষিক রপ্তানীর গড়পড়তা পরিমাণ ছিল ৪ শত ৩০ কোটি ডলার। অর্থাৎ যুদ্ধোত্তর কালে আমেরিকার রপ্তানী সাড়ে পাঁচ গুণ বাড়াইবার প্রয়োজন ঘটে।

কিন্তু রপ্তানী হইবে কোথায়? যুদ্ধের পূর্বে জার্মানী ও জাপান মার্কিন পণ্যের বড় ক্রেতা ছিল। ১৯৩৭ সালে জার্মানী আমেরিকার নিকট হইতে ১২ কোটী ৯০ লক্ষ ডলার মূল্যের মাল কিনিয়াছিল। ঐ বৎসর জাপান কেনে ১৪ কোটী ৯০ লক্ষ ডলার মূল্যের মার্কিন পণ্য। এই দুইটি দেশের সমরায়োজন তখন মার্কিন পুঁজিপতিদিগকে মোটা মুনাফা যোগাইয়াছে। ইহারা এখন বিধ্বস্ত। ইহাদের পণ্যের প্রয়োজন আছে; কিন্তু সমর মূল্যে কিনিবার সামর্থ্য নাই। বৃটেনও মার্কিন পণ্যের সবচেয়ে বড় ক্রেতা ছিল না; যুদ্ধের পূর্বে আমেরিকার মোট রপ্তানীর ১৫ ভাগই যাইত বৃটেনে। আমদানী ও জানাডা বাদে সমগ্র বৃটিশ কমনওয়েলথে মার্কিন পণ্য রপ্তানীর পরিমাণ ছিল শতকরা ১৪ ভাগ। বৃটেনের সে ক্রয়ক্ষমতা আর নাই। বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্যান্য দেশের মধ্যে যাহাদের বিনিময় ক্ষমতা আছে, তাহাদেরও আমেরিকার নিকট বেচিয়া ডলার সংগ্রহ করিবার মত পণ্যের অভাব। ইউরোপের ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের অবস্থাও এইরূপ—হয় ক্রয়-ক্ষমতা নাই, না হয় ডলারের অভাব।

এই অবস্থায় যুদ্ধে অক্ষত ও সমৃদ্ধ আমেরিকার পক্ষে নিজের স্বার্থের জন্যই রণ-বিধ্বস্ত ও অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে সাহায্য করিতে অগ্রসর হওয়া স্বাভাবিক। ইহাতে অন্যায় বা অশোভন কিছুই নাই। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আজ বাঁচিয়া থাকিলে এইভাবে পৃথিবীর অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠায় যারা নিজ দেশকে উপকৃত করিতে তিনিও সচেষ্ট হইতেন। কিন্তু পৃথিবীর বর্তমান অর্থনৈতিক দুর্গতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন দেশকে ডলারের বিনিময়ে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বিক্রয়ে যারা তিনি করিতেন না; আমেরিকার সমরশিল্পের মালিকদের মুনাফার অঙ্ক ঠিক রাখিবার জন্য জনস্বার্থী সমরায়োজনে প্রশ্রয় তিনি দিতেন না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে যে ব্যক্তি স্বাভাবিক তাঁহার আসনে অধিষ্ঠিত হন, তিনি তাঁহার মহান আদর্শ বিসর্জন দিয়াছেন। সেই আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার জন্য গভর্নমেন্টে সেনেটর ওয়ালেসের স্থান হয় নাই; তিনি আজ কমুনিষ্ট অপবাদে লাঞ্ছিত হইতেছেন।

ইউরোপীয় পুনর্গঠন কর্মসূচীতে কঠোর সর্তাবলী

মার্শাল পরিকল্পনা অনুযায়ী সাহায্যপ্রার্থী দেশগুলির অর্থনীতি-ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ইউরোপ পুনর্গঠনের যে কর্মসূচী (European Recovery Programme—ERP) রচিত হয়, তাহার কার্য্য পরিচালনার জন্য ওয়াশিংটনে একটি অর্থ-নৈতিক সহযোগ পরিকল্পনা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রার্থী প্রত্যেক দেশে এই বিভাগের একজন করিয়া কর্মচারী থাকিবে; সাহায্যের জন্য আবেদন পরীক্ষা

প্রেতাবতার অর্থ, অর্থাৎ, অভিধান, খুন ও অপঘাতের একমাত্র সহোদর। আরম্ভ করিলে করিয়া ইহার একমাত্র সেবনে তৎক্ষণাৎ ক্ষুধার উদ্রেক হয়।
মূল্য—এক টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র
কবিরাজ শ্রীমোহনবিহারী ঘোষালী, বিদ্যারত্ন
পো: পুলদিঘী (ভায়া কোলাঘাট), মেদিনীপুর।

করা এবং প্রাপ্ত সাহায্য কিভাবে ব্যয় হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা এই কর্মচারীর কাজ হইবে। কোন্ দেশকে কখন কিভাবে সাহায্য করিতে হইবে, তাহা চূড়ান্তভাবে স্থির করিবেন এই মার্কিণ কর্মচারিটী।

ইউরোপের সাহায্যপ্রাপ্ত দেশগুলিকে নিম্নলিখিত সর্ত্তাবলী মানিয়া লইতে হইয়াছে—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের লাখী অনুযায়ী শুল্কপ্রাচীর নামান হইবে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছা অনুযায়ী কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত হইবে; যে সব কাঁচা মাল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জমা রাখিতে চায় (যুদ্ধের প্রয়োজনে?), সেই সব নির্দ্দিষ্ট কাঁচা মালের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইবে; মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নির্দ্দেশ অনুসারে বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হইবে; মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত সাহায্যের সমান স্টার্লিং মুদ্রা একটি বিশেষ হিসাবে আমানত রাখিতে হইবে; মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট যেভাবে নির্দ্দেশ দিবেন, সেইভাবে এই অর্থ ব্যয় হইবে।

এইভাবে মার্কিণ সাহায্যপ্রার্থী দেশগুলির শিল্পবাণিজ্য ও কৃষিক্ষেত্রে মার্কিণ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইয়াছে। তত্ত্বাবধায়করূপে যে সব কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবেন, তাঁহারা কার্য্যতঃ সাহায্যপ্রাপ্ত দেশগুলির অর্থনৈতিক ব্যাপারে সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বই করিবেন।

বৃটেনে গভীর বৈরাশ্য

সাহায্যপ্রার্থী দেশগুলি কিভাবে মার্কিণ সাহায্য পাইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিলে মার্কিণ পুঁজিপতিদের অভিসন্ধি সম্বন্ধে আর কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকিবে না। ইংলণ্ডের আজ সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন যন্ত্রপাতির; সে তাহার পুরাতন ও অচল যন্ত্রপাতি পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন-বিজ্ঞান অনুযায়ী গড়িয়া তুলিতে চায়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মার্শাল পরিকল্পনায় স্থির হইয়াছে যে, ৩১১ কোটী পাউণ্ড সাহায্যের মধ্যে ১৬ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের যন্ত্রপাতি এবং শুল্ক ভিন্ন দেওয়া হইবে। ইস্পাত ও ইস্পাত তৈরীর যন্ত্রপাতি দেওয়া হইবে মাত্র ১০ লক্ষ পাউণ্ডের; অর্থাৎ প্রার্থিত পরিমাণের এক-চতুর্থাংশেরও কম। ইহার আশু ফল—তাহার তৈয়ারীর জন্য যন্ত্রাদি ইস্পাতের পরিমাণ শতকরা ১০ ভাগ কমাইতে হইয়াছে; ইহাতে এই শিল্পের শতকরা ১০ ভাগ শ্রমিককে বেকার হইতে হইবে। অথচ আমাদের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বৃটেনের নিকট মার্কিণ আমদানি বিক্রয় করিয়া উদ্বৃত্ত প্রদর্শন করা হইবে। আমাদিগের জন্য বিমানে চড়িয়া হইবে মার্কিণ আমেরিকের ফেরী! মার্কিণ প্রভুত্ব এবার সম্পূর্ণ ও মার্শাল পরিকল্পনার প্রবর্ত্তনার পক্ষপুট দিয়া বেষ্টিনের বটিত বৃটেনের প্রয়োজনের তালিকাটি অনেক কাটিয়া ছাঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে; যন্ত্রপাতির পরিমাণ কমাইয়া তৈয়ারী মালের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। বৃটেন রাখিয়াছিল—কৃষিতে সরঞ্জাম, লৌহ ও ইস্পাত এবং ইস্পাতের সরঞ্জাম। কিন্তু সে না চাহিতেই পাইয়াছে চিনি, কফি, মাখন, কলা, সীসা, সুবাসপত্র তামাকের কাগজ এবং চামড়া। সাধারণতঃ তামাকের কাগজ সাহায্য ব্যাপারটি বেশ কৌতূহলপ্রদ। এই বস্তুটি বৃটেন মোটেই চাহে নাই; কিন্তু মার্শাল পরিকল্পনা অনুসারে সে পাইয়াছে ১ কোটী ১ লক্ষ ডলার মূল্যের তিমির; কারণ মার্কিণ ব্যবসায়ের কলের মালিক টাকা বেচিবার বাজার পাইতেছিল না। বৈদেশিক বেশ বৃটেনে মালের অভাব নাই, কিন্তু তাহাকে ৭ কোটী ১ লক্ষ ডলার মূল্যের যন্ত্র দেওয়া হইতেছে; কারণ আটলাণ্টিক পারের মালের ব্যবসায়ীদের বাজার চাই। তাহার পর, মোটরগাড়ী, ১৯৪৭ সালে বৃটেন মোট যত মোটরগাড়ী বিদেশ হইতে আমদানী করিয়াছিল, ১৯৮০-৮১

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস ঃঃ মিশন রো, কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন		২,০০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন		৫০,০০,০০০৲ টাকা
সংরক্ষিত তহবিল	...	২৪,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে

টাকা সঞ্চয় করা বড় কথা, কিন্তু সঞ্চিত টাকা নিরাপদে রাখাও কম কথা নহে। "ক্যালকাটা ন্যাশনালে" আপনার টাকা জমা রাখিয়া আপনি টাকার নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। সমগ্র ভারতব্যাপী শাখা-প্রশাখার সহায়তায় "ক্যালকাটা ন্যাশনাল" আপনার ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল কাজ সুনির্ব্বাহ করিতে সমর্থ।

শাখা সমূহ

পশ্চিম বঙ্গ	বিহার	বোম্বাই	যুক্তপ্রদেশ	মাদ্রাজ
বড়বাজার (কলিঃ)	পাটনা	ফোর্ট (বোম্বাই)	এলাহাবাদ	মাদ্রাজ
ডালহৌসী স্কোয়ার	গয়া	জগন্নাথদেবী	কাণ্টনমেণ্ট (এলাহাবাদ)	মধ্যপ্রদেশ ও বেরার
বালীগঞ্জ	আসাম	সাণ্ডহার্ষ্ট রোড	লক্ষ্ণৌ	নাগপুর
ক্যানিং ষ্ট্রীট	গৌহাটী	আহমেদাবাদ	আমিনাবাদ (লক্ষ্ণৌ)	নাগপুর মিল্‌
হাটখোলা	শিলচর	একটি ব্রাঞ্চেস (আহমেদাবাদ)	বেরেলী	জব্বলপুর
হাইকোর্ট	উড়িষ্যা	সুরাট	বেনারস	জব্বলপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট
কালীঘাট	কটক	দিল্লী	কানপুর	রায়পুর
শ্যামবাজার	রাজপুতনা	দিল্লী	মেইন রোড (কানপুর)	অমরাবতী
জলপাইগুড়ি	আজমীর	সদরবাজার (দিল্লী)	আগ্রা	পূর্ব্ববঙ্গ (পাকিস্তান)
আসানসোল	পূর্ব্ব পাঞ্জাব			ঢাকা
	অমৃতসর			চট্টগ্রাম

লণ্ডন এজেন্টস্ :—মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

মাত্র ১০০ টাকা দিয়া আপনি একটী কারেণ্ট একাউণ্ট খুলিতে পারেন। মাত্র দশ টাকা জমা দিয়া একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোলা যায়। সেভিংস ব্যাঙ্কের জমা টাকার উপর শতকরা ২॥০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয় এবং শতকরা ২॥০ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়।

ক্যালকাটা ন্যাশনালে আপনার একটি একাউণ্ট রাখুন।

সালে মার্শাল সাহায্য ব্যবস্থার তাহার আড়াই শত মোটরগাড়ী ফ্রান্সকে দেওয়া হইবে। ১৯৪৭ সালে ফ্রান্সে মত মার্কিণ মোটরগাড়ী আসিয়াছিল, ইহা তাহার তিন গুণেরও বেশী। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, মার্শাল সাহায্য ব্যবস্থার পরিচালক পদ গ্রহণের আমেরিকার বৃহত্তম মোটর ব্যবসা ইুডিবেকার কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট। সাহায্য-ব্যবস্থার এই নমুনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ফ্রান্সের অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠনে সাহায্য করা মার্শাল পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নয়—এই পরিকল্পনার ফ্রান্সের বাজারে মার্কিণ পুঁজিপতিদের প্রতিপত্তি স্থাপনের ব্যবস্থাই হইয়াছে। বৃটিশ পার্লামেন্টের শ্রমিক সদস্য মিঃ বি, এন, ব্রিট্ ক্ষুব্ধ হইয়া বলিয়াছেন, "যে সব জিনিসের প্রয়োজন আমাদের সকলের চেয়ে বেশী, তাহা আমাদের নিকট বিক্রয় করা হইবে না। যে সব জিনিস কেহিবার তাহারা ধারণা পাইতেছে না—নিজ দেশে যাহার খরিদার নাই, সে সবই আমাদের নিকট বিক্রয় করা হইতেছে।" বৃটিশ পুঁজিপতিদের মুখপত্র—মার্কিণ সাহায্য সম্পর্কে উৎসাহী 'ইকনমিষ্ট'ও নৈরাশ্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছেন, "যে সকল জিনিস মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রয় হয় না, প্রধানতঃ তাহাই আমাদিগকে দেওয়া হইতেছে।"

স্কান্ডিনেভিয়ান দেশগুলির করুণ অবস্থা

মার্শাল সাহায্যপ্রাপ্ত অন্যান্য দেশের অবস্থাও অনুরূপ নয়। তিনটি স্কান্ডিনেভিয়ান দেশ—নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্ক তাহাদের কয়লাশিল্প, লৌহশিল্প ও ইস্পাতশিল্পের জন্য পাঁচ বৎসরে ৫ কোটি ডলার সাহায্য চাহিয়াছিল। কিন্তু সাহায্য-ব্যবস্থা সম্পর্কে সর্বশেষ পরিকল্পনা যখন রচিত হইল, তখন তাহারা নৈরাশ্যভরে দেখিল যে, প্রথম বৎসরে সাহায্যের পরিমাণ ১ শত কোটী ডলারেরও কম করা হইয়াছে। একান্ত প্রয়োজনীয় কয়লা সম্পর্কে কোনও উল্লেখই এই ব্যবস্থায় নাই; ডেনমার্কের লৌহ সরঞ্জামের বরাদ্দ খুবই কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ডেনমার্ক ও সুইডেনকে বলা হইয়াছে—তাহারা যেন প্রচুর পরিমাণে আমেরিকার ইস্পাতজাত পণ্য ক্রয় করে। আর সুইডেনকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে—সে যেন তাহার লৌহশিল্প প্রসারিত না করিয়া কাঁচা লোহা তৈরে চালান দেয়। মার্শাল পরিকল্পনায় ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা পরে আলোচনা করিতেছি। সুইডেনকে এই "সৎ" পরামর্শ দিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে, সে প্রতি মাসে ৫ কোটী ক্রোনার আমেরিকান্ সিগারেট পাইবে। ডেনমার্ক-দিগকে ১৫ মাসে এক মোটরগাড়ী দেওয়া হইবে যে, ৫ বৎসরেও হয়ত তাহার তত মোটরগাড়ীর প্রয়োজন হইবে না।

নরওয়ে বিরাট ইস্পাতশিল্প গঠন করিতে চাহিয়াছিল এবং ইহার জন্য সে আমেরিকার নিকট যন্ত্রপাতির আবেদন জানাইয়াছিল। এই আবেদন অনির্দিষ্ট কালের জন্য চাপা পড়িয়াছে। নরওয়েকে জাহাজ-শিল্প পুনর্গঠনের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে হইয়াছে; ইহার পরিবর্তে তাহাকে আমেরিকার পুরাতন 'লিবার্টি' জাহাজ কিনিয়া প্রয়োজন মিটাইতে হইবে। নরওয়ে এলুমিনিয়াম্ শিল্প গঠনের জন্য যন্ত্রপাতি চায়। ওয়াল ষ্ট্রীটের কর্তৃপক্ষ তাহাকে এই দুরাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া আমেরিকা হইতে এলুমিনিয়াম কিনিতে নির্দেশ দিয়াছেন।

বেলজিয়াম্ প্রথমদিকে খুবই উদ্যত। বৃটেনের তুলনায় তাহার শ্রমশিল্প বিলম্বে হইয়াছে কম। ১৯৪৭ সালের প্রথম এগার মাসে বেলজিয়াম প্রায় ১১ হাজার কোটী ফ্রাঙ্ক মূল্যের মার্কিণ-পণ্য আমদানী করে; ঐ সময়ে সে আমেরিকায় রপ্তানী করে মাত্র ২৮ শত কোটী ফ্রাঙ্ক মূল্যের পণ্য। ইহার ফলে বেলজিয়ামের শ্রমশিল্প সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। তাহার খাদ্যশিল্প প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল পায় না; তাহার লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের কারখানা অল্প পরিমাণে কাজ করিয়া থাকে। বেলজিয়ামের একটি বিশিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বলেন, "আমরা এক অদ্ভুত অবস্থায় পতিত হইতেছি। মার্শাল পরিকল্পনায় আমাদের অবস্থা উহার চরমে পৌঁছুক, অবস্থা এমনই খারাপের দিকেই যাইতেছে।"

সোভিয়েট বিরোধী আয়োজন

জাতি-সঙ্ঘের অন্যতম ভারতীয় প্রতিনিধি সর্দার পানিক্কর মার্শাল পরিকল্পনা সম্পর্কে বলিয়াছেন, "পশ্চিম ইউরোপ সম্পর্কে আমেরিকার নীতি খুবই সরল। সোভিয়েট চুক্তিবদ্ধ প্রস্তাবের বাহিরের দেশগুলির অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠনে সাহায্য করিয়া তাহাদিগকে সোভিয়েটের প্রস্তাব রোধ করিবার মত শক্তিশালী করিয়া তোলাই এই নীতি। ইহারই নাম মার্শাল পরিকল্পনা। বেসরকারী মহলে স্পষ্টই স্বীকার করা হয় যে, কম্যুনিজমের গতি রোধ করা এই পরিকল্পনার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। রুশ-বিরোধ যুগোস্লেভিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, আলবেনিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিকে এই পরিকল্পনার সুবিধা গ্রহণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। কিন্তু ঐ সব দেশ মার্শাল পরিকল্পনার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উহা বর্জন করিয়াছে।"

পূর্বেই বলিয়াছি, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য দৃষ্টিবিস্তারী একটা সমরায়োজনের প্রয়োজনীয়তা আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সাধারণভাবে জগতে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; শ্রেণী হিসাবে জগতের পুঁজিপতিরা এখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। আবার এই যুদ্ধের ফলে প্রতি দেশে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক জাগরণ আসিয়াছে; ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার শোষণের বিরুদ্ধে দিকে দিকে প্রতিবাদ উঠিতেছে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জগতের উৎকণ্ঠিত পুঁজিপতি শ্রেণীকে এই জাগরণের বিরুদ্ধে সাহস করিতে বলিতেছে। তাহার যুক্তি (শ্রেণী হিসাবে জগতের পুঁজিপতিদের যুক্তি) এই যে, বিশ্বের জনসাধারণ প্রয়োগিক করিতেছে সোভিয়েট রুশিয়া, ইহাদের সহায়তায় সারা বিশ্বে কম্যুনিজম প্রসারিত করাই তাহার উদ্দেশ্য; সুতরাং সকলে নিজ নিজ দেশের জনসাধারণের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করুন এবং সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে পারস্পরিক সামরিক সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত হউন। কম্যুনিজমের ও সোভিয়েট রুশিয়ার আক্রমণাত্মক প্রচেষ্টার ভয় দেখাইয়া পশ্চিম ইউরোপকে সোভিয়েট বিরোধী ঘাঁটীতে পরিণত করা মার্শাল পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য। কেবল অর্থনৈতিক দিক হইতে নহে—সামরিক দিক হইতেও পশ্চিম ইউরোপকে সোভিয়েট বিরোধী ঘাঁটী করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। এই ঘাঁটীকে সক্রিয় করিবার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম জার্মানীর শিল্পকেন্দ্রগুলিকে ব্যবহার করিতে চায়। এই অঞ্চলের শিল্পপতিরা চিরকালের ও জাতীয় দলের সহযোগী। ইহাদিগকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

ইউরোপীয় পুনর্গঠন কর্মসূচীতে পশ্চিম জার্মানীর ভূমিকা

১৯৪৫ সালে পোট্সডামে সম্মেলনে স্থির হয় যে, জার্মানী হইতে নাৎসীবাদের নির্বাসন করিতে হইবে, তাহার আক্রমণাত্মক সামরিক শক্তি ধ্বংস করিতে হইবে এবং গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ জার্মানী গড়িয়া তুলিতে হইবে। প্রধান দুইটি উদ্দেশ্য পশ্চিম জার্মানীতে কতখানি সফল হইয়াছে, তাহা আন্তর্জাতিক বৃটিশ পত্রিকা 'নিউ ষ্টেট্সম্যান্ এণ্ড নেশনের' মন্তব্য হইতে বুঝা যাইবে। ঐ পত্রিকা বলেন যে, বৃটিশের বহু আপত্তি এবং ফ্রান্সের অনুযোগ সত্ত্বেও পশ্চিম জার্মানীর একচেটিয়া পুঁজি-বাদকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য আমেরিকা সর্বতোভাবে চেষ্টা করিতেছে। ক্রুপ্স্ ও থাইসেনের উত্তরাধিকারীরা এবং তাহাদের অন্যান্য সহযোগী এক সময়ে হিট্লারকে ক্ষমতা লাভে সাহায্য করিয়াছিল। এখন তাহারাই আবার পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের রক্ষক হিসাবে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছে। নাৎসীবাদ উচ্ছেদ

করিবার কথাটা পশ্চিম জার্মানীতে একেবারেই চালা পড়িয়া গিয়াছে। 'মিউনিক্ট্ লেজার' এই বলিয়া মন্তব্য শেষ করিয়াছেন, "পোড়া পুঁজি-লাভকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমেরিকা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইহার জন্য সে অতিপুরুষের দাবী ত্যাগ করিয়াছে; বিশেষজ্ঞের সমস্ত জার্মান সম্পত্তি গোপন রাখার তাহার আপত্তি নাই; জার্মানদের সম্পর্কে কুটিলের যে সাজানো আতঙ্কিকতাবিরোধী প্রচেষ্টা, তাহা হইতে সে জার্মান শ্রমিকশ্রেণিদিগকে রক্ষা করিতেছে; আমেরিকা এই বিষয়ে সুনিশ্চিত যে, পূর্ব জার্মানীর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কর্তৃক পশ্চিম অঞ্চলের পুঁজিবাদী অর্থনীতি গ্রাসিত হইবার মত কোনও সর্বে জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হইবে না।"

সোভিয়েট রুশিয়া ও তাহার প্রভাবাধীন পূর্ব ইউরোপের রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে সমরায়োজনে পশ্চিম জার্মানীকে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় পুনর্গঠন কর্মসূচীতে (European Recovery Programme) এই রাজ্যটির প্রতি সর্বাধিক মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। গত জানুয়ারী মাসে পার্লিয়ামেন্ট ইউরোপের ১৬টি রাজ্যকে সাহায্য দিবার ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁহার রিপোর্টে বলেন, "কতকগুলি রাজ্যের বরাদ্দ অনেক কমাইয়া পশ্চিম জার্মানীর বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হইয়াছে।" বস্তুতঃ পশ্চিম জার্মানীকে ৭ লক্ষ ৭০ কোটী ডলার সাহায্য করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে; ইউরোপীয় পুনর্গঠন কর্মসূচীর মোট অর্থের পরিমাণের টাকা শতকরা ১৭ ভাগ। ইহার অর্থ সাহায্যপ্রাপ্ত ১৭টি রাজ্যের (পশ্চিম জার্মানীকে লইয়া ১৭টি) মধ্যে একটিকেই মোট সাহায্যের এক-চতুর্থাংশের বেশী দেওয়া হইতেছে। মার্কিন নিয়ন্ত্রণাধীন পশ্চিম জার্মানী ও তাহার অধিবাসীদের জন্য আজ পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ পরিচালনের মত গাঁটাতে পরিণত হইতেছে। সময় সচিব কেরেথ, ব্রাডলে ঘোষণা করিয়াছেন, "পশ্চিম জার্মানীর শ্রমশিল্পের উৎপাদন-শক্তি পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করাকে আমরা ইউরোপীয় পুনর্গঠন কর্মসূচীর ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।"

এশিয়ার "পশ্চিম জার্মানী"

ইউরোপ সম্পর্কে যেমন পশ্চিম জার্মানী, তেমনি এশিয়া সম্পর্কে জাপানকে ব্যবহার করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। প্রাচ্যে এই রাজ্যটি অধিকারে সর্বাপেক্ষা উন্নত এবং এখন ইহা সম্পূর্ণরূপে মার্কিন প্রভুত্বাধীন। ইহাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "এজেন্টরূপে" ব্যবহার করিয়া সমস্ত প্রাচ্য অঞ্চলের অর্থনীতি ক্ষেত্রে মার্কিন প্রভুত্ব বিস্তারের আয়োজন চলিতেছে। অবশ্য, এই আয়োজন এখনও বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই; তাহার প্রধানের বেসামরিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পুরাদস্তর আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা হওয়া অসম্ভব। চীনের গৃহ-যুদ্ধে আমেরিকার অনুসৃত চিয়াং-কাই-শেকের অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাইতেছে; ইন্দোনেশিয়ায় এখনও সীমাংসা তো হয়ই নাই—সীমাংসার আশা ক্রমেই সুদূরবর্তী হইতেছে; মালয়ে বিদ্রোহ, বন্দরে বন্দরে অন্তর্বিরোধ, ইন্দোচীনে ফরাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ। কোনও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা কার্যকরী করার উপযোগী অবস্থা ইহা নহে। তবে, অপেক্ষাকৃত ভারতবর্ষ সম্পর্কে অতিরিক্ত প্রকাশের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই মনোভাব ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, জাপানী ভিত্তিতে অন্যদিকের উন্নতিতে সাহায্য করা তাহার উদ্দেশ্য নহে। মার্কিন প্রভুত্বাধীন জাপানের চাপে সে প্রাচ্যের অধিকাংশ সাম্রাজ্য করভূমি খুলিয়া দিতে চায়। জাপানে ট্রেড্ ডেলিগেশনের মার্কিন নেতা খোলাখুলি বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষ জাপানকে কি পরিমাণ তাঁতা মাল যোগাইতে পারে এবং জাপান কি পরিমাণ তৈরারী পণ্য ভারতকে সরবরাহ করিতে পারে, তাহার উপরই ভারত ও জাপানের মধ্যে বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে।"

আপনার প্রিয়জনের
ভবিষ্যতের ভাবনা—

ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান
লাইফ-ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ-এর
উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হোন।

প্রতিষ্ঠাতা : ৺স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী,
কে. সি. এস. আই., কে. সি. ডি., ডি.

প্রসপেক্টাস অথবা এজেন্সী সর্তাবলীর জন্য লিখুন :

ম্যানেজার :
মার্কেন্টাইল বিল্ডিংস, ৯, লালবাজার, কলিকাতা
প্রত্যেক প্রদেশের প্রধান সহরে ব্রাঞ্চ অফিস আছে।

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

টাকা রাখিবার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

অনুমোদিত মূলধন	২,০০,০০,০০০৲	টাকা
বিলাত ও বিলিকৃত মূলধন	৭৫,০০,০০০৲	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	৭৫,৭০,২৮২৲	টাকা
সংরক্ষিত তহবিল	১৮,৫০,০০০৲	
কোম্পানীর কাগজের বাজার দর		
লিখিত মূল্য অপেক্ষা	৫৫,০০,০০০৲ ৫০,৫০,০০০৲	টাকা

টাকা বেশী

এবং ও আদায়ীকৃত টাকা এবং কোম্পানীর কাগজে রক্ষিত টাকার পরিমাণ মোট আমানতী টাকার শতকরা ৮২ ভাগ এবং চাহিবামাত্র দেয় টাকার শতকরা ১৪৭ ভাগেরও অধিক।

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

শাখাসমূহ :

কলিকাতা	পশ্চিম বাংলা	বিহার
কলেজ স্কোয়ার	বহরমপুর	পাটনা
বড়বাজার	বীরভূম	গয়া
বালিকতলা	কৃষ্ণনগর	ধানবাদ
জোড়াসাঁকো	নবদ্বীপ	হাজারীবাগ
বড়বাজার	জলপাইগুড়ি	ডোমচাঁচ
বেন্টিঙ্ক	উত্তর ভারত	সিউড়ী
ভবানীপুর	বেনারস	পূর্ণিয়া
হাওড়া	দিল্লী	পূর্ব পাকিস্তান
শালকিয়া	পশ্চিম ভারত	ঢাকা
বরানগর	বোম্বাই	বাগেরহাট
		বগুড়া

লণ্ডন এজেন্টস—মিডলাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ
নিউইয়র্ক এজেন্টস্—ফার্স্ট ন্যাশনাল সিটি ব্যাঙ্ক অব নিউইয়র্ক
এবং চেজ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব দি সিটি অব নিউইয়র্ক
অষ্ট্রেলিয়ান এজেন্টস্—ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস।

শ্রী কে, সি, দাস, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

পরিবার-প্রথার ভালো ও মন্দ

আবদুল চৌধুরী

পৃথিবীর সকল দেশে সকল সমাজে রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি হ'লো পরিবার। অবশ্য যুগে যুগে কালে কালে পরিবার-প্রথার বিবর্তন ঘটেছে; কিন্তু সকল বিবর্তনের মধ্য দিয়েও পরিবার-প্রথা টিঁকে রয়েছে। সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হিসাবে পরিবার-প্রথাকে কেন্দ্রচ্যুত ক'রে আজ কোনো প্রথা বা ব্যবস্থাকে পরিবার-প্রথার স্থলাভিষিক্ত করা আজও সম্ভব হয় নি। অদূর ভবিষ্যতে যে হবে, তারও কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। এর থেকে এই সিদ্ধান্ত স্বভাবই মনে আসে যে, মানুষ তার বুদ্ধি ও কল্পনাশক্তির প্রয়োগে ক'রে এর থেকে ভালো ব্যবস্থা আজও আবিষ্কার করতে পারে নি। চেষ্টা ক'রেও পারে নি। পরিবার-প্রথার সহিত অন্যান্য সম্পর্কে সম্পর্কিত বিবাহ-প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যেই কথা, পরিবার-প্রথা সম্পর্কেও সেই কথা। একেবারে আদিম সমাজের কথা বাদ দিয়ে, সুদূর অতীতে যখন থেকে বিবাহ-অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হয়েছে তার পর বহু যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু বিবাহ-প্রথা আজও টিঁকে রয়েছে। নরনারীর অনিয়ন্ত্রিত যৌন-জীবনকে শৃঙ্খলিত ও সংযত রাখার এর চাইতে ফলপ্রদ উপায় মানুষের বুদ্ধিতে অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নি। ইতিহাসের পাতায় পাতায় সমাজ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের উপর দিয়ে কতো বিপ্লব ও উৎপ্লবের ঝড় ব'য়ে গেছে; কিন্তু সব কিছু বিপর্যয়কে অতিক্রম ক'রে বিবাহ-প্রথা টিকিয়ে আছে। হয়তো তার রীতিপদ্ধতি, আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার ক্রমতর পরিবর্তন ঘটেছে; কিন্তু মানুষের যৌন-জীবনের মূল নিয়ন্ত্রণকারীরূপে বিবাহ-অনুষ্ঠানের পরিবর্তন ঘটে নি। আগে বহু বিবাহের প্রচলন ছিলো। কালক্রমে বহু বিবাহ সঙ্কুচিত হ'য়ে এলো দ্বি-বিবাহে। একদে সামাজিক বিবেক ও জনমত উভয়ই বিবাহ-অনুষ্ঠানে বহু-চারিতার প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়ার বিরোধী। সুতরাং ক্রমশঃ এক-বিবাহ নিয়ম ও সংস্কার গত হ'য়ে উঠছে। কিন্তু বহুচারীই হোক আর একচারীই হোক সনাতন বিবাহ-অনুষ্ঠান আজও অক্ষুণ্ণ আছে। মানুষের বৈষয়িক সংস্কার নিত্য নব নবোন্মেষশালিনী প্রতিভা দিয়া নূতন কোন উদ্ভাবন দ্বারা বিবাহ-প্রথাকে স্থানচ্যুত করতে পারে নি।

পরিবার-প্রথা সম্পর্কেও ঠিক এই কথা খাটে। বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পর্কে যে কথা সত্য, পরিবার-প্রথার ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হওয়ার কারণ নেই। কেন না, যে কথা একটু আগে বলেছি, বিবাহ-অনুষ্ঠান পরিবার-প্রথারই একটা অপরিহার্য অঙ্গ। যান টানলে যেমন মাথা আসে, তেমনি পরিবার-প্রথার প্রসঙ্গে বিবাহ-প্রথার প্রসঙ্গ আপনি এসে পড়ে। কিম্বা কথাটাকে ঘুরিয়েও বলা যায়।

মানব-সভ্যতার আদিতে এক একটী tribe বা গোষ্ঠীই ছিলো এক একটী পরিবার। আজকের মানদণ্ডে তাকে অতি সুবৃহৎ পরিবার বলা যেতে পারে। অনেকগুলি পরিবার নিয়ে ছিলো এক একটী বৃহত্তর পরিবার। তাদের মাথার উপর ছিলো দল বা গোষ্ঠীপতি। গোষ্ঠীপতির ক্ষমার উপর তারও কথা বলবার উপায় ছিলো না। শিকার বা অন্যান্য প্রতিপক্ষীয় গোষ্ঠীর সহিত সাঘর্ষের ফলে দল আক্রান্ত ও সম্পত্তি গোষ্ঠীপতি দলের মধ্যে ভাগ ক'রে দিতেন; সকলে তা শিরোধার্য ক'রে নিতো। শেষোক্ত পদ্ধতিটি সাম্যবাদী ব্যবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মানুষের সমাজে সাম্যবাদী নীতির ভিত্তি সেই প্রথম স্থাপিত হয়েছিলো।

তারপর কৃষিব্যবস্থার আবিষ্কার মানুষের অগ্রগতির ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। কৃষিব্যবস্থার আবিষ্কারের ফলে আদিম সমাজের কাঠামো সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হ'য়ে গেলো; ভ্রাম্যমাণতার সংস্কার ঘুচে গিয়ে মানুষের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হ'লো স্থিতিশীলতার সংস্কার। মানুষ প্রকৃত অর্থে সমাজবদ্ধ হ'য়ে বাস করতে শিখলো। আধুনিক পরিবার-প্রথার সোত্থানপর্ব হ'লো। আগে যে গোষ্ঠীভিত্তিক বা কৌম (tribal) সমাজের কথা উল্লেখ করেছি সে ছিলো সাম্যবাদী সমাজ। আহার্যের সন্ধানে কিম্বা আবাসস্থলের মেয়াদ গোষ্ঠীগুলি নিয়ত এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়াতো। আধুনিক পরিবার-প্রথার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'লো স্থিতিশীলতা। সেই স্থিতিশীলতা ছিল কৌম সমাজ-ব্যবস্থায় সুস্পষ্ট ভাবে অনুপস্থিত। কাজেই গোষ্ঠীগুলিকে এক একটী বৃহৎ পরিবাররূপে অভিহিত করলেও তাকে পরিবার-প্রথার লক্ষণ ছিলো সামান্যই। তা' ছাড়া, গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষগুলির যৌন-জীবনেও শৃঙ্খলা বা সংযমের কোন চিহ্ন ছিল না। বলপূর্বক হরণ ও ধর্ষণ এবং নিষিদ্ধ সম্পর্কিতা নারী-উপভোগ (incest) লেগেই ছিলো। বিবাহের ও সংযমশৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত বিবাহ-অনুষ্ঠানের কোনো বালাই ছিলো না। কাজেই কৌম সমাজ-ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে পরিবার-প্রথার উন্মেষ হয়েছিলো এ কথা কোনক্রমেই বলা সঙ্গত হবে না।

যথার্থ পরিবার-প্রথার উন্মেষ হয় কৃষি-সভ্যতার আওতায়। স্থিতিবদ্ধ বিবাহ-অনুষ্ঠানেরও সুরু সেই থেকে। কৃষিব্যবস্থাকে স্বীকার ক'রে নিতে হ'লে এক জায়গায় স্থায়ী ভাবে বাস করতে হয়। এক জায়গায় স্থায়ী ভাবে বাস করতে হ'লে সমাজবদ্ধ জীব হ'য়ে বাস করতে হয়। সুতরাং এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, সমাজবদ্ধরূপে বাস করবার অপরিহার্য প্রয়োজনবোধ থেকেই

মানুষ পরিবার-প্রথা ও বিবাহ-অনুষ্ঠানকে স্বীকার ক'রে নিয়েছিলো। নইলে এ দুটি প্রতিষ্ঠানের প্রতি তার যে আন্তরিক কোন মোহ আছে এরূপ মনে করবার কোন হেতু নাই। আদিতে প্রয়োজনটাই ছিলো মুখ্য। স্বার্থের খাতিরে সংঘম আসলো ও সামাজিকতার নীতি মেনে চলার প্রশ্ন বড়ো হ'য়ে দেখা দিয়েছিলো। এখনে দীর্ঘদিনের অভ্যাসে সামাজিকতা ও যৌন-জীবনে সংযম কতকটা সংস্কারগত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তবু অভ্যাসটা সম্পূর্ণ রপ্ত হয়নি। মাঝে মাঝে পুরাতন সংস্কারটা নেহাতই বেয়াড়া ভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। বাড়ির কোনো ছেলে যখন স্ত্রী-পুত্র ফেলে হঠাৎ 'সন্ন্যাসী' হ'য়ে বেরিয়ে যায়, সে কি শুধু 'আত্মোপলব্ধির' তাগিদেই বেরিয়ে যায়? তার পেছনে কি পরিবার-প্রথাকে অস্বীকার করবার কোনো প্রেরণা সক্রিয় নেই? দীর্ঘদিনের অনাচরণের ফলে মানুষের রক্তের মধ্যে যে যাযাবরত্ব প্রসুপ্ত হ'য়ে আছে সে কি হঠাৎ সা কাড়া দিয়ে উঠে তাকে বিবাগী হ'বার প্রেরণা দেয় না? আত্মোপলব্ধির সাধনা, না পরিবার-ভাঙবার প্রয়াস? কোন্‌টা অধিক সত্য? কিম্বা, কেউ যখন বিবাহবন্ধনে ধরা না দিয়ে উন্মুক্ত জীবনযাপন করবার দিকে ঝোঁকে, সে কি শুধু সেটা কামশক্তির তাগিদেই করে? তাঁর পেছনে বিবাহ-প্রথাকে অস্বীকার করবার এতোটুকু উৎসাহ কি লুকিয়ে নেই? আজীবন কৌমার্যব্রত বিবাহ-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে একপ্রকার বিদ্রোহ নয় কি?

যাক্, যে কথা বলছিলাম, কৃষিব্যবস্থার অধীনে পরিবার-প্রথা প্রবর্তিত হলো এবং ধীরে ধীরে তার বিকাশ হ'তে লাগলো। বহু যুগ ও বহু রাষ্ট্রীয় ভাঙাগড়ার পর অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষিব্যবস্থা আজও আমাদের সমাজকে ধারণ ক'রে আছে। সুতরাং আমাদের দেশে পরিবার-প্রথার কাঠামো অতীতের মতো এখনও মোটামুটি একই রূপ আছে। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে শিল্প-বিপ্লব সংঘটিত হবার ফলে অবশ্যম্ভাবী মানুষের জীবনযাত্রাপদ্ধতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যৌথ পরিবার-প্রথার সঙ্গে ইউরোপের মানুষের মধ্যে কোন কালেই খুব গভীর যোগ ছিল না। কিন্তু সামান্য যেটুকু যা ছিল তাও শিল্প-বিপ্লবের ফলে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিলো। শিল্প-বিপ্লবের একটি সাক্ষাৎ ফল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদয় ও ব্যক্তিদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের ফলে ইউরোপের মানুষ পরিবারের আয়তন সঙ্কুচিত করলো, একটি পরিবার কতিপয় ছোট ছোট পরিবারে বিভক্ত হ'য়ে গেলো। একমাত্র রক্ত-সম্পর্কজাত স্বাভাবিক স্নেহের বন্ধন ছাড়া ভাইয়ের মধ্যে আর কোন বাধ্যবাধকতাই রইলো না—সাবালক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোট ভাতা ছাড়া আর সব ভাতা নৈতিক অধিকার ত্যাগ ক'রে জীবিকান্বেষণ ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার তাগিদে নানা জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়লো। বিবাহিত পুত্র তার স্ত্রী ও সন্তানসন্ততিদের নিয়ে পিতামাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে স্বতন্ত্র নীড় বাঁধলো; বয়স্ক পুত্র পিতামাতাই পুত্রের কাছ থেকে স'রে গিয়ে আলাদা বাড়ীতে বাস করতে আরম্ভ করলেন। ফলে ইউরোপীয় বাসনির্মাণ-পদ্ধতিতে সংঘটিত হ'লো বৈপ্লবিক পরিবর্তন —পুরাতন "villa," "cottage," "manor-house" প্রভৃতির বদলে ক্রমবর্ধিত সংখ্যায় দেখা দিলো এক বা দুই কুঠরী-বিশিষ্ট tenement, ফ্ল্যাট, ফ্লক এবং এই জাতীয় অন্য নামধেয় আবাস সব পাড়ায় পাড়ায়। সহরেই এদের আধিক্য হইলো। স্বামী-স্ত্রী এবং বড়জোর দুটি কি তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে এক একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পরিবার। আধুনিক পরিজনের সঙ্কুচিত যোগসূত্র নিতান্তই ক্ষীণ,

অথবা একেবারেই অনুপস্থিত। পল্লীর সহিত সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। সামাজিক দায়দায়িত্ব নেই, প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্যের বাধ্য নেই, বৃহত্তর জীবনের সহিত যোগ নেই —মানুষের নিজের খোলে নিজের গুটিয়ে থাকার মতো এক একটি ক্ষুদ্র পরিবার আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ এবং আত্মনির্ভর হ'য়ে রইলো। ইউরোপে ব্যক্তিকেন্দ্রিক পরিবার-প্রথার এভাবেই উদ্ভব হয়।

কিন্তু আমাদের দেশে অবস্থা এখনও এতোদূর দিয়ে পৌঁছায় নি। নগরজীবনে শিল্পায়িকরণের (industrialisation) কিছুটা আমেজ লাগলেও পল্লীজীবনের উপর পুরাতন অবস্থা ও ব্যবস্থার প্রভাবটাই অত্যধিক বলবৎ। দুনিয়ের নগরনিবদ্ধ জীব ছাড়া আমাদের অধিকাংশের মধ্যেই কৃষির সংস্কার আজও বদ্ধমূল। ফলে পুরাতন যৌথ পরিবার-প্রথায় ভাঙন দেখা দিলেও প্রথাটির নিঃশেষ অবলুপ্তি ঘটতে এখনও ঢের দিলম্ব। মাত্র একজন উপার্জনকারীর আয়ের সাহায্যে একগোটি পোষ্য প্রতিপালনের যে সংস্কার আমাদের দেশে বহু দিন থেকে গ'ড়ে উঠেছে তার নিগড় থেকে আজও এদেশীয় সমাজ মুক্তি পেলো না। অপর দিকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক পরিবার-প্রথাকেও সে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারলো না। সহর ও শিল্পাঞ্চলসমূহে ইউরোপীয় কায়দায় ফ্ল্যাট ও টেনিমেন্ট ক্রমেই অধিক সংখ্যায় নির্মিত হচ্ছে বটে; কিন্তু যৌথ অবলে দেখা যাবে তাদের প্রত্যেকটিতে ঠাসাঠাসি ও গাদাগাদি। উপার্জনের উপায়-বঞ্চিত অশক্ত বৃদ্ধ পিতা, মাতা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, ছল বিশেষে বিধবা বোন কিম্বা বিধবা পিসি (এবং তার সংসার), এমন কি ভ্রাতৃস্নেহে ভাই কিম্বা ভাইপোও পরিবারের সত্তা সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত। ইউরোপীয় ব্যক্তিভিত্তিক পরিবার যে অর্থে আত্মকেন্দ্রিক, আমাদের দেশের ফ্ল্যাট ও বস্তিনিবাসী ব্যক্তিভিত্তির পরিবার সে অর্থে আত্মকেন্দ্রিক আজও হ'য়ে উঠতে পারে নি।

আমাদের দেশের সমাজ-ব্যবস্থা ও মূলসূত্রগুলির মধ্যে ঐতিহ্যটাই এইরূপ হ'য়ে উঠার প্রতিবন্ধক।

যৌথ পরিবার-প্রথা যে একেবারেই খারাপ তা' বলছি না। যৌথ পরিবার-প্রথার ভালো-মন্দ দুইই আছে। মন্দের দিকে, যৌথ পরিবার-প্রথা বহুর আলস্য এবং একের অত্যধিক প্রমুখাপেক্ষা ও স্বেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। এতে ক'রে সমাজে পর্যাপ্ত প্রমাণ আলস্য ও নিষ্ক্রিয়তা পুষ্টাইয়া হ'য়ে ওঠে। এবং সেই সুযোগে পুরাতন লোষ্টপতিত কতকগুলি ক্ষুদে ক্ষুদে আধুনিক সংস্করণ ডিক্টেটরি জমীতে প্রতিটি পরিবারের মাথায় প্যাট হয়ে বসে। একদিকে উদ্যমের অভাব ও অপচয়; অন্যদিকে স্বেচ্ছাচারিতা। কিন্তু যৌথ পরিবার-প্রথার ভালোর দিকটাও উপেক্ষা করবার নয়। যৌথ পরিবার-প্রথার আওতায় মানুষ সামাজিক দায়িত্বকে অস্বীকার করে না। প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কেও সে সচেতন। পরিবারের চতুঃসীমার বাইরে যে বৃহত্তর সমাজ ও সংসার, তার সঙ্গে আত্মীয়তাবন্ধনকেও সে ক্ষুণ্ণ হ'তে দেয় না। যৌথ পরিবার-প্রথার আওতায় লালিতপালিত মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী এরূপ হওয়ার একটা প্রধান কারণ এই যে, যৌথ পরিবার আপনাতেই একটি সমাজ। তাকে সমাজের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা চলতে পারে। সমাজের সবগুলি লক্ষণ সীমাবদ্ধ আকারে যৌথ পরিবারের চার্চারের মধ্যে বর্তমান। একই সুবলীমার অন্তরালে অনেকে একসঙ্গে বাস করার সুফল হয় তো অবশ্যি, কিন্তু একথাও অস্বীকার করা যাবে না যে, যৌথ পরিবার-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি কখনও খুব বেশি প্রবল হ'য়ে উঠতে পারে না। যৌথ পরিবারের গড়নটাই তার প্রতিকূল। যেখানে অনেককে নিয়ে কারবার, সেখানে নিজের কোলের দিকে ঝোল-আনা ঝোল টানবার সম্ভাবনা খুবই সঙ্কীর্ণ। আর কেউ সেরূপ চেষ্টা করলে তার ইচ্ছা সফলিত হবার সম্ভাবনাও কম। একসঙ্গে অনেকের একই আচ্ছাদনীর তলায় বাস করতে হ'লে প্রত্যেককেই কিয়ৎপরিমাণে স্বার্থবুদ্ধি পরিহার ক'রে চলতে হয়; অপরের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি দৃক্‌পাত করতে হয়। নইলে প্রাত্যহিক সংসারযাত্রার ছন্দে তাল থাকে না। Compromise বা আপোষে যৌথ-জীবনের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীতে যে উদার প্রসন্নতা আনে, আত্মকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার ধারায় তা কখনই অধিগম্য হবার নয়।

ব্যক্তিভিত্তিক পরিবার-প্রথার সব চাইতে বড়ো ত্রুটি এখানেই। তা মানুষকে বড়ো বেশি স্বার্থপরায়ণ ক'রে তোলে। ব্যক্তিগত পরিবারনিবদ্ধ জীব স্বার্থের বাইরে এক পাও বাড়াতে প্রস্তুত নয়। প্রতিবেশী বাঁচলো কি মরলো তার জন্য তার কিছু যায় আসে না। আত্মীয় পরিজনদের প্রতি তার অন্তরের টান অনুপস্থিত। সবদিকের ঝোঁকা বাঁচিয়ে সকল রকম লায়িত্ব এড়িয়ে কেবলমাত্র আত্ম এবং স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সুখদুঃখের ছন্দে আবর্তিত হ'য়ে সংসারের পথ অতিক্রম করতে পারলেই হ'লো। স্বার্থই তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান ও নির্ভর। বড়ো বড়ো সহরে পরিবারের সংখ্যা অগণিত; কিন্তু সেগুলির প্রত্যেকটি যেন এক একটা জলবেষ্টিত দ্বীপ; কেউ কারও নাগাল পাচ্ছে না। এইরূপ দুই আত্মকেন্দ্রিক পরিবারের মধ্যে উদ্বৃত্ত পার্টিশনটা শুধু ইঁট কাঠেরই নয়, মনেরও। স্বার্থবুদ্ধির মসলাই তার বনিয়াদ পোক্ত করেছে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক পরিবার ব্যবস্থায় আর্থিক সমস্যা অনেক সহজ হয়ে এসেছে সন্দেহ নাই; কিন্তু এই লাভের পিঠে অকল্পনীয় পরিমাণটাও বড়ো কম দাঁড়ায় নি। নগরজীবনে স্বার্থ-ভোলা মানুষের সংখ্যা আত্যন্তিক হ'য়ে উঠছে। পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ প্রশস্ততর হচ্ছে। প্রতিযোগিপরায়ণতা বন্দীভূত হয়ে আসছে। ব্যক্তিগত পরিবার-প্রথা অন্তর দেখে কি করে এই স্বার্থবুদ্ধি পরিহার করা যায় সেইটেই হচ্ছে আজকের দিনের সমস্যা।

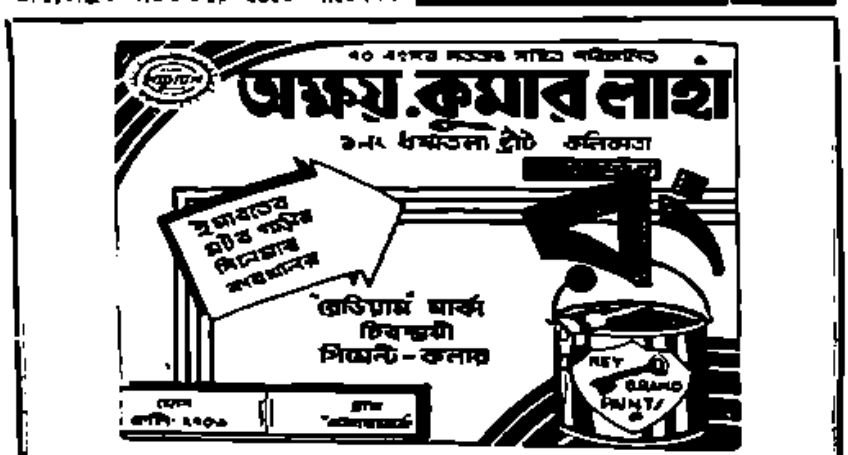

ভারতের নদ-নদী নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষাল, এম-এ

ভারতের প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে নদী অন্যতম। প্রাচীনকালে এই নদী পথেই ভারতের আন্তর্জাতীয় ব্যবসা বাণিজ্য চলিত। আধুনিক যুগে বৈজ্ঞানিক যানবাহনের প্রচলন এবং নদীর ক্রমাগত গতিপথ পরিবর্তন, ভারতের নদীগুলির মধ্যেই অবহেলার অন্যতম কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নদীগুলির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, আমাদের অর্থনৈতিক অবনতি প্রধানতঃ নদীগুলি অকর্মণ্য হইয়া যাওয়াই সম্ভব হইয়াছে। নদীগুলি সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে জমির জলসেচ বিষয়ে বিস্তর দেখা দিয়াছে। দেশের ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার সহিত খাদ্যশস্যের পরিমাণ মোটেই তাল রাখিয়া চলিতে পারিতেছে না। খাদ্যশস্যের জন্য আমরা বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে বাধ্য হইতেছি।

যুদ্ধোত্তর ভারতে আজ আমরা বহু সমস্যার সম্মুখীন। বেকার সমস্যা, আন্নবস্ত্র সমস্যা, শিল্পপ্রসার সমস্যার অন্ত নাই। ভারতের নদীগুলির সংস্কার সাধন করিতে পারিলে উপরোক্ত সমস্যাসমূহের সমাধান বহুল পরিমাণে সম্ভব হইবে। অত্যন্ত আশার কথা, দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ এদিকে সচেতন হইয়াছেন এবং উপযুক্ত পরিকল্পনাসহ নদী সংস্কারে অগ্রসর হইয়াছেন। গত ১৪ই এপ্রিল, মহানদী পরিকল্পনার প্রথম বাঁধ হীরাকুদ বাঁধের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলিয়াছেন, "The River valley schemes would be the foundation of all future developments in India. They would prevent disastrous floods and soil-erosion, they would bring large areas under cultivation and would thus increase food supply of India, they would produce hydro-electrical power and thus help in the rapid development of industry. With more power, both big-scale and cottage industries would come, as also employment of a large number of persons." উপরোক্ত বক্তৃতা হইতে বুঝা যায়, আমাদের দেশে নদী পরিকল্পনার গুরুত্ব কত বেশী এবং উহার অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা কত।

দেশ আজ স্বাধীন হইয়াছে। দেশের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেশকে সমৃদ্ধশালী করাই আজিকার দিনের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান-কল্পে আমাদের দীর্ঘ, দীর্ঘ ও পুরাতন অর্থনৈতিক কাঠামোকে আঁকড়াইয়া থাকিলে চলিবে না। সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া পরিকল্পনা রচনা করিতে হইবে। ভারতের চিরদারিদ্র্য ও বেকারসমস্যা দূর করিতে হইলে নদীগুলির সংস্কার আমাদিগকে অবশ্যই করিতে হইবে। আমেরিকার টেনেসী ভ্যালির অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া ভারতের নদী-গুলি হইতে যথেষ্ট সুফল লাভের আশা যায়।

প্রথম পর্য্যায়ের কাজ নদীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ বা survey। বারি বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়, ভূতত্ত্ব সম্বন্ধীয়, খনিজ ও কৃষি বিষয়ক—সকল প্রকার survey এই পর্য্যায়ে করিতে হয়। কী পরিমাণ বৃষ্টির জল নদীতে পতিত হয়, কি প্রকার মিলা নদীতে পাওয়া যায়, খনিজ পদার্থ বা কতটা নদীতে আছে, নদীতে বাঁধ নির্ম্মাণের উপযুক্ত স্থান কোথায় নির্দ্ধারণ করা যায়—ইত্যাদি নিরূপণ করাই এই পর্য্যায়ের প্রধান কাজ।

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কাজ পরিকল্পনা (Planning)। এই পর্য্যায়ে স্থির করিতে হয় নদীর কোন্ কোন্ স্থানে কতটী বাঁধ তৈরী করা সম্ভব, তাহাদের উচ্চতা কত এবং জলধারণ ক্ষমতাই বা তাহার কত হইবে। বস্তুতঃপক্ষে, ইহা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। পরিকল্পনার প্রথমেই স্থির করিতে হইবে কোথায়, কখন এবং কী ভাবে পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইবে। এই পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে রচিত হইলেই নদীসম্পর্কীয় বিবিধ সমস্যার সমাধান—যথা, নদীপথে যাতায়াত ব্যবস্থা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ ও শক্তি উৎপাদন, ম্যালেরিয়া ও নানাবিধ রোগের প্রতিকার সম্ভব।

তৃতীয় পর্য্যায় নক্সানির্ম্মাণ (Design)। এই পর্য্যায়ে আসিয়া পরিকল্পনাকারিগণ বাঁধ, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও যাতায়াতের সংযোগ স্থলগুলির খসড়া নক্সা অঙ্কন করেন। কি প্রকারের বাঁধ নির্ম্মাণ সম্ভব, বিদ্যুৎ উৎপাদন কতটা সাফল্যমণ্ডিত হইবে ইত্যাদি ব্যাপার নদী সম্পর্কীয় গবেষণাগারসমূহে (River Investigating Laboratories) পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। নদী পরিকল্পনায় এই অংশের কাজও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে কলিকাতা, পুনায় ও পুরীতে এইরূপ মাত্র তিনটি গবেষণাগার আছে। কিন্তু এইগুলিও গবেষণাকার্য্য চালাইবার পক্ষে যথেষ্ট নিরব-চ্ছিন্ন নহে। বাঁধ নির্ম্মাণের উপযোগী সিমেন্টের অভাবেও অনেক সময় কাজ যথেষ্ট বাধাপ্রাপ্ত হয়। দেখা গিয়াছে, নিকৃষ্ট ধরণের সিমেন্ট ব্যবহার করার ফলে উহা জলের রাসায়নিক পদার্থের সান্নিধ্যে সমগ্র বাঁধ পরিকল্পনাটীকেই ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। নদীপরিকল্পনা সার্থক করিতে হইলে তাই দেশে কতকগুলি গবেষণাগার স্থাপনও অত্যাবশ্যক। দেখা গিয়াছে, টেনেসী পরিকল্পনার কর্তৃপক্ষগণ প্রায় ২৫ বৎসরকাল পর্য্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের পরে সমস্ত নির্ভর-যোগ্য তথ্যাদি পাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সমস্ত তথ্যাদি সংগ্রহ ও পর্য্যবেক্ষণের জন্য আরও যাহা অত্যাবশ্যক তাহা হইতেছে যথেষ্ট সংখ্যক বিশেষজ্ঞ।

চতুর্থ পর্য্যায় গঠন প্রণালী (Construction)। এই পর্য্যায়ে প্রকৃত কাজ আরম্ভ করার ব্যবস্থা করিতে হয়। সত্যিকার কাজে হাত দিতে গেলে দেখা যায়, ইহা কত দুরূহ ও জটিল। সমগ্র পরিকল্পনাটি পূর্ণাঙ্গ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে হইলে প্রয়োজন সকল বিভাগের কাজের সামঞ্জস্যসাধন ও বেলওয়ে, সেচ ও বিদ্যুৎ সকল বিভাগের বিশেষজ্ঞ একদল লোক ও অতিরিক্ত ইঞ্জিনিয়ার। তদুপরি প্রধান নদী ও তাহার শাখা ও উপনদীর সমস্যাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন ধরণের। এমন কি, এক উপনদীর সমস্যাসমূহ সাধারণতঃ আরেকটি উপনদীতে দেখা যায় না। সেই জন্য প্রত্যেকটি নদীর অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্নভাবে নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেই তাহা ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা। সেই জন্যই এক

দি সিন্ধিয়া ষ্টীম

নেভিগেশন কোং লিঃ

(রেজিঃ আফিস বিভিন্ন)

৩৩, নেতাজী সুভাষ রোড

কলিকাতা

ভারতের ও ইংলণ্ডের ষ্টেটস অব আমেরিকা এবং ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের মধ্যে নিয়মিতভাবে যাতায়াত আমদানী রপ্তানীর সার্ভিস।

বোম্বাই ও ইংলণ্ডের মধ্যে নিয়মিতভাবে মাসী যাতায়াতের সার্ভিস।

ভারতবর্ষ, পাকিস্থান, ব্রহ্মদেশ এবং সিংহলের উপকূলবর্ত্তী বন্দরসমূহের মধ্যে নিয়মিতভাবে উপকূল সার্ভিস।

বোম্বাই-করিমবাড়ী-কক্স, করিমবাড়ী-কক্স-কলম্বো এবং বোম্বাই-ইংলণ্ড-লোহাদিবহ-ফিরতি মধ্যে নিয়মিতভাবে বিমান সার্ভিস।

টেলিফোন—কলিকাতা ৫৮৪০-৪১

টেলিগ্রাম—কোডাল "JALANATH"

ওভারসিজ "SAMUDRAPAR"

ও কারিগরী বিদ্যার বিশেষজ্ঞ লোকের প্রয়োজন এত বেশী।

পঞ্চম বা শেষ পর্য্যায়ে শুরু হয় জল-বিনিয়োগ বা utilisation। নদী হইতে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হইল তাহা কি ভাবে শিল্পোন্নয়নে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা যায়, যে সমস্ত কৃষিযোগ্য ভূমি পাওয়া গেল তাহাতে কি ভাবে কৃষির সুব্যবস্থা করা যায়, এবং জলপথে কি ভাবে চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা যায়, তাহার ব্যবস্থা করাই এই পর্য্যায়ের প্রধান কাজ। নদী পরিকল্পনার কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে অগ্রণী হইলে যথেষ্ট সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

নদী পরিকল্পনার আনুষঙ্গিক ও ক্রমিক পর্য্যায়গুলি আমরা মোটামুটি আলোচনা করিলাম। এখন ভারতের কয়েকটি প্রধান প্রধান নদী লইয়া আমরা আলোচনা করিব। ভারত সরকার মোট ১৭টি নদী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শেষ বিভাগের পতন হওয়ায় কয়েকটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। শেষের বিপ্লবাত্মক অবস্থার জন্য অবশ্য কতকগুলির কাজও বড় বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। আশা করা যায়, দেশের অবস্থা স্বাভাবিক হইয়া আসিলেই সবগুলি পরিকল্পনাই কার্য্যকরী করিবার জন্য প্রচেষ্টা হইবে।

প্রথমে বিহারের কোশী নদীর কথা ধরা যাউক। কোশী নদী পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইবে বিহার হিমালয়ের মধ্যের উপত্যকাগে অবস্থিত ভরসিটি খাতের সন্নিকটে ৭৫০ ফুট দীর্ঘ একটি বাঁধ নির্ম্মাণ। এই বাঁধদ্বারা প্রায় ১১,০০০,০০০ একর ফুট জায়গায় জল ধরিয়া রাখা সম্ভব হইবে এবং প্রায় ১৮ মিলিয়ন কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হইবে। নেপালে একটি ও বিহারে একটি, এই দুইটি বাঁধ নির্ম্মাণ দ্বারাও আরও লাভ হবে। জলাবদ্ধ জমির পুনরুদ্ধার, ম্যালেরিয়া নিবারণ, যাতায়াতের সুবিধা ও যথেষ্ট চাষের সুব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে।

এই নদীটি নেপালের হরসিদ্ধি খাতের নিকট হিমালয় পর্ব্বতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই বাঁধ নির্ম্মিত হইলে উহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ বাঁধ হইবে। বর্ত্তমানে আমেরিকার বোল্ডার বাঁধ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। উহার উচ্চতা প্রায় ৭২৬ ফুট। কোশী পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ হইতে প্রায় ১০ বৎসর সময় লাগিবে এবং উহার সর্ব্বমোট ব্যয় ধরা হইয়াছে প্রায় ১০০ কোটি টাকা।

কোশী নদী অদ্ভুত খেয়ালী। উনবিংশ শতাব্দী হইতে শুরু করিয়া এ পর্য্যন্ত ইহা বারম্বারই গতি পরিবর্ত্তন করিয়াছে। গত দুইশত বৎসরের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহা ক্রমাগত পূর্ব্বদিকেই অগ্রসর হইতেছে। এ যাবৎ ইহা বহু গ্রাম ও নগর ধ্বংস করিয়া দিয়াছে এবং বিহারের প্রায় ৩০০০ বর্গমাইল ও নেপালের প্রায় ৫০০ বর্গমাইল কৃষিযোগ্য জমি কৃষিকার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কোশী পরিকল্পনার অধিকাংশ যন্ত্রাদি প্রেরণই প্রায় সমাপ্তির পথে এবং দুইজন আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ার উহা অনুমোদনও করিয়াছেন।

উড়িষ্যার মহানদী পরিকল্পনাও ভারতের নদী উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে অন্যতম। একবার ডাঃ বেবনাল দাস্তা ফটক র‍্যাকেন্স কলেজে নদীর বহুমুখীন উন্নয়ন পরিকল্পনা (Multipurpose Development) সম্বন্ধে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ইহাদের নদীর অনুরূপ বিরাট অর্থ-নৈতিক সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। তিনি দেখাইয়া দেন যে, পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্ব্বে টেনেসী উপত্যকার নদীসমূহের অধিকাংশই আমাদের দেশের নদীর মত অনিয়ন্ত্রিত শক্তি ও খেয়ালী ছিল। টেনেসী উপত্যকার সহিত মহানদীর উপত্যকার তুলনা-মূলক আলোচনা করিয়া তিনি দেখাইয়া দেন যে, উপযুক্ত পরিকল্পনা দ্বারা উড়িষ্যাকেও যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসী উপত্যকার মত সমৃদ্ধি-শালী করা যায়। মহানদীর সর্ব্বমোট জল-বিধৌত অঞ্চলের পরিমাণ প্রায় ৫১,০০০ বর্গ মাইল এবং এখানকার বার্ষিক বারিপাত প্রায় ৬০ ইঞ্চি। অন্তপক্ষে টেনেসী উপত্যকার আয়তন প্রায় ৪০,০০০ বর্গমাইল এবং বার্ষিক বারিপাতের পরিমাণ প্রায় ৪৭ ইঞ্চি।

দেখা গিয়াছে, মহানদী অঞ্চলে যে পরিমাণ জল প্রবাহিত হয় তাহা হইতে প্রায় ৪৪,০০০ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতে পারে। ইহা টেনেসী অঞ্চলোৎপন্ন বিদ্যুৎ হইতে প্রায় তিনগুণ অধিক। মহানদী পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে প্রায় ৩৫০ মাইল দীর্ঘ জলপথে যাতায়াত ও মাল চলাচলের সুব্যবস্থা হইবে এবং ব্যাপক আকারে যথেষ্ট চাষ সম্ভব হইবে।

মহানদী পরিকল্পনার প্রধান নদী ও ইহার বড় বড় উপনদীগুলিতে কয়েকটী বাঁধ নির্ম্মাণের কথা আছে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ও জলসেচের ব্যবস্থার কথাও উল্লেখ আছে। প্রধান নদীতে যে তিনটী বাঁধ নির্ম্মাণ স্থির হইয়াছে, তাহাদের জন্য যথাক্রমে হীরাকুণ্ড, টিকারপাড়া ও নারাজ নামক তিনটি স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

এই পরিকল্পনাটির প্রথম দফার কার্য্য এখন আরম্ভ হইয়াছে। গত ১৪ই এপ্রিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু হীরাকুণ্ড বাঁধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে সম্বলপুর জিলার প্রায় ১৩ লক্ষ একর জমিতে সেচকার্য্যের সুবিধা হইবে। নদীর মোহনা এলাকায়ও যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাইবে, কারণ বাঁধটির পরিকল্পনা এমন-ভাবে রচিত যে, ইহা জলের অস্বাভাবিক স্ফীতি নিরোধ করিতে সক্ষম হইবে এবং বন্যার সময়ও সেরূপ বিশেষ ক্ষতি হইবে না। এখান হইতে ৩৫০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভবপর হইবে এবং সম্বলপুর জিলার আশেপাশে সিমেন্ট, ইস্পাত, কাগজ ও বস্ত্র প্রভৃতি কয়েকটী গুরুত্বপূর্ণ শিল্প এক-যোগে প্রসারলাভ করিতে পারিবে। ইহার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, বাঁধটী সম্বলপুর হইতে ৯ মাইল উজানে হীরাকুণ্ড নামক স্থানে

কাজের পরিচয়
১৯৪৭ সাল

মোট চলতি বীমা ঃ
১০,৪১,৮৮,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে
মোট সম্পত্তি ঃ
১,২৬,২৯,০০৪৲ টাকার উর্দ্ধে
বীমা তহবিল ঃ
১,১৪,৫১,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে
নূতন বীমা ঃ
৪,১৯,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে

১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত মোট দাবী শোধের পরিমাণ ২৬,৫৯,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে

গৌরবময় প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাহার কাজে

দি
মেট্রোপলিটান
ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড
হেড অফিস :
দি মেট্রোপলিটান ইন্‌সিওরেন্স হাউস, কলিকাতা।

নির্দ্দিষ্ট হইবে। ইহার উচ্চতা হইবে ১৪০ ফুট এবং দৈর্ঘ্য ৩ মাইল। বাঁধের ১ অংশে এই বিশাল নদীর বন্যার উদ্বৃত্ত জল ধরিয়া রাখিতে পারিবে। ইহা হইতে ছয়টি লেভেল খনন করা হইবে এবং তদ্দ্বারা প্রায় ১১ লক্ষ একর জমিতে জলসেচন করা যাইবে। উপরন্তু নদীর অভ্যন্তরস্থ প্রায় ১২ মাইল পর্য্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাইবে।

পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার ফলে প্রায় ১,০৫,০০০ একর জমি অর্থাৎ প্রায় ৪৫টি গ্রাম জলমগ্ন হইয়া যাওয়ার কথা। তন্মধ্যে ৭০,০০০ একর কৃষিযোগ্য ভূমি। গবর্ণমেণ্ট উৎখাত অধিবাসীদিগকে যতদূর সম্ভব জমির বিনিময়ে জমি দিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। উৎখাত বাসিন্দাদের পুনর্ব্বসতির জন্য গবর্ণমেণ্ট যে ১,২৫,৮৭৩ একর কৃষিযোগ্য অনাবাদী জমি দখল লইয়াছেন, তাহার মধ্যে ৯৮,৬০০ একর জমি কৃষিকার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে। পুনর্ব্বসতি কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে আরো প্রায় ১,২০,০০০ একর জমি প্রয়োজন। এই জমি সংগ্রহের জন্য চেষ্টা চলিতেছে। পরিকল্পনাটীর জন্য মোট ব্যয় ধরা হইয়াছে ৪৭৮১ কোটী টাকা। আশা করা যায়, কার্য্য আরম্ভ হইলে কয়েক বৎসর পর গাঙ্গেয় সমতলভূমি ও তাহা গবর্ণমেণ্টের আয় হইতে থাকিবে। পরন্তু, অধিকতর খাদ্যোৎপাদন, আধুনিক প্রণালীতে শিল্পপ্রসার (সস্তার জলে লক্ষ লক্ষ লোকের কর্ম্মসংস্থান হওয়ার সম্ভাবনা), সম্পূর্ণরূপে বন্যানিয়ন্ত্রণ, জলপথে যাতায়াতের সুব্যবস্থা ও বহুসংখ্যক গ্রামে পানীয় জল সরবরাহের আরাম গবর্ণমেণ্টের যোগসাজে যথেষ্ট লাভ হইবার আশা আছে।

এইবার আমরা পশ্চিম বঙ্গের নদী পরিকল্পনা লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিব। মানচিত্র খুলিলেই দেখা যাইবে, ভাগীরথী নদী পশ্চিম বঙ্গের মেরুদণ্ডস্বরূপ বিরাজে। মুর্শিদাবাদের নিকট গঙ্গা হইতে বহির্গত হইয়া ইহার গতিপথের দুই তীর হইতেই ইহা জল সংগ্রহ করিয়া থাকে। বিহারের দীওঘর পরগণা, ছোটনাগপুর এবং পশ্চিম বঙ্গের ব্রাহ্মণী, ঢাংকা, ময়ূরাক্ষী, কোপাই, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ প্রভৃতি কয়েকটী নদীর মাধ্যমে সমস্ত বৃষ্টির জল ভাগীরথী নদীতে আসিয়া পতিত হয়। এই নদীগুলির একটা বিশেষত্ব এই যে, গ্রীষ্মের সময় ইহারা বৃষ্টির জলে ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠে এবং তখন ইহাদের সমস্ত জল ভাগীরথী ও হুগলী নদীতে আসিয়া পড়িত হয়। সেই সময় ইহারা পার্শ্বস্থ গ্রাম, নগর, মাঠ, বাজীঘর ও সবাদি পশু সবকিছু ভাসাইয়া লইয়া যায় এবং সমস্ত প্লাবিত অঞ্চলের সমূহ সর্ব্বনাশ করিয়া ভীষণ তাণ্ডবলীলার প্রমত্ত হয়। এই তাণ্ডবলীলা সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের সমস্ত জলরাশিও নিঃশেষিত হয়। ফলে এতদঞ্চলে শীতকালীন ফসল জন্মিতে পারে না। গ্রীষ্মকালে চরম বন্যা ও শীতকালে মরু সদৃশ শুষ্কাবস্থা এই অঞ্চলের স্বাভাবিক অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আশা করি গত ১৯১৩, ১৯১৭, ১৯৩৫ ও ১৯৪৩ সনের দামোদরের ভীষণ বন্যার কথা অনেকেরই স্মৃতিপটে জাগরূক আছে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্যই দামোদর নদের পরিকল্পনা গ্রহণ অত্যাবশ্যক হইয়াছে। এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে শীতঘর পরগণা, ছোটনাগপুর ও পশ্চিম বঙ্গের মরুসম ভেরাণ্ডাই আলাদীনের প্রদীপের মত রূপান্তরিত হইয়া যাইবে।

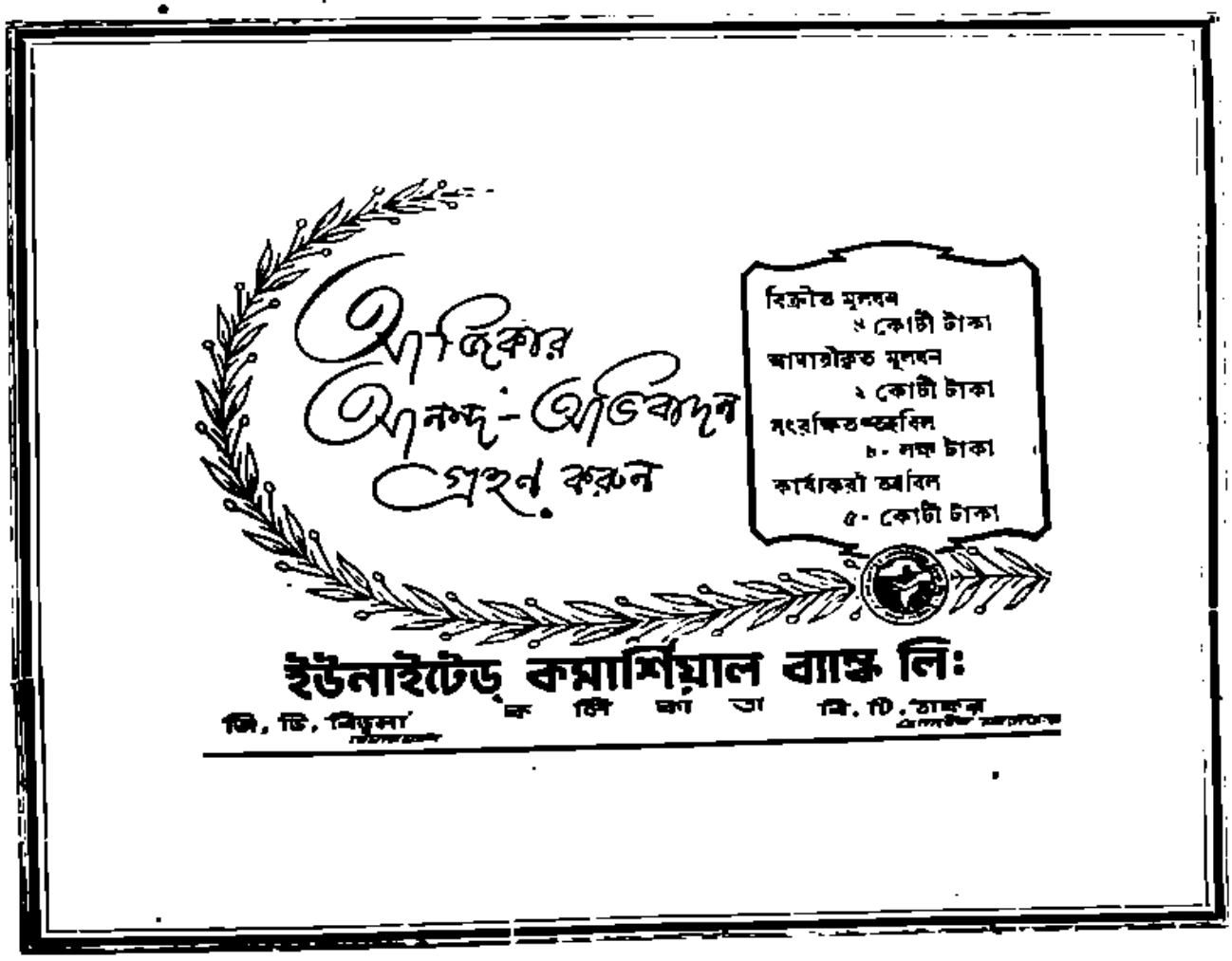

মানচিত্রে আরো দেখা যাইবে যে, খড়্গ হইতে ভাগীরথী নদী বাহির হইয়াছে, অপরদিকে জলঙ্গি ও মাথাভাঙ্গা নামে দুইটি ছোট নদীর গঙ্গা হইতে বাহির হইয়া ভাগীরথী নদীতে পতিত হইয়াছে। এই তিনটি নদীর বিলুপ্তপ্রায় হুগলী নদীর উপরেই কলিকাতা বন্দর অবস্থিত। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে ভাগীরথীর দুই পার্শ্বস্থ নদীগুলি বর্ষাকালে প্রচুর দুষিত জল বহন করে। ঐ জলের সহিত মধ্যে পরিমাণ বালি ও পলিও আসিয়া হয়। এই বালি ও পলি হুগলী নদীর মোহনায় আসিয়া লবণাক্ত স্রোতের সহিত বাধা-প্রাপ্ত হয়। নদীর জলস্রোতের বেগ লঘুত্বের দরুণ আসিয়া অপেক্ষাকৃত মন্দীভূত হয়। ফলে নদীবাহিত বালি ও পলি সেখানে জমা হইতে থাকে এবং নদীর মোহনা ক্রমশঃ ভরাইয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। ইহাছাড়াও আছে। ফলে কৃত্রিম উপায়ে নদীখাত খনন করিয়া নদীপথ উন্মুক্ত রাখা হইতেছে। নতুবা কলিকাতা বন্দরের গুরুত্ব যথেষ্ট পরিমাণে লাঘবের সম্ভাবনা আছে। কলিকাতা পোর্ট ট্রাস্টিসমূহের ডাকবজবাবার হইতে বিভিন্নপুর ও পর্যন্ত একটি নাব্য খাল খননের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও হুগলী ও ভাগীরথী নদীর রক্ষা করিতেই হইবে। সাম্প্রতিকের ভয়াবহ বন্যার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। গত ১৯৪৮ সালের সাম্প্রতিক বন্যার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য ডামোদর নিয়ন্ত্রণ বাংলা গবর্ণমেণ্ট একটি তদন্ত কমিটি (Damodar Flood Enquiry Committee) ও ভারত গবর্ণমেণ্ট একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি (Technical Committee) নিয়োগ করেন। উক্ত কমিটিদ্বয় দীর্ঘকালীন ফলাফলের কথা বিবেচনা করিয়া সুপারিশ করেন যে, ছোটনাগপুর অঞ্চলে কয়েকটী জলাধার বাঁধ (Storage Dams) নির্মাণ করিতে হইবে। কেবলমাত্র বন্যানিরোধ পরিকল্পনা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও আশানুরূপ ফলপ্রদ হইবে না বলিয়া তাঁহারা নদীর বহুমুখীন সমস্যার সমাধানমূলক পরিকল্পনা (Multi-purpose development of rivers) গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর হন।

Central Technical Power Board-এর নিকট প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর বোর্ডের সদস্য মিঃ ডোরসুইন প্রাথমিক অনুসন্ধান ও গবেষণাকার্য (survey and investigation) আরম্ভ করেন। স্থির হয়, সমগ্র পরিকল্পনাটির মধ্যে বিহারে ৮টি বাঁধ নির্মাণ করিতে হইবে। ইহার আনুষঙ্গিক ব্যয় ধরা হয় মোট ৪৫ কোটি টাকা এবং ইহা সম্পূর্ণ হইতে প্রায় ১৫ হইতে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত সময় লাগিবে। বিহারের বরাকর নদীতে তিলাড়া, বেলপাহাড়ী ও মাইথান নামক স্থানে ও দামোদর নদের কোণার নামক স্থানে ও তথা হইতে অপরদিকে বাঘো নামক স্থানে বাঁধ নির্মাণের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে পশ্চিম বঙ্গে বন্যানিরোধ সম্ভব হইবে, প্রায় ১,৮৭,০০০ একর জমিতে জলসেচের সুব্যবস্থা হইবে এবং পশ্চিম বাঙ্গলা ও বিহারে প্রায় ৩,০০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাইবে। অধিকন্তু লাভের মধ্যে তিন লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদন, নিরুপদ্রব কয়লাখাদ ট্রাস ও বন আবাদ উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় কয়লা খনি সমিতি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, জলশক্তি উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে কয়লানিয়ের যথেষ্ট সহায়তা হইবে।

বর্দ্ধমান, হুগলী, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ ও বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলা পূর্বে অত্যন্ত উর্বর ছিল। কালক্রমে জমির উপর অত্যধিক চাপ, বন পরিষ্কার ও এলোমেলোভাবে জমি ব্যবহারের ফলে এখানকার উর্বরা শক্তি ও আবাদী জমির পরিমাণও যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। সেই জন্য টেনেসী উপত্যকা পরিকল্পনার অনুরূপ দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার ভার একটি কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত হইয়াছে

সাংবাদিক ফখরুল ইসলাম-এর প্রযোজনায়

আজাদ চিত্রপট লিমিটেড-এর

প্রথম অর্ঘ্য

★ পূর্ব্বাশা ★

(আলোছায়ার পরিবর্ত্তিত রূপ)

কাহিনী ও চিত্রনাট্য :
শ্রীবিভাই ভট্টাচার্য্য

চিত্রগ্রহণ ও পরিচালনা :
শ্রীসুরেশ দাস

বিশেষ উল্লেখ
সুকল ইসলাম খান

আজাদ চিত্রপট লিমিটেড

১৩৫, পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা :: ফোন : পি কে ১৩৯১

ন্যাশনাল ডিভিডেণ্ড লিমিটেড

পি-২০, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১

বৈদেশিক বাণিজ্যের ধারক ও বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

কাঁচা ও পাকা গাঁটের পাট, চট, বস্তা, কেডিচ, তুলা, চা, তিসির তেল খইল, হরিতকী, মসলা ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানী হয় এবং শিল্পজাত পণ্যাদি আমদানী হয়। পাকিস্থানে কোং বিস্তৃত বাণিজ্য সম্পর্ক বর্ত্তমান।

কোং শেয়ারে ১০% লভ্যাংশ বিতরিত হইতেছে

(Damodar Valley Corporation)। ইহাতে একজন চেয়ারম্যান সহ মোট তিন জন সদস্য থাকিবেন। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট বিহার ও পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা করিয়া দুই জন সদস্য নিয়োগ করিবেন এবং সেক্রেটারী ও চেয়ারম্যান উভয়েই কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

এই কর্পোরেশনের কার্য্যক্রম নিম্নরূপ হইবে :— (১) কৃষিবিষয়ক, শিল্পবিষয়ক ও অন্যান্য প্রয়োজনে জলসেচ ও জল সরবরাহের জন্য পরিকল্পনা তৈরী ও তাহা কার্য্যকরী করণ (২) বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ও এতদ্বিষয়ক পরিকল্পনা তৈরী ও কার্য্যকরী করা। (৩) দামোদর নদে বন্যা নিবারণের ব্যবস্থা করা। (৪) দামোদর নদীতে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, হুগলী নদীর প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখা ও কলিকাতা বন্দরের উন্নতি সাধন করা। (৫) বন আবাদের সুব্যবস্থা, ভূমিক্ষয় নিবারণ এবং দামোদর উপত্যকার জমিসমূহের উপযুক্ত বিলিব্যবস্থা করা। (৬) দামোদর উপত্যকার কৃষিবিষয়ক, শিল্পবিষয়ক, সামাজিক, জনস্বাস্থ্যবিষয়ক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করা।

উপরোক্ত ব্যবস্থাদি কার্য্যকরী করার জন্য কর্পোরেশনের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। প্রয়োজন হইলেও যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের অন্যায় হস্তক্ষেপ তাহারা সফল করিতে পারিবেন। উৎখাত অধিবাসীদের পুনর্ব্বসতির জন্য স্থান সংগ্রহ করিতে পারিবেন, নিশ্চিত জলাধারসমূহে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মৎস্যচাষ প্রভৃতি করিতে পারিবেন।

যে ৫৫ কোটি টাকা মোট ব্যয় ধরা হইয়াছে তাহা তিন গবর্ণমেণ্টের মধ্যে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে মোট ব্যয় ধরা হইয়াছে ১৮ কোটি টাকা এবং তিন গবর্ণমেণ্টই সমান সমান হারে এই টাকাটা ব্যয় করিবেন। জলসেচের খাতে ব্যয় হইবে মোট ১৩ কোটি টাকা এবং এই টাকাটা পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট ও বিহার গবর্ণমেণ্ট তাহাদের সম্ভাব্য লাভের উপর ব্যয় করিবেন। বন্যা নিবারণ খাতে ব্যয় হইবে মোট ১৪ কোটি টাকা এবং পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট আধাআধি হারে টাকাটা দিবেন। কিন্তু কোনক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের বন্যা নিবারণ খাতে মোট অর্থের পরিমাণ ৭ কোটি টাকার বেশী হইতে পারিবে না। বন্যা নিবারণের জন্য সৌধসমূহের যাবতীয় সমস্ত ব্যয়ভার পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টকে একাকীই বহন করিতে হইবে। দামোদর পরিকল্পনার যত অংশে কার্য্য হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে তাহার মধ্যে কোনানগরে পরিচালনে ১৮০ মাইল এবং পশ্চিমবঙ্গে ১৫০ মাইল। কলিকাতা হইতে বারাসত অবধি সমস্ত পর্য্যন্ত জলপথে যাতায়াত করা যাইবে। ফলে কলিকাতা ও পরিপার্শ্বস্থ নিম্নাঞ্চলে সহজে ও সুলভে কয়লা আমদানী হইতে পারিবে; কারণ স্থলপথ অপেক্ষা জলপথেই মালপত্র আনা-নেওয়া সাশ্রয়কর।

বন্য নিবারণের ফলে যাতায়াতের যে সুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা উল্লেখ করিতে পারি কলিকাতা ও পশ্চিম বাঙ্গলার অন্যান্য অংশের মধ্যে সরাসরি জাহাজ চলাচলের এক পরিকল্পনা তাহারা গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সমবায় বোর্ডের এক বৈঠকে স্থির হইয়াছে যে, তাহাদের উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলের অতিরিক্ত জমিগুলিকে চাষযোগ্য করা ও পরবর্ত্তী শিল্প বাঙ্গলার অন্যান্য অংশের সহিত কলিকাতার সংযোগ স্থাপনের জন্য একটা খাল পরিকল্পনা স্থির করা

ছাপাখানার জন্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বপ্রকার নূতন মেসিনের জন্য
আমাদের নিকট খোঁজ করুন।

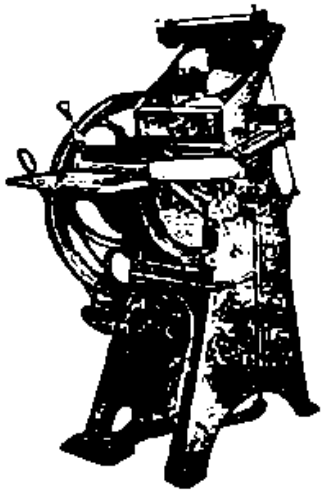

নূতন এক্সেলসিয়র জবার সাইজ ৭"×১১"

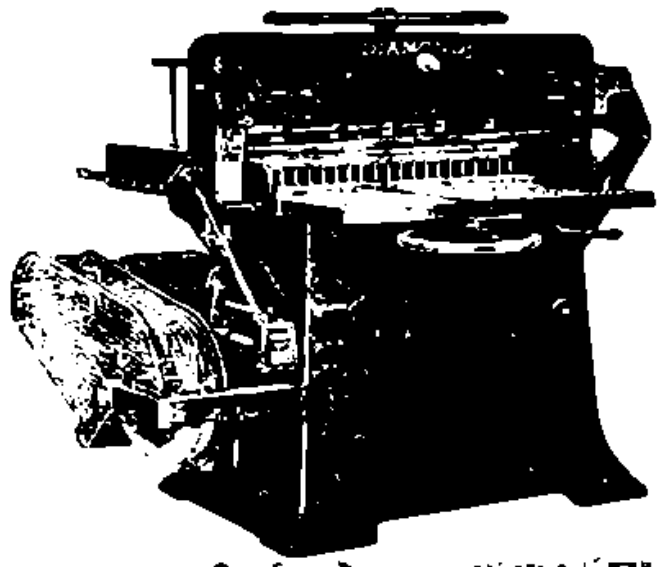

ডাবলডেমি সুপার কাটিং মেসিন সাইজ- ৩৬, ৩৪ এবং ৩০" নূতন "লী" মেসিন সাইজ ডবল ডিমাই এবং ডবল রয়াল নূতন কেণ্টেস্ আর্ল্টা, লবীয়েট, গ্রেটো মেসিনের একমাত্র সরবরাহকারী

প্রিণ্টিং এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল মেসিনারী লিঃ

উইণ্ডসর হাউস ঃ পি১৪, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হইয়াছে। এই পরিকল্পনার মূলতঃ উদ্দেশ্য হইতেছে—(১) নদীর পলিপথ নিয়ন্ত্রণ, (২) ভাগীরথী ও মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ২৪-পরগণার মজা নদীগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া উক্ত জেলার পলিত জমিগুলিকে কৃষিযোগ্য করা, (৩) কলিকাতা বন্দরের পার্শ্বে হুগলী নদীর মোহনার সমুদ্রের জল প্রবেশের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা। সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, কেন্দ্রীয় জলপথ ও সেচ বিভাগের সভাপতি ও পরিচালনায় পশ্চিমবঙ্গের পূর্তবিভাগ কর্তৃক গঙ্গার বাঁধ সম্পর্কে ইঞ্জিনিয়ারিং দিক দিয়া কাজ হইবে।

ডায়মণ্ডহারবার ও বিষ্ণুপুর খালের মধ্যে আড়াই চেনালের খাল পরিকল্পনা বোর্ড পরীক্ষা করেন। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইতেছে, হুগলী নদীর এই অংশে ৪ মাইল-ব্যাপী বিপজ্জনক ও অসুবিধাজনক জলপথ সংক্ষিপ্ত করা এবং কলিকাতার জলগুলির দূষণ সম্ভাবনা দূর করা। এই পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রাথমিক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে এবং কলিকাতা ও ডায়মণ্ডহারবারের মধ্যে জলপথের মাটি উত্তোলন করিয়া এই জলপথের উন্নতি সাধন করা যায় কি না এবং করা গেলে এই পথ দুস্তর হইবে কিনা সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নদীর কিনটি মডেল তৈরীর প্রস্তাব করা হইয়াছে এবং সে বাবদ ৯ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা ব্যয় অনুমোদন করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার ফলে উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলি সিদ্ধ হইবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। ভাগীরথীর সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন করিতে পারিলে এই খালখনন সম্পূর্ণ অনাবশ্যক হইতেও পারে। সেচ বিভাগ আমাদিগকে এই নিশ্চয়ই দিয়াছে যে, ধীরস্থিরভাবে এবং সতর্কতার সহিত কোন কাজ না করিলে পরে আমাদিগকে তাহার সমুচিত ফলভোগ করিতে হইবে।

এইবার আমরা বীরভূমের ময়ূরাক্ষী নদীর কথা আলোচনা করিব। এই নদীর পরিকল্পনাটি দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে ১২৫ ফুট উচ্চ একটি বাঁধ ও একটি জলাধার নির্মাণের কথা আছে। বিভাবের অন্তর্গত মেলেডোর নামক স্থানে এই বাঁধটি নির্মিত হইবে। দ্বিতীয় অংশেও কতকগুলি বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা আছে। এই বাঁধগুলি নির্মিত হইলে ময়ূরাক্ষী, বাকরা, কোপাই ও ব্রাহ্মণী নদীতে এবং এখান হইতে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান জেলার কয়েকাংশে অনেকগুলি খেতখাল খনন করা হইবে।

পরিকল্পনার প্রথমাংশে উল্লিখিত বাঁধটির দৈর্ঘ্য হইবে প্রায় ১১০০ ফুট এবং ভূমকার সন্নিকটে ৪১৫ বর্গমাইল স্থানে একটি জলাধার নির্মিত হইবে। এইভাবে সঞ্চিত জল ছাড়াও এখান হইতে বাৎসরিক প্রায় ৫০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাইবে। এই সুলভ বিদ্যুৎ শক্তি দ্বারা শিল্পপ্রসার, সেচকূপ খনন ও কৃষিকার্যের জন্য উন্নত সেচ ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে এবং পুরন্দরালীর জলও উহা ব্যবহার করা সম্ভব হইবে। জলাধারের সন্নিকটে বিস্তৃত আবাদী জমিতে নানাপ্রকার রবিশস্যের চাষ আবাদ করা সম্ভব হইবে। ইহাছাড়াও জলাধারটি অন্যান্য কার্যের সহায়ক হইবে, যথা—ব্যাপক আকারে ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৎস্যচাষ, বনআবাদ ও কৃষিকার্য বিষয়ক গবেষণা। সেচের জন্য যে সকল খাল খনন করার পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহাদের সর্বসমেত আনুমানিক দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০০ মাইল। এখান হইতে ৬ লক্ষ একর রবি জমিতে এবং প্রায় ১ লক্ষ একর রবিশস্যের জমিতে অনায়াসে জলসেচ করা যাইবে। অনুমান করিয়া দেখা গিয়াছে, উহার ফলে প্রায় ৩ লক্ষ টন অতিরিক্ত শস্য পাওয়া যাইবে এবং অন্যান্য ফসলের মধ্যে ইক্ষু, গম, ডাল, তোলা, আলু প্রভৃতির উৎপাদনও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। পরিকল্পনাটি কার্যকরী করিতে মোট ব্যয় হইবে প্রায় ৭ কোটি টাকা।

পরিকল্পনাটির বিস্তারিতের কাজ ইতিমধ্যে সুরু হইয়াছে। সেচখালের নক্সানিরূপণ, বাঁধের আকার ও স্থান নির্ধারণ, বিভিন্ন প্রকার বনস্পতি সংগ্রহ প্রভৃতি উক্তি-পূর্বেই হইয়া গিয়াছে। পরিকল্পনাটিতে মেলেডোতে বাঁধনির্মাণ কাজটি একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বাতিরেকে পরিকল্পনার ফলও অতি সামান্য এবং কৃষিকার্যের উন্নতি ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের আশাও খুব অল্প। বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা লইয়া এখন ভারত গবর্মেণ্ট ও বিহার গবর্মেণ্টের মধ্যে আলোচনা চলিতেছে।

পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে ১২৪০ বর্গ-মাইল ভূখণ্ডের শুকনা পাওয়ার আশা আছে এবং এখানকার জনসংখ্যা প্রায় ৮ লক্ষ। প্রায় ৫,১৫,০০০ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হইবে। উহার দ্বারা ভূমকা ও সিউড়ীতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাইবে এবং কুটীরশিল্পের উন্নতিকল্পেও উহা প্রযুক্ত হইবে। এখানে বাৎসরিক প্রায় ৪০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়ার কথা, এবং ভূমকা ও সিউড়ীর স্বাভাবিক প্রয়োজন প্রায় ৫০০ কিলোওয়াট মিটাইয়া অবশিষ্ট বিদ্যুৎ (৩৫০০ কিলোওয়াট) দিয়া অনায়াসে সাঁওতাল পরগণা ও বীরভূম জেলায় শিল্পপ্রসার সম্ভব হইবে।

ময়ূরাক্ষী-সিয়ালী নদী সম্বন্ধেও পশ্চিমবঙ্গ গবর্মেণ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন। বিভাবরী নদী শুষ্কপ্রায়, সিয়ালী নদীও মজিয়া যাইবার উপক্রম। পরিকল্পনায় ফুলতলী নামক স্থানে সিয়ালী নদীতে একটি বাঁধ নির্মাণের কথা আছে। ইহা কার্যকরী হইলে বৎসরের অধিকাংশে সময় সিয়ালী নাব্য থাকিবে। মাটলা সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ গবর্মেণ্ট ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা চিন্তা করিতেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জমি অনুর্বর, সেচ ব্যবস্থার অভাবে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাহীন। সুতরাং এই প্রদেশের চাষবাসের উন্নতিকল্পে যে কয়েকটী পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহা কার্যকরী করা প্রয়োজন সর্বাগ্রে। তাহা না হইলে এই প্রদেশের ম্যালেরিয়া নিবারণ ও চাষবাসের উন্নতি অসম্ভব। গবর্মেণ্ট মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়া নিবারণে, পুকুর খননে ও টিউবওয়েল স্থাপনে যে সাহায্য করিয়া থাকেন তাহা ভিক্ষার দানেরই সামিল। বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে চাষের অযোগ্য বিস্তীর্ণ এলাকা পড়িয়া রহিয়াছে। পূর্ববঙ্গ হইতে বহু লোক আসিয়া কাজের সন্ধানে ঘুরিতেছে। ইহাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা হইবে তাহা এখনও অনিশ্চিত। দামোদর পরিকল্পনার মত একটি কাজ আরম্ভ করিলে শত শত লোকের বেকার অবস্থা দূর করা সম্ভব হইতে পারে। শত শত কৃষক উৎপাদনের নবোৎসাহে সঞ্জীবিত হইতে পারে।

পেষ্ট বোর্ড
এবং
রঙ্গীন বোর্ড পাইবার
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
★
এশিয়াটিক
পেপার এণ্ড বোর্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজ
৮—১, হেংকিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
টেলিফোন : ক্যাল: ২১৯

শিল্প ও বিজ্ঞান

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এস-সি

আধুনিক যুগে শিল্প ও বিজ্ঞান অঙ্গাঙ্গি বন্ধনে আবদ্ধ। বিজ্ঞানের সাহায্যে বাণীজ্য একদিকে যেমন নিত্যনূতন উন্নতি ও পরিপুষ্টি অর্জন করে, অপরদিকে তেমনি শিল্পোন্নয়নে নিয়োজিত না হলে বৈজ্ঞানিক গবেষণাও অসার। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানের কল্যাণে আজ এমন অনেকগুলি মূতন শিল্পের উদ্ভাবন হয়েছে, এমন অনেকপ্রকার নূতনতর ব্যবহার-বিধি প্রচলিত হয়েছে, যার ফলে দেশের অর্থনৈতিক সংগঠন যথেষ্টভাবে প্রভাবিত হতে পারে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা চলে, কাঠ এখন আর জ্বালানি মাত্র নয়—এর বিভিন্ন বিচিত্র ব্যবহার-প্রণালী ও দূর-প্রসারী সম্ভাবনা আমাদের বিস্ময় উদ্রিক্ত করে; আবার যখন জানতে পারি শিল্প ও সমবায় সচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে শুনি, অল্পদিনের মধ্যেই জার্মানী ও আমেরিকা থেকে অনেকজন বিশেষজ্ঞ এসে পড়বেন কয়লা থেকে তেল উৎপাদন করবার জন্যে, তখনও বিস্ময়ের সীমা থাকে না। আজকের এই প্রবন্ধে আমরা তাই আলোচনা করব, কিভাবে বিজ্ঞানের কল্যাণে অতি সাধারণ বস্তুর অতি অসাধারণ ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে এবং কিভাবে এক নগণ্য সামগ্রীর অতি প্রয়োজনীয় মূল্যবান পদার্থে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে।

গ্যাস থেকে গ্যাসোলিন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যুদ্ধরত দেশগুলিতে পেট্রোলিয়ামের চাহিদা ছিল প্রচুর। ফলে আমেরিকা যখন অত্যাবশ্যকালের মধ্যে পেট্রোলিয়াম নিঃশেষিত হওয়ার আশঙ্কা করছিল সেই সময়ে ৪৫ বৎসর বয়স্ক ডি, ডি, কীথ গ্যাস থেকে মোটরের তেল তৈরী করে আমেরিকার উক্ত আশঙ্কার অপনোদন করেন। যুদ্ধের আগে কীথ অনেকদিন জার্মানীতে ছিলেন এবং তার ফলে তিনি সেখানকার অনেকগুলি তেলের কারখানা পরিদর্শন করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। জার্মানীতে প্রথমে কয়লা থেকে কয়লা-গ্যাস এবং পরে সেই কয়লা-গ্যাস থেকে গ্যাসোলিন তৈরী করা হয় এবং সেই গ্যাসোলিনের সাহায্যে মোটর, ট্যাঙ্ক প্রভৃতি সামরিক যানগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হত। কিন্তু কীথ দেখলেন, আমেরিকায় ঐভাবে যে গ্যাসোলিন উৎপাদিত হয় তাতে খরচ অনেক বেশী পড়ে যায় অথচ উদ্বৃত্তের তেল না হওয়ায় সামরিক যানেও তা ব্যবহার করা চলে না।

কীথ নিজে একজন প্রসিদ্ধ রসায়নবিদ্। তিনি বাবোজন নামকরা রাসায়নিক নিয়ে একটি নিজস্ব হাইড্রোকার্বন গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করলেন।

আগুনে চার রকম গ্যাস আছে—মিথেন, ইথেন, প্রোপেন ও বুটেন। এদের মধ্যে মিথেনই সবচেয়ে হাল্কা আর সাধারণ—প্রাকৃতিক গ্যাসের মধ্যে সাতানব্বই ৯০ ভাগই মিথেন। কীথের গবেষণাগারে দেখা গেল, মিথেন গ্যাসে যদি বিশুদ্ধ অক্সিজেন প্রযুক্ত হয় তাহলে তা ক্রমশ ফরমেল্ডিহাইড ও হাইড্রোজেনে রূপান্তরিত হয়—আর এই ফরমেল্ডিহাইড ও হাইড্রোজেনই হল গ্যাসোলিনের অঙ্গ—এদুটোর থেকে গ্যাসোলিন ও জল উৎপাদিত হয়ে থাকে। কিন্তু অক্সিজেনের দাম যে খুব বেশী—হাজার ঘন ফুটের দাম তিন ডলার। আরো সস্তায় অক্সিজেন না পেলে গ্যাসোলিনে খরচটুকু পুষাবে কি?

এছাড়া আরো একটি মস্ত অসুবিধা আছে কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রোজেন থেকে গ্যাসোলিন ও জল প্রস্তুতের সময় যে প্রচণ্ড তাপ উৎপাদিত হয় তা থেকে অব্যাহতি পেতে হবে।

কীথ চারিদিকে জলের নল দিয়ে মৌচাকের মত এক 'প্রতিক্রিয়া প্রকোষ্ঠ' (reaction-chamber) নির্মাণ করলেন। চারিপাশের জলে সেই তাপ পরিশোষিত হয়ে যে বাষ্প-শক্তির সঞ্চার হবে তা থেকে যেন জল চলতে লাগল, তেমি সঙ্গে সঙ্গে বাতাস থেকে অক্সিজেনও বল-বন্দী হতে লাগল। এইভাবে হাজার ঘনফুট বিশুদ্ধ অক্সিজেনের উৎপাদন-মূল্য পড়ল মাত্র পাঁচ সেন্ট। কীথের গবেষণাগার থেকে তখন দৈনিক ১০ গ্যালন গ্যাসোলিন বেরিয়ে আসতে লাগল।

পূর্বে গ্যাসোলিন উৎপাদনের পর অবশিষ্ট প্রাকৃতিক গ্যাসকে বাতাসে মুক্ত করে দেওয়া হত। কিন্তু বর্তমানে সেই গ্যাসের সঙ্গে বাতাস মিশিয়ে এবং সেই গ্যাস-বাতাসকে তাপ ও চাপের প্রভাবাধীন রেখে ফরমেল্ডিহাইড, মিথাইলঅ্যালকোহল, এ্যাসিটোন প্রভৃতি উৎপাদন করা হয়। বেকেলাইট জাতীয় প্লাষ্টিক প্রস্তুতে ফরমেল্ডিহাইডের প্রয়োজন হয়, আবার জ্বালোক-চিত্র পরিস্ফুটনে এ্যাসিটোন ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কয়লা থেকে গ্যাসোলিন

আমাদের শিল্প-সচিব ডেলিগেশনের সঙ্গে লাভ টন বিভিন্ন জাতের কয়লা থেকে এক টন এই তেল উৎপাদনের কথা বলেছেন। তাছাড়াও তৈলখনির প্রাচুর্য না থাকায় সব সময়েই বিদেশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। আশা করা যায় এই তেল সম্বন্ধে আমরা অনতিবিলম্বে স্বাবলম্বী হতে পারব। আমেরিকায় কয়লা থেকে এক গ্যালন গ্যাসোলিনের উৎপাদন-মূল্য পড়ে এক সেন্ট এবং অন্যদিনের

পুরস্কার প্রতিযোগিতা

নগদ ৫০০০৲ টাকা লাভ করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ

ব্রিটানিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃএর প্রস্তুত মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী মহামূল্যবান ব্রিটামিন্স হেয়ার অয়েলের ক্রেতাগণের মধ্যে উক্ত পুরস্কার বিতরিত হইবে।

আপনি ইহা দ্বারা দ্বিগুণ লাভ করিবেন

প্রথমতঃ ১ ডাইন প্রথম শ্রেণীর কেশ তৈল পাইবেন। অধিকন্তু আশাতীতভাবে প্রতিযোগিতার উপরোক্ত পুরস্কার লাভ করিতে পারেন।

নিয়মাবলী :—

প্রত্যেক ক্রেতাকে ১লা আষাঢ়ের মধ্যে ৩০শে আষাঢ়ের মধ্যে ব্রিটানিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কসের কেশতৈল অথবা হেয়ার অয়েলের মূল্য বাবদ ৷৷৷০ টাকা ডাক টিকিট সহ লিখিত আবেদন করিতে হইবে। মফঃস্বলের ক্রেতাগণকে তৈলের মূল্য ৷৷৷০ টাকা ও ডাক খরচ ৷৷০ আনা মোট ৷৷৷৷০ আনা মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইতে হইবে। কেহই ২ আউন্সের বেশী ক্রয় করিতে পারিবেন না। কোম্পানীর কর্মিগণ ব্যতীত কেহ এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন না। প্রত্যেক বিষয়েই কোম্পানীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া মানিতে হইবে।

কলিকাতা আফিস ব্যতীত ১ হইতে ১০০এর মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা বিভিন্ন জায়গায় চিহ্নিত করা আছে। ক্রেতাগণকে ১ হইতে ১০০এর মধ্যে যে কোন একটি সংখ্যা মনোনীত করিয়া অর্ডারের সহিত প্রেরণ করিতে হইবে। আমরা যে জায়গার মনোনীত সংখ্যা চিহ্নিত আছে সেখানে বিজ্ঞাপিত করিব, তিনি বা তাঁহারাই পুরস্কারের অধিকারী হইবেন। ১৫ই শ্রাবণের পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম ঘোষিত হইবে এবং ঐ তারিখ হইতে মফঃস্বল ক্রেতাগণের নিকট ফলাফল ও তৈল প্রেরিত হইবে। কলিকাতাস্থিত ক্রেতাগণকে ঘোষণাটি অফিসে বসিয়া দিয়া তৈল ও পুরস্কারের টাকা গ্রহণ করিতে হইবে।

পুরস্কারের ফলাফল দৈনিক সংবাদপত্রে ঘোষিত হইবে।

ব্রিটানিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ

স্থাপিত ১৯০৯ ইং

১নং বটলার এরডেল্ড লেন (চাদপাল), কলিকাতা।

যাতেই তা যাতে আরো বেশি যায় সে সম্বন্ধে গবেষণা চলছে।

ছুচিশিল্পে এ্যালুমিনিয়ম

এ্যালুমিনিয়মের ব্যবহার হলেন ব্রিটেনের ফ্রিডা ভাসুকেল রেলফস্, যিনি যুদ্ধকালীন আমেরিকায় চার ছেলের লালপোষিকার জন্যদের প্রবর্তন করেছেন। ফ্রান্সের পতনের সঙ্গে সঙ্গে নিত্যপণ্য যখন এ্যালুমিনিয়মের জলগুলি চক্রান্তমিত হয়ে যাওয়ার চোখে অন্ধকার দেখলেন, তখন রেলফস্ এগিয়ে এলেন কৃত্রিম উপায়ে এ্যালুমিনিয়মের উৎপাদন বর্ধিত করতে। তত লোকে তখন অবজ্ঞায় হাসি হেসেছিল। আজ রেলফসের চল্লিশটি কারখানায় তিন হাজার লোক কাজ করছে, আর তাঁর সেই সম্পত্তির মূল্য এক কোটি ডলার।

রেলফস্ আশা করেন অদূর ভবিষ্যতে তাঁর এ্যালুমিনিয়ম-শিল্প পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে স্থান করে নেবে। বর্তমানে এক পাউণ্ড এ্যালুমিনিয়ম থেকে যে ১৩০০ গজ সুতা প্রস্তুত হয় তা থেকে ঠিক মাপের বস্ত্র কোট, ব্যাগের আস্তর, স্যুটের লোয়াক প্রভৃতি তৈরী হচ্ছে, আর তার ব্যবহৃত পড়ছে অসম্ভব রকম কম।

কাচের নূতনতর ব্যবহার

আমেরিকার পিটসবার্গ কর্নিং গবেষণাগারে সম্প্রতি এক নূতন ধরণের কাচ তৈরী করেছেন যা ঠিক লোকের মতই ভাসে ও জলে ভাসতে পারে। লাইফবোট, লাইফবেল্ট ও খেলা পাত্রের তরী হিসাবে এই কাচ আধুনিক যুদ্ধে খুবই কার্যকরী প্রতিপন্ন হচ্ছে। ঘন-সন্নিবিষ্ট বায়ুবুদ্ধ অন্যান্য ফেনের মধ্যেকে যেমন সাবানের ফেনা তৈরী হয়, এই কাচও ঠিক অনুরূপভাবেই নির্দিষ্ট হয়ে থাকে বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে foam-glass বা বুদ্বুদে কাচ। ফেনময় (cellular) আকৃতি হওয়ায় একটা সুবিধা এই যে, এর কোন অংশ যদি চূর্ণেই দ্বারা বিশীর্ণ হয় অথবা একেবারে বিদারিতও হয়ে যায়, তাহলেও সেটা অনায়াসেই ভেসে থাকতে পারবে। যেখানে জলের বেল্ট-এ একটিমাত্র ছিদ্র হলেই মারাত্মক, সেখানে এই ফেনময় কাচের বেল্ট-এ কয়েকটি ছিদ্র হলেও ক্ষতি নেই; কারণ এর এলাকেশে জল প্রবেশ করতে সক্ষম হলেও অবনিষ্টাংশে বায়ুবুদ্ধ থাকায় ভাসার অসুবিধা হয় না। এই কাচের আর একটা সুবিধা এই যে, সাধারণ করাত দিয়েই তা ইচ্ছামত আকারে কেটে নেওয়া যেতে পারে। প্রতিপত্ত বুদ্বুদে কাচ যে রকম আকারে বিক্রীত হয়ে থাকে তা হল ১৮ ইঞ্চি লম্বা, ১২ ইঞ্চি চওড়া ও ২ থেকে ৩ ইঞ্চি পুরু। সাধারণ কাচের সঙ্গে খানিকটা বিশুদ্ধ কার্বন-সংমিশ্রিত করে নিলেই এই বিশেষ ধরণের কাচ তৈরী হয়। উত্তাপের সংস্পর্শে কাচ তরীভূত হয়, আর কার্বন গ্যাসে রূপান্তরিত হয়। পাইকটি প্রস্তুতকালে কার্বন ডায়োক্সাইড গ্যাস যে ধরণের ক্রিয়া সম্পাদন করে, ঠিক অনুরূপ প্রণালীতেই কাচের উপরে কার্বন গ্যাস তার কাজ করে চলে। কাচ ও কার্বনের পরিমাণ ও তাপের মাত্রা যথোচিত নিয়ন্ত্রিত হলে এই বিশেষ ধরণের কাচ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করা যেতে পারে। এই কাচ এত হাল্কা যে, প্রত্যেক ঘন ফুটের ওজন হল মাত্র ১০ পাউণ্ড।

কাচকে আজ এমন নমনীয় করা হয়েছে যে, কাচের পর্দা অভিবিস্ফোরক বোমার আঘাতে বিশীর্ণ হলেও বিচূর্ণ হয়ে যায় না। সূর্যের পথ নির্দেশ প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করে অনেক কিছুরই আজ এই কাচ-গ্রাফিক ব্যবহৃত হচ্ছে।

কাচের পলস—ঘণ্টাটা অদ্ভুত শোনাবে—তবু তা এয়োজনে এবং চেয়ারের কুশন হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে ট্রাকে, বাসে এবং ট্রেণেও আমরা এই কাচের গদি দেখতে পাব।

সিবি-অডিয়েন্স-কোর্ড নির্দিষ্ট এই কাচ যেমন প্রচণ্ড উত্তাপ সহনক্ষম তেমি শুষ্ক ঠিণ্ডার শৈত্যেও অনায়াসে সইতে পারে—ফেটে যায় না। ব্যবসায়ের দিক থেকে এই গুণের মূল্য বড় কম নয়।

নিলনশিল্প

বরফের মূল, প্রস্তর-মূল প্রভৃতি নানা মূলের কথা আমরা জানি। সংস্কৃতির বলে অনুযায়ী এই সব মূলের নামকরণ হয়ে থাকে। এবারে যে মূল আসছে তার নাম হল নিলন-মূল।

কয়লা, জল ও বাতাস থেকে এই নিলন তৈরী হয়ে থাকে। নিলনের আঁশ দিয়ে যে ধুতি প্রস্তুত হয়, তা এত মজবুত যে, অনায়াসে লৈন্সবোঝাই ট্রাকটরকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। রেশমের ন্যায় মসৃণ এবং মখমলের ন্যায় নরম এই নিলনের কাপড় তাবী আরামদায়ক ও সৌখীন। তুলা বা পশমজাত দ্রব্যের মত সংবেদনশীল নয় বলে তৈরীর সময় আঁশগুলি এমন ঘনভাবে সন্নিবিষ্ট করা হয়ে যে, তা থেকে ছাতা, জুতা, লোয়েটার ও বর্ষাতি নির্মাণ করা যেতে পারে। নিলন-দ্রব্য পোকায় খাওয়া বিশেষ আক্রান্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না।

সাবান থেকে বর্ষাতি

বর্ষাতি বা ওয়াটারপ্রুফ তৈরী করতে গিয়ে আমেরিকায় আজকাল সাবানের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। ডিমের শ্বেত জলীয় অংশে এ্যালবুমেন ধরণের প্রোটিন, সাবান-জল আর সেই সঙ্গে একটুখানি এ্যাসেটিক এ্যাসিড—মাত্র এই তিনটি পদার্থ দিয়ে সাধারণ সুতির কাপড়কেও চমৎকার বর্ষাতি কাপড়রূপে তৈরী করে নিতে পারা যায়। প্রথমে কাপড়টিকে প্রোটিন জলে খানিকটা ডুবিয়ে রাখতে হয়। যখন শতকরা ৮০ ভাগ প্রোটিন অর্থাৎ প্রোটিন-জলের ওজনের চতুর্থ-পঞ্চমাংশ সেই কাপড়টি শুষে নেয় তখন প্রোটিন-জল থেকে তুলে নিয়ে বাষ্পের উত্তাপে তা শুকিয়ে নিতে হয়। তারপর খানিকটা এ্যাসেটিক এ্যাসিড সমেত সাবান-জলে কাপড়টি ডুবিয়ে নিলেই চমৎকার ওয়াটার প্রুফ তৈরী হয়ে যায়। এখন তা ধোপার বাড়ী কাচতে পাঠালেও আর নষ্ট হবার ভয় নেই।

মানুষের খাদ্যরূপে ঘাস

গবাদি পশুর ন্যায় মানুষও ঘাসকে খাদ্য-রূপে গ্রহণ করতে পারে কিনা সে সম্বন্ধে বহুদিন ধরে নানা পরীক্ষা চলে এসেছে। দেখা গেছে, ঘাসের অধিকাংশ তৃণভোজী নয় তবু অসুস্থ হলে মানুষ মাঠ থেকে প্রয়োজনীয় ঘাস বেছে নিয়ে ভক্ষণ করে থাকে। ঘাস থেকে খুব সহজে সাধারণ গ্রহণ করতে পারে—মানুষ পারবে না? কিন্তু তাজা সবুজ ঘাস মানুষ পলাধঃকরণ করতে পারে নি—অন্তরায় হয়েছে তার শক্ত আর আঁশ, আর তা পরিপাক করবার মত শক্তিশালী ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণু নেই মানুষের অন্ত্রে। অথচ ঘাসে মানুষের গ্রহণোপযোগী উপাদান রয়েছে প্রচুর। পিটসবার্গে যেমন ইনস্টিটিউটের হিনজ পরিপুষ্টি গবেষণা বিভাগ (Heinz Nutritional Research Division) দেখিয়েছেন যে, ঘাসে ক্যারোটিন, এ্যাস্কর্বিক এ্যাসিড,

আমরা সকল প্রকার লাইন, হাফটোন, ডুপ্লেক্স্, ট্রিপিও প্রভৃতি ব্লক ও সর্বপ্রকার রঙি ছাপার কাজ করিয়া থাকি
—পরীক্ষা প্রার্থনীয়—
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোম্পানী
ব্লক মেকার্স, ডিজাইনার্স এণ্ড আর্ট প্রিণ্টার্স
১৭নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন: বড়বাজার ২৬০৮

লোহা থেকে আরম্ভ করে থিয়ামিন, রিবো-ফ্লেবিন, নিয়াসিন, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি নানা প্রকার ভিটামিন ও অন্যান্যবশ্যক খাদ্য-সার অনেক কিছুই রয়েছে। আলুকে যদি জলীয় অংশ বিমুক্ত করে শুকিয়ে নেওয়া হয় (dehydrated), তাহলে তা মানুষের পক্ষে সহজতর ও সহজপাচ্য হতে পারে। এভাবে শুকিয়ে নিলেও আলুর ভিটামিনগুলি বিনষ্ট হয় না। ইক্ত গবেষণা বিভাগের মতে আলু সিদ্ধ করে চূর্ণ করে নিতে হবে : পরে ৪ থেকে ৬ আউন্স আলু-চূর্ণ রুটীর সঙ্গে মিশিয়ে খেতে হবে। অবশ্য রুটি না বিস্কিটরূপে তৈরী করেও তা ব্যবহার করা চলে। আলু মানুষের পক্ষে খাদ্যটা জোলাপের কাজ করে। তাই অল্পে অল্পে ক্রমে ক্রমে পরিপাক প্রণালীকে আলু হজমে অভ্যস্ত করে নিতে হয়।

কাঠের নূতনতর ব্যবহার

কাঠ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী। আলানী থেকে আরম্ভ করে ঘরের দরজা জানলা আসবাবপত্র প্রভৃতি সবেতেই তার স্থান ও মূল্য গ্রহণ অপরিহার্য। কাঠের এতগুণ থাকা সত্ত্বেও সহজলভ্য বলেই আমরা তার আদর করি না, এবং অধিকন্তু একই প্রকার ব্যবহারের ফলে কাঠের সম্বন্ধে কোন উৎসুক্যই আমাদের মনে জাগে না।

কিন্তু মানুষের চেষ্টায় কী না হতে পেরেছে, কেন আর লোহা লাটির যুগ থেকে নিরোধিত হয়ে যাবে?

গত কয়েক বছর ধরে এ নিয়ে বিজ্ঞানি-মহলে যুক্তিতর্ক চালিয়ে চলেছে। পরমাণবিক শক্তি সম্বন্ধে আমরা যা আশা করছি তাই সফল হয় তাহলে এ দুর্ভাবনার আংশিক লাঘব হতে পারে বটে, কিন্তু পুরোপুরি নয়। লোহা স্বভাবতঃক্ষুরিত হয় না, আবার কয়লা তৈরী হতেও লক্ষ লক্ষ বছর সময় লাগে—কাল কয়লা তো সিলীভূত (Fossilised) কাঠেরই রূপান্তর। মৃত্তিকাস্তরের অন্তরালে নিহিত সঞ্চিত সম্পদ ক্রত নিঃশেষিত হয়ে আসছে। আমাদের এখন প্রয়োজন হল নূতন কাঁচা মালের (raw materials); তা আর আমাদের খুব শীঘ্রই পেতে হবে।

কাঁচা মালের মধ্যে এখন রয়েছে শুধু কাঠ, যা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করতে পারে। কাঁচা মালের মধ্যে কাঠই হল সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন—মানুষের আবহমান কাল থেকেই কাঠ হয়েছে এবং কাঠের ব্যবহারও চলে আসছে। তাই কাঁচা মাল হিসাবেও কাঠকে নূতন করে ভাবা আমাদের মনে আসে না।

কিন্তু সত্য বিশ্বস্থ মানুষের কার্য্যক্রম ও চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন সংঘটিত করেছে। যুদ্ধের অভাবী চাপে যখন ধাতব দ্রব্য এবং জমিতের ঘাটতি পড়েছে তখন মানুষের দৃষ্টি আবার হয়েছে কাঠের প্রতি—কাঠকে আবার নূতন করে আবিষ্কার করেছে নূতন উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্যে। যেখানে ইস্পাত অথবা এলুমিনিয়মের প্রয়োজন, সেখানে কাঠ দিয়ে তা চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধের বাজারের কারখানাগুলি যখন সাধারণের উৎপাদনের জন্য পুরোদমে চলছিল, তখন কাঠের শিল্প অগ্রসর হচ্ছিল মন্থর গতিতে। ঠিক এই সময়ে যারা কাঠের কাজ নিয়ে পিছনে পড়ে ছিল তারা পুরাতন কাঁচামালকে নূতনতরভাবে ব্যবহারের জন্যে অভিনব প্রয়োগের সাধনায় ব্রতী হয়েছিল। ফলে অনতিবিলম্বে যুদ্ধেরই বিখ্যাত কাঠ নির্ম্মিত মেটর টর্পেডো-বোট উদ্ভাবিত হল যা ব্রিটিশদের ম্যাগনেটিক মাইনকে উপেক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল। ঠিক অনুরূপ ভাবেই সৃষ্টি হল ক্রত পরিবেগসম্পন্ন কাঠনির্ম্মিত বিভিন্ন সমর-পোষাক-বিমান।

যুদ্ধের সময়ে শিল্প বিজ্ঞানের গবেষণাগুলিকে কেমন করে পুরাতন জিনিষকে তাড়াতাড়ি

জাতির শিল্প, সম্পদ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূল

আভ্যন্তর ও বাহ্যিক

কাগজ

ভোলানাথ পেপার হাউস লিমিটেড

২৯, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : বড়বাজার ৪২৬৯ :: টেলি : বিদ্যাসেবা

সর্ব্বপ্রকার দেশী ও বিদেশী কাগজ, বোর্ড, পোষ্টকার্ড, খাম, ছাপার কালী প্রভৃতির বৃহত্তম ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও সুদৃঢ় সাধুতার সহিত তৎপরভাবে আপনার সেবায় নিয়োজিত

ব্রাঞ্চ :
৬৪, হ্যারিসন রোড ফোন : বড়বাজার ২৮
১৬৭, ওল্ড চিনাবাজার ষ্ট্রীট
১৩৪ ও ১৩৫ ,, ,, ,,

মফঃস্বল ব্রাঞ্চ
পটুয়াটুলি, ঢাকা

মূলের জল দিয়ে নূতন ভাবে চাষ করতে পারা যায় তারই গবেষণায় সমাহিত ছিলেন। গত শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিকগণ যেখানে যবনিকা টেনে দিয়েছিলেন সেখান থেকেই এঁরা আবার কাজ সুরু করে দিলেন।

সংশ্লেষণী রজন তৈরী করতে গিয়ে তাঁরা এক নূতন ধরণের প্লাইউড বা স্তরবিন্যস্ত কাঠের উদ্ভাবন করলেন। কাঠের সূক্ষ্ম পাতলা পাতগুলি (sheets) তাপ এবং বিরাট চাপের সাহায্যে এমন ভাবে অক্সিডীকৃত ও রজযুক্ত করে তোলা হয় যাতে জলে ভিজে অথবা আগুনে পুড়ে তা পুনরায় স্ফীত, বিচ্ছিন্ন ও স্তরবিচ্যুত হতে পারে না। এইভাবে বিচ্ছিন্ন পাতলা পাতগুলি স্তরে স্তরে সজ্জিত করে একত্রীভূত (fused) করে নিতে হয়। অবশ্য এইভাবে জুড়ে নেবার কৌশলও অভিনব। এই জোড়া কাঠের পাতে যে বিচিত্র পদার্থ উৎপন্ন হয় তা এলুমিনিয়ম অপেক্ষা অনেক হাল্কা ও ইস্পাত অপেক্ষা অনেক শক্ত। এইভাবে স্তর-বিন্যস্ত কাঠ তৈরী করতে কুশলী শিল্প বা দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয় না, সময়ও লাগে অনেক কম এবং উৎপাদনের খরচও হয় যথেষ্ট সাশ্রয়ী। অথচ জিনিষ হিসাবে তা বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ।

যুদ্ধকালে কাঠ শুধু কাঠের পর্য্যায়ে নিবদ্ধ ছিল না। সেলিউলোজ (cellulose) এবং লিগ্‌নিন (Lignine) নামক যে দুটী উপাদানে কাঠ তৈরী হয়েছে বিজ্ঞানিকগণ বহুদিন ধরেই গবেষণা করছিলেন। ফলে কাঠ থেকে অবলেশে প্লাষ্টিকের উদ্ভব হল।

আজ কাঠের কোন জাতই অপ্রয়োজনীয়তের পরিয়াক নয়। এতদিন যাদের আবর্জনা বলে আমরা হিসাবে ব্যবহার করেছি, আজ কাঠের সেই আবর্জনাই প্লাষ্টিকশিল্পের অপরিহার্য্য উপাদান রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। আলু-খড় থেকে রিয়নের বিন, শেওড়া থেকে ইঁট, আলুর বস্তা থেকে কাচের বাসন প্রভৃতি সকল প্লাষ্টিক দ্রব্যই আসলে কাঠজাত।

এই বিভিন্ন বিচিত্র জিনিষগুলি তৈরী করতে সাধারণতঃ কাঠের আবর্জনাই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাঠের কুঁচো, কাঠের ছিলা, কাঠের গুঁড়ো প্রভৃতি কোন-কিছুই ফেলা যায় না—এগুলির সঙ্গে রজন মিশ্রিত করে তারী সুন্দর হাল্কা অথচ মজবুত জিনিষ পাওয়া যায়।

ইথিল আলকোহল, এসেটিক এসিড, ফিনোলোট, গ্লাসিটোন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যগুলি কাঠ থেকে প্রস্তুত হয়েছে। একারা কাঠের স্পিরিট বা মিথিল আলকোহল তো রয়েছেই।

মাত্র কিছুকাল পূর্বেও মিশ্র-শক্তি চিন্তান্বিত ছিলেন কেমন করে আলকোহল পাওয়া যায়। যুদ্ধের চাহিদার ফলে আলকোহল উৎপাদন করতে গিয়ে গম, যব, মকিয়ে প্রভৃতি অত্যাবশ্যক খাদ্যশস্যগুলি ক্রমেই নিঃশেষিত হয়ে আসছিল। একমাত্র আমেরিকাতেই লোহার দিকে আলকোহল তৈরী করতে গিয়ে এক কোটি একর জমির খাদ্যশস্য ব্যয়িত হয়েছিল। এই সময়ে বাংলার বিখ্যাত জনৈক জার্মান ব্যবসায়ী জার্মানী থেকে পালিয়ে এসে কতকগুলি গোপন রাসায়নিক তথ্য বিশ্লেষিত গোপনীয়তা করেন। সেই তথ্য অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের কনবিভাগের প্রধান রাসায়নিক ডাঃ ডে, আবিষ্কার করেন ১৯৩৮এর জুলাই মাসে সর্ব্বপ্রথমে ৫০০ পাউণ্ড কাঠের গুঁড়ো থেকে ১৫০ গ্যালন চিনি প্রস্তুত করেন এবং পরে সেই চিনি থেকে সাড়ে বারো গ্যালন আলকোহল তৈরী করেন। অর্থাৎ এক টন কাঠের গুঁড়ো থেকে ৫০ গ্যালন ইথিল আলকোহল তৈরী হয়ে থাকে।

বৈজ্ঞানিকরা বলেন, এরপরে পৃথিবী ক্রমশঃ বৃক্ষশূন্য ও বনশূন্য হবে। কিন্তু এতটা ভয় পাবার কিছু নেই। কারণ, দরজা-জানলার জন্যে যেমন ভাল কাঠের প্রয়োজন হয়ে থাকে এখানে তা চাই না। শক্ততা বা ভালই হল যাকে গাছ—আর এই গাছে কাঠেই আমাদের প্রয়োজন সবচেয়ে "ভালভাবে সাধিত হবে। পাইন কাঠে তো আসবাবপত্রও হয় না, কিন্তু ওতেই আমাদের কাজ হবে ভাল। দেবদারু থেকে শক্ত কাঠের গুঁড়ো যেখানে টন, সিতু ৩০।৪০ গ্যালন আলকোহল উৎপাদন করে সেখানে নরম কাঠের গুঁড়ো থেকে ৫০।৬০ গ্যালন আলকোহল পাওয়া যায়।

একারা আজকাল অভিনব উপায়ে গাছকে তাড়াতাড়ি বড় করে তোলা যায়। শরৎকালীন কৃষ্ণকুঙ্কুম (crocus) থেকে প্রস্তুত কলচিসিন (colchicine) নির্য্যাস যদি চারা গাছে প্রয়োগ করা হয় তাহলে তার পূর্ণ পরিণতি লাভ করবে যে সময় লাগত তার অর্দ্ধেক সময়ও লাগে না।

আজকাল আবার সেসকুইমিথিলোইরিয়া (cesquimethyloureo) নামে ফর্ম্যালডিহাইড ও ইউরিয়া থেকে প্রস্তুত এক প্রকার পদার্থের সাহায্যে নরম কাঠকে শক্ত কাঠে পরিণত করা হচ্ছে ঠিক যেন হাতুড়ের সোনার কাঠির স্পর্শে। একে সুপার ইউ বা অতি-কাঠ বলা চলে। কারণ, এ কাঠ সহজে অগ্নিদগ্ধ হয় না অথবা জলে ভিজেও ফোল হয়ে ওঠে না। অর্থাৎ একাধারে তাপ-সহ এবং জল-সহ দুইই। এই অতি-কাঠের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, এতে তারী চমৎকার রং ধরে আর তা চিরস্থায়ী থাকে। এই কাঠকে তরল ইউরিয়ায় ভিজিয়ে যদি উত্তপ্ত করা হয় তাহলে উত্তপ্ত লোহার মতই বেঁকিয়ে চুরিয়ে ইচ্ছামত আকার প্রদান করা যায়। ফলে বড় সুন্দর আসবাবপত্র তৈরী করা যেতে পারে। আর এই আসবাব-পত্রের একটা বিশেষ সুবিধা এই যে, চিরস্থায়ী হয়ে থাকায় তাতে যদি চা বা জল পড়ে যায় তাহলেও তার উজ্জ্বলতা ম্লান হয় না বা পুনরায় পালিশের প্রয়োজন হয় না।

ফিনল্যাণ্ডে আজকাল কাঠ থেকে প্রচুর পরিমাণে কৃত্রিম রেশম, কাঁচজাতীয় জিনিষপত্র, কণ্ঠীপ্রাকের ফিল্ম এবং এমনতর কাচ তৈরী হচ্ছে যা ভঙ্গুর নয়।

আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে আমাদের দেশেও কাঠের শিল্প যথেষ্ট উন্নতি ও প্রসার লাভ করবে।

সেই সদেশী যুগের প্রসিদ্ধ

জুয়েলার্স

মহাত্মা গান্ধীর অভিমত :—"আমি অনেকগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠানে এসেছি কিন্তু এরকম নিখুঁত কারিগরি কোথাও দেখিনি। এরই মধ্যে বিদেশ যে, দেশীয় শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হয়েছে তা আমি ইতিপূর্বে কোথাও দেখিনি।"

সিনি স্বর্ণের অলঙ্কার বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।
অর্ডার দিলে তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হয়।

উপনগর নির্মাণের পরিকল্পনা

ঈশ্বরেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

কলিকাতা সহরের জনসংখ্যা হ্রাস করার জন্য ও বাড়তি লোকদের বাসস্থান সংস্থানের জন্য উপনগর গঠনের প্রস্তাব উঠেছে। এই প্রস্তাব অতীব যুক্তিযুক্ত ও সমর্থনযোগ্য। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য ও অন্যান্য সর্বদিক ব্যবহারিক সমাজ-ব্যবস্থায় এই উপনগরগুলিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে হবে। মানবিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সব কিছু বন্দোবস্ত উহাতে থাকতে হবে।

এইরূপ স্বাবলম্বী উপনগর সহরটি কার্যকরীভাবে সহরের জনবহুলতা কমিয়ে বাসগৃহ সমস্যার সমাধান করতে পারবে। উপনগর গঠনের জন্য প্রথমতঃ সহর থেকে কিছু সংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠান সরিয়ে নিতে হবে। আইনের বলে এ ব্যবস্থা যদিও খুবই সহজ তবুও প্রতিষ্ঠানগুলির সুবিধা অসুবিধার দিকে সর্বপ্রকার নজর না দিলে তাদের ক্ষতি অনিবার্য করা হবে। অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানগুলোকে এই স্থানান্তরের জন্য এমন অর্থসাহায্যের সম্মুখীন হতে হবে যে, তার ফলে তাদের বিলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী হবে। সরকারের তত্ত্বাবধানে জমি ও অন্যান্য উপাদান নির্মাণের প্রয়োজনীয় মূল্যে পাবার ব্যবস্থা করলে অবশ্যই এই শ্রেণীর পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হওয়া সম্ভবপর।

ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্থানান্তরিত করবার পূর্বে আমাদের হাতে বড় বড় ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানিগুলোর কেরাণী সাহেবদের স্থান বা বড় বড় ব্যবসায়ীদের গুদাম-গুলো ঐরূপ উপনগরে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থায় ঐরূপ প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হবে না। উপরন্তু উহাদের ব্যবহৃত প্রাসাদোপম বাড়ীগুলিতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ কার্য্য নির্বাহ করতে পারবে এবং পরিত্যক্ত গৃহগুলি অনেক ক্ষেত্রে বাসগৃহ হিসাবেও ব্যবহৃত হতে পারবে।

ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানিগুলিকে নিকট-বর্তী পতিত জমি বন্দোবস্ত নেবার ব্যবস্থা করে দিয়ে তাদের প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঐ উপনগরে স্বাভাবিকভাবে স্থানান্তরিত করবার জন্য চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রেও উহাদের অসুবিধাগুলি অনুধাবন বিবেচনা করতে হবে। প্রথমতঃ নবগঠিত উপনগরে তাদের গৃহাদি নির্মাণের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তাহা কোথা হতে আসবে—সে বিষয়ে সরকারকে সুব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

এডভাইসরি কমিটি একটী পরিকল্পনা পেশ করেছেন। তাঁরা বীমা কোম্পানিগুলিকে গৃহাদি নির্মাণের জন্য তাদের জমা টাকার কিছুটা আগে ছেড়ে দিতে সুপারিশ করেছেন। গৃহ নির্মাণের ব্যয় বাবদ টাকা তাহলে আইনতঃ জমা টাকারই সামিল হবে, এ যুক্তিও ঠিক নয়।

ব্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে যে গৃহাদি গড়ে উঠবে সেগুলিতে সর্বপ্রথম ঐ কোম্পানির অফিসারদের তুলিয়া দেওয়া ঠিক নয়। উহাতে তাহাদের সহযোগিতায় উপনগরগুলির সংগঠন কার্য্য সহজ সাধ্য হবে। বর্তমানে জমি ও গৃহ নির্মাণের যে সব নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান আছে তাদেরও অনুরূপ সুবিধা দেওয়া যেতে পারে।

উপনগর গঠন ব্যবস্থা ঠিক কার্যকরী করতে হলে একেবারে গুরু থেকেই না ভেবে অপেক্ষাকৃত উহা এবং ক্রমোন্নতির সম্ভাবনা সহরগুলিকে উপনগরে পরিণত করাটাই ভাল হবে। উহাতে কিছুটা সুবিধা আদায় করা যেতে পারে। কাঁটাপুকুর, কাশবা, যাদবপুর, বজবজ, সরশুনা, কাঁচড়াপাড়া, বালীগঞ্জ, উল্টাডিঙ্গি, আমতা প্রভৃতি ছোট ছোট সহরগুলিকে প্রথমে কিস্তিতে উন্নত করবার ব্যবস্থা করলেই ভাল হবে। এই সব স্থানে বৈদ্যুতিক শক্তি সহজলভ্য এবং রেল ও জলী পথে উহাদের সহিত যোগাযোগ রহিয়াছে, উহাতে সব দিক দিয়েই সুবিধা হবে।

এই পরিকল্পনায় কেহ যেন মনে না করেন যে, আমরা গ্রামোন্নতির চাই না, উপনগর কলিকে সহরে পরিণত করাই আমাদের উদ্দেশ্য ও বক্তব্য। কথা হচ্ছে কি এই সহরগুলি যদি সুস্বাস্থ্যকর, সহজ ও সুন্দর হয়ে ওঠে তবে তার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠবেই।

বাসস্থান প্রতিষ্ঠানগুলির স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই মফঃস্বলবাসী জনসাধারণ দূরে যাবে। উপনগরগুলিতে যাবে কাজকারবার তাদের সুবিধার জন্য যাতায়াতের ও সংবাদ আদান প্রদানের সুব্যবস্থা করতে হবে। উপনগর পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে, যদি উহার যোগাযোগের ব্যবস্থা না করা হয়। অন্যদের উপনগর গঠনের পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তা ও যানবাহন, টেলিফোন প্রভৃতির উন্নতির জন্যও চেষ্টা হতে হবে।

বেতারের মারফৎ বাজারের দরদাম সহজে জানা সরবরাহের জন্য আমরা সরকারী বাজার, রেলওয়ে ষ্টেশন, সরকারী দপ্তরগুলি, টিয়ারগুলি নতুনভাবে পরিবেষ্টন করতে বলি। এতদ্ভিন্ন উপরে আরো কয়েকটী বড় কনডেন্সিং হতে পারে এবং সেই সব কনডুক্ট তারগুলিকে তত্ত্ব তত্ত্ব স্থানের জনসাধারণের ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হতে পারে। সহরতলী থেকে বেশ কয়েকটি যানবাহনগুলি একত্রে মফঃস্বল কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত চালান করবার ব্যবস্থা করতে হবে।

সোভিয়েটে যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক পুনর্গঠন

বিশেষ সংবাদ

মহাযুদ্ধের ফলে পৃথিবীর যে ক'টি দেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো তাদের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়ার নামই প্রথম মনে আসে। বস্তুত সোভিয়েটের যে ক্ষতি অন্যের সঙ্গে তার তুলনাই করা চলে না। কারণ নাজী দস্যুদের প্রচণ্ডতম আঘাত সহ্য করতে হয়েছিল মূলত এক সোভিয়েটকেই। আপনার দুর্বার প্রাণশক্তির জোরে সোভিয়েট যে সেই আঘাতকেই শুধু রুখতে পেরেছিল তাই নয়—অধিকন্তু সে শত্রুকে প্রতি-আক্রমণ করে তার সামরিক শক্তিকে পরাভূত করেছিল এবং যুদ্ধোত্তর যুগে নিজের পুনর্গঠনের কাজে আজ সে অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি এগিয়ে চলেছে।

অন্যান্য দেশের সঙ্গে সোভিয়েটের পুনর্গঠনের কর্মসূচি ও তার গতির পার্থক্য মৌলিক। সোভিয়েটের সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা এবং অন্যান্য (নয়াগণতন্ত্রের দেশ গুলো ছাড়া) দেশের ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বিভিন্নতাই এর মূলে দায়ী। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় শিল্পোৎপাদনের লক্ষ্য হল সামাজিক চাহিদা পূরণ; তাই তার পরিকল্পিত মানে সামাজিক সমৃদ্ধি আর ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় শিল্পোৎপাদনের উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিগত মুনাফা-আহরণ তাই তার ফলে আসে সংকট। পুনর্গঠনের কাজেও এই মৌলিক পার্থক্যই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পুনর্গঠনের কাজ যখন সোভিয়েটে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে, তার অর্থব্যবস্থা দ্রুতহারে শান্তিকালীন রূপ নিচ্ছে অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশে তখন শিল্পসম্প্রসারণ ও পুনর্গঠনের কাজ নানা অজুহাতে যথাযোগ্যভাবে এগুচ্ছে না। বহুক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মুনাফা শিকারীরা নানা অছিলায় এই কর্মসূচিকে বানচাল করে নিজেদের মুনাফাটাকে আকাশে ফাঁপিয়ে তুলছে।

সোভিয়েট অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হল তার সুপরিকল্পিত পরিপুষ্টি অর্থাৎ অর্থব্যবস্থার পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণের কাজ ব্যক্তিগত খেয়াল খুশি মাফিক চলবে না, চলবে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে। এই পরিকল্পনা তৈরীর দায়িত্ব বিশেষজ্ঞদের। আর এই জাতীয় পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থা গড়ে উঠেছে উৎপাদন উপকরণ ও উপাদানের সমাজতান্ত্রিক মালিকানায়। জাতীয় সমৃদ্ধিবিধানের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের অর্থব্যবস্থাকে পরিচালনা করা হয় রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা অনুসারে। যুদ্ধ শেষ হবার পরেই যুদ্ধোত্তর যুগের প্রথম পরিকল্পনা গৃহীত হয় দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য (১৯৪৬ সালের ১৮ই মার্চ তারিখে সোভিয়েটের সর্বোচ্চ আইন সভা (Supreme Soviet)। যুদ্ধোত্তর ষ্টালিন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে জেনারেলিসিমো যোসেফ ষ্টালিন বলেন যে, যুদ্ধের ফলে যে দেশের যে অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেখানে পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা, শিল্প ও কৃষিকে যুদ্ধপূর্ব যুগের মানে প্রতিষ্ঠা করে পরে তাকে উচ্চতর মানে উন্নীত করাই হল এই নতুন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। এই ষ্টালিন পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রাথমিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ভারীশিল্প (heavy industry) এবং রেলপথের উন্নতি বিধানের ও সম্প্রসারণের ওপর। জনসাধারণ যাতে প্রয়োজন মতো ভোগ্য সামগ্রী (Consumers' goods) যথেষ্ট পরিমাণে পায় তার জন্যও যথাযথ ব্যবস্থা রয়েছে এই পরিকল্পনায়। এই পরিকল্পনা সফল হলে (এবং সফল যে হবে তাতে কোন সন্দেহই নেই) ১৯৪০ সনের তুলনায় আগামী ১৯৫০ সনে সোভিয়েটের শিল্পোৎপাদন বাড়বে শতকরা ৪৮ ভাগ। ১৯৪৬-৫০ এই পাঁচ বছরে মোট পাঁচ হাজার নতুন সরকারী শিল্পোৎপাদন গড়ে তোলবার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সোভিয়েটের যে অঞ্চল হিটলার বাহিনী অধিকার করে নিয়েছিল সেই অঞ্চলের শিল্পোৎপাদনকে শুধু যুদ্ধ-পূর্ব মানেই ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে না, তার তুলনায় শতকরা পনের ভাগ তার বৃদ্ধি ঘটানো হবে।

কৃষি উৎপাদনেরও পরিমাণ আগামী ১৯৫০ সনে যথেষ্ট বাড়ানো হবে। এই ষ্টালিন পরিকল্পনার শেষে সোভিয়েটের কৃষির উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৪০ সনের তুলনায় শতকরা ২৭ ভাগ বাড়ানো হবে। আর দেশের জাতীয় আয় যুদ্ধপূর্ব মানের ওপর শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাবে। এই হলো সোভিয়েটের প্রথম যুদ্ধোত্তর ষ্টালিন পরিকল্পনার মূল প্রতিশ্রুতি। এই প্রতিশ্রুতি কিভাবে পালিত হচ্ছে এবারে তাই বিচার করে দেখা যাক।

দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য সোভিয়েটের এই পরিকল্পনা বিশেষ বাস্তব-ধর্মী। যে সময়ে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় সেই সময়ে দেশের অর্থ ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক জাতীয় সম্পদ ও সামর্থ্য প্রভৃতি বিবেচনা করেই এই পরিকল্পনা তৈরী করা হয়। জনসাধারণ এই পরিকল্পনাকে নিজস্ব বলে মনে করে তাই প্রাণপণে একে সফল করে তোলবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে। সমস্ত কর্তৃত্বই জনসাধারণের। পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করে যে ফলাফল পাওয়া গেছে কর্মীসাধারণ নিজেদের সভায় তার বিচার বিশ্লেষণ করে ত্রুটিবিচ্যুতি নিবারণ করেন। এতে একদিকে যেমন সাধারণ এই পরিকল্পনাকে সফল করে তোলবার জন্য ব্যক্তিগত প্রেরণা পায় অন্যদিকে আবার তেমনি নিজেদের ত্রুটিবিচ্যুতি শুধরে নেবারও সুযোগ পায়।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য দেশীয় শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের প্রয়োজন। আমাদের সাবান বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত এবং গুণে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

পাকিস্তানেও সরবরাহ করিতে পারি।

গোপাল সোপ ওয়ার্কস

১১০, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যশোহর-খুলনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

২০, নেতাজী সুভাষ রোড

—কলিকাতা—

ফোন : কলিকাতা—২০৪৪

শাখা—খুলনা

- কলিকাতা ব্যাঙ্কের নিজস্ব ভবনে হেড অফিস।
- আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ়।
- ক্লিয়ারিং-এর সর্বপ্রকার বন্দোবস্তসহ যাবতীয় ব্যাঙ্কিংকার্য্য বিশেষ সতর্কতার সহিত সুসম্পন্ন হইতেছে।

চেয়ারম্যান

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

ইনভেস্টরস্ কার্টেল লিঃ

(INVESTORS' CARTEL LTD.)

শেয়ার লেনদেনের সম্পূর্ণ গোপন প্রতিষ্ঠান

"কার্টেল হাউস"

১৯৩১, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

এজেন্সী ভারতের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে

টেলিগ্রাম—মূলধনপুষ্ট ফার্ম এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম ব্রোকার্স ফার্ম বি, এন, সিংহ এণ্ড কোম্পানী

দলবদ্ধ এজেন্সী | টেলিং সিকিউরিটিজ | বিশেষজ্ঞ ব্রোকার্স

১৯৩১, ষ্টক এক্স কোঃ | ১৯৩১, ষ্টক এক্স কোঃ | ১৯৩১, ষ্টক এক্স কোঃ

আমাদের মূল্যবান স্টক লেনদেন পরামর্শ,
প্রয়োজনীয় স্টক সুপারিশ ও টেকা লেনদেনের
সঠিক সময় নির্দেশ।

লেনদেনের ব্যবস্থা করিতে হইলে
ষ্টক ব্রোকার
নিবিড় পত্র দিন

বিক্রয়ের জন্য
ষ্টক ব্রোকার
নমুনা সংগ্রহের জন্য লিখুন

১ **মার্জিন ডিপোজিট স্কীম**

মাত্র ১৯৩১ লেনদেনের মূলধন হাতে থাকলে ১০০ টাকা জমা দিলে পুরা লেনদেনের সমস্ত সুবিধা পাওয়া যায়, শুধুমাত্র ব্রোকারেজ ও কমিশন প্রভৃতি আলাদা করিয়া দেওয়া হয়

২ **ডাবল বেনেফিট স্কীম**

মূল ও অতিরিক্ত লেনদেনের লাভের অর্ধেক দেওয়া হয়, এই ভাবে মাসিক অন্যূন ১০০ হইতে ১০০ টাকা লাভ পাওয়া যায়।

৩ **বোনাস ইউনিট স্কীম**

এই স্কীমে ১৫, ২৫, ৫০, ও ১০০ ইউনিট অনুযায়ী ১৫ বৎসরে যথা ৫,০০০০, ১০,০০০, ২০,০০০, ও ৪০০০ টাকা জমা দিলে যথাক্রমে ১০০, ২০০, ৩৯০, ও ৮০০, বিনামূল্যে বোনাসে জমা টাকা তুলিয়া দেওয়া হয়

৪ **লোন ডিপার্টমেন্ট**

মাত্র ১৯৩১ শেয়ারের বিনিময়ে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়।

৫ **শেয়ার মার্কেট**

বাজার ১৯৩১ (কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ) শেয়ার লেনদেনের যাবতীয় কাজ করা হয়।

লোকসান কোনও ক্ষেত্রেই বহন করিতে হইবে না

পত্র লিখিলে প্রশংসাপত্র সহ বিবরণাবলী পাঠান হয়।

এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত অনুসারে ১৯৪৬ সনের মধ্যে শিল্পোৎপাদনের যে পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়েছিল তার শতকরা ৯৬ ভাগই পূর্ণ হয়েছে। যুদ্ধের অব্যবহিত পরে শিল্পগুলিকে শান্তিকালোপযোগী করে ফেলে লাভের জন্যই এই নির্দিষ্ট পরিমাণ পূরণ করা সম্ভব হয় নাই। তবে ১৯৪৭ সনে নির্ধারিত পরিমাণের শতকরা ১০৩০ ভাগ পূর্ণ করা হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সনে দুই বছরে পরিকল্পনার নির্দিষ্ট অংশ শতকরা ১০০ ভাগই সফল হয়েছে।

বর্তমান ১৯৪৮ সনের গোড়ার দিকে জাতি সংঘের সামাজিক ও অর্থনীতিক ডাইরেক্টর একটি অর্থনীতিক রিপোর্ট পেশ করেন। বিভিন্ন অর্থনীতিক ক্ষেত্রের শিল্প উৎপাদন ও অর্থ ব্যবস্থার ১৯৪৭ সনের অবস্থা এই রিপোর্টে বর্ণনা করা হয়। তাঁরা ১৯৪৭ সনকে "ব্যর্থতার" (frustrated) বছর বলে অভিহিত করেছেন। অথচ সোভিয়েটে ১৯৪৭ সনে সমৃদ্ধির পথে সফলযাত্রার সুরু। তাই জাতিসংঘের এই ডাইরেক্টরের অভিযোগে সোভিয়েট প্রতিনিধি মঃ অকটীবিনিয়ান বলেন, "১৯৪৭ সন হল সোভিয়েটের জনসাধারণের নতুন অর্থনীতিক ও সামাজিক প্রগতির বছর। একথা আমি দৃঢ়তার সঙ্গেই বলে দিতে চাই।"

১৯৪১ সনের তুলনায় ১৯৪৭ সনে সোভিয়েটের শিল্পোৎপাদন ডবল হয়ে গেছে। ১৯৪৬ সনের প্রথম তিন মাসের তুলনায় ১৯৪৭ সনের ঐ সময়ে শিল্পোৎপাদন বেড়েছে শতকরা ১২ ভাগ, দ্বিতীয় তিন মাসে শতকরা ১৮ ভাগ, তৃতীয় তিন মাসে শতকরা ১৬ ভাগ এবং শেষ তিন মাসে শতকরা ৩০ ভাগ। এথেকে দেখা যাবে যে, বৃদ্ধির হারটা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ১৯৪৬ সনের তুলনায় ১৯৪৭ সনে সামগ্রিকভাবে শিল্পোৎপাদন বেড়েছে শতকরা ২১ ভাগ। আবার ১৯৪৫ সনের তুলনায় ১৯৪৬ সনে যেসামগ্রিক শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার হল শতকরা ১০ ভাগ। এই বিবরণী থেকেই তাই দেখা যায় যে, ১৯৪৭ সন সোভিয়েটের শিল্পোৎপাদনের পক্ষে 'ব্যর্থতার' বছর নয়। বরঞ্চ তার নতুন অগ্রযাত্রা সুচনার বছর। এবারে কয়েকটি শিল্পকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করে দেখা যাক। প্রথমে তুলা বস্ত্র ও অন্যান্য লঘু শিল্পকেই ধরা যাক।

তুলাবস্ত্র ও অন্যান্য লঘু শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির হার ১৯৪৭ সনের সামগ্রিক শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশী। ১৯৪৬ সনের তুলনায় ১৯৪৭ সনে এই সব শিল্পে উৎপাদন শতকরা ৩৩ ভাগ বেড়েছে। সোভিয়েটের বিভিন্ন শান্তিকালীন শিল্পেই এমনি সমৃদ্ধি ঘটেছে—কোথাও সংকটের আভাস বা ছায়া দেখা যায় নি।

এই দু বছরে মোট উনিশ শ' রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান সোভিয়েটে নতুন করে উঠে কাজ করতে সুরু করেছে। যন্ত্রপাতি প্রভৃতির উৎপাদন ও কারখানার ইমারতাদির গঠন (Capital construction) ১৯৪৬ সনের তুলনায় ১৯৪৭ সনে শতকরা ১১০ ভাগ বেড়েছে তার মধ্যে কয়লা খনি শিল্পে বেড়েছে শতকরা ৯ ভাগ, বিদ্যুৎ সরবরাহ ক্ষেত্রে শতকরা ৩ ভাগ, লঘু শিল্প ও খাদ্য শতকরা ৩০ ভাগ এবং যানবাহন ব্যবস্থায় শতকরা ৮ ভাগ।

যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলগুলো নতুন করে গড়ে তোলার কাজে সোভিয়েট সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। এর জন্য কেন্দ্রীয় বাজেট থেকে ১৯৪৬ সনে সাড়ে সতের হাজার মিলিয়ন রুবল ধার্য করা হয়েছে। ১৯৪৭ সনে হয়েছে আঠার হাজার মিলিয়ন রুবল। এছাড়া স্থানীয় কর্তৃপক্ষও প্রচুর অর্থব্যয় করেছেন এই সব পুনর্গঠনের কাজে। এই সব অঞ্চলেও শিল্পোৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫৫ সনের তুলনায় ১৯৪৬ সনে শতকরা ২৮ ভাগ এবং ১৯৪৬ সনের তুলনায় ১৯৪৭ সনে শতকরা ৩৩ ভাগ শিল্পোৎপাদন বেড়ে গেছে। এ অঞ্চলে ১৯৪৬ সনের হিসাবে ১৯৪৭ সনে ঢালা লোহার (cast iron) উৎপাদন বেড়েছে শতকরা ৩০ ভাগ, রেল পথের সাজসরঞ্জাম ও গাড়ীর (Rolling stock) শতকরা ৩৪ ভাগ, কয়লা শিল্পে শতকরা ১৯ ভাগ, সিমেন্টের শতকরা ৪৫ ভাগ, চিনি শতকরা ১২০ ভাগ, বিদ্যুৎ শক্তি শতকরা ৫৫ ভাগ ইত্যাদি।

সোভিয়েটে কৃষির উৎপাদনও যুদ্ধোত্তর যুগে বেড়েছে প্রচুর। এবং এর জন্য সমাজতান্ত্রিক যৌথ খামার, সরকারী সাহায্য প্রভৃতিই দায়ী। কৃষির কাজে রাষ্ট্র কৃষককে যন্ত্রপাতি, খাদ্য, বীজ প্রভৃতি দিয়ে প্রচুর সাহায্য করেছেন। ফলে ১৯৪৬ সনের তুলনায় ১৯৪৭ সনে কৃষি উৎপাদন বেড়েছে শতকরা ৩২ ভাগ। কোন কোন ফসলের ফলন বেড়েছে শতকরা ৪৮ ভাগ পর্যন্ত। শুধু যে খাদ্যশস্যেরই উৎপাদন বেড়েছে তাই নয়, শিল্প ফসলেরও উৎপাদন বেড়েছে অনেকখানে। দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলা শেণ, আলু প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। ১৯৪৬ সনের তুলনায় তুলার উৎপাদন বেড়েছে শতকরা ২১ ভাগ, শোন-এর (hemp fibre) শতকরা ৭৯ ভাগ, চিনি বীটের শতকরা ১১০ ভাগ, আলুর শতকরা ৩০ ভাগ ইত্যাদি। কৃষি উৎপাদনের এই বিপুল সাফল্যে ১৯৪৭ সনেই যুদ্ধপূর্ব যুগের উৎপাদন মানে পৌঁছা গেছে। ফলে ১৯৪৮ সনে এই উৎপাদন আরও বাড়াবার জন্য সাড়ে তিন মিলিয়ন হেক্টর নূতন জমি বেশী আবাদ করা হয়েছে।

যানবাহনেরও যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে এই ১৯৪৭ সনে। আগের বছরের তুলনায় এবছর রেলওয়াগনের দৈনন্দিন মাল আনা নেওয়ার কাজ শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। নদীপথ ও সমুদ্র পথেও চলাচলের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ২৩ ও ১৫ ভাগ বেড়েছে। অন্যদিকে যুদ্ধজনিত মুদ্রাস্ফীতির সংকোচন বিধানের জন্য সোভিয়েট সরকার ১৯৪৭ সনের ডিসেম্বর মাসে তাঁদের মুদ্রানীতির সংস্কার সাধন করেন। অতিরিক্ত এই সংস্কার সাধনের সময়ে জনসাধারণের স্বার্থের দিকেই মনোযোগ দেওয়া হয়। এর ফলে দর কমানো সম্ভব হয়। কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধিতে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ প্রথাও রহিত করা হয়।

জনসাধারণের জীবন যাত্রার মানের উন্নতি বিধান করবার জন্য ভোগ্যদ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয় এবং তার উৎপাদনও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। সোভিয়েটে একদিকে যেমন উৎপাদনের প্রাচুর্য অন্য দিকে তেমনি কর্মহীনতার অভাব বেকারত্বের অনুপস্থিতি। কাজ করে জীবিকা অর্জনের অধিকার প্রত্যেক সোভিয়েট নাগরিকের; তাই নাগরিকদের জন্য যথাযোগ্য কাজ জুটিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার উন্নতি বিধানের চেষ্টার দিকে সেই দায়িত্বই সার্থকতার সঙ্গে পালন করছেন সোভিয়েট রাষ্ট্র। তাই আশাকরা যায়, ১৯৫০ সনে এই যুদ্ধোত্তর ষ্টালিন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সফল তো হবেই, উপরন্তু অনেক ক্ষেত্রেই হয়ত পরিকল্পনার নির্ধারিত মানকেও ছিনিয়ে যাবে।

জাতীয় শিল্পের সংগঠন প্রচেষ্টায়
আপনাদের সহায়তা কামনা করি
প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস :
৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
(ফোন : সি, পি, ৪১৮)
কলিকাতা অফিস :
৮১, নেতাজী সুভাষ রোড (সি, পি, ১২৮০)
ও ৮২।২এ, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।
শাখাসমূহ :
চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ
ময়মনসিংহ, জলপাইগুড়ি।
স্থদের হার :
ডাইরেক্ট ।০, রেজিঃ ২৲ ফিক্সড ৩৲

রূপচর্য্যার অনবদ্য উপাদান সোমনাথের প্রসাধন সামগ্রী
শারদোৎসবের অনুষ্ঠান মধুর ও সম্পূর্ণ করিয়া তুলুক।
সোমনাথ কেমিক্যাল ওয়ার্কস
১১৩, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দুর্নীতির চরম

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বসু

মানুষের নৈতিক অধিকার একেবারে অধঃপাতের চরম সীমায় এসে ঠেকেছে। এর ভিতর বিধিকে ও অবিধিকে বলে কোনো বাধ বিচার নেই। লোভ ও লাভের নেশা সকল শ্রেণীর মানুষকে যেন পশুর স্তরে নামিয়ে দিয়েছে। জাগজ কালের অবশ্য দেশ স্বাধীন, কিন্তু সবাই দেখছি দুর্নীতির অধীন। যুদ্ধের প্রয়োজনে যেদিন বিভিন্ন পণ্যের উপর 'কনট্রোল' সৃষ্টি করা হলো, সঙ্গে সঙ্গে অমনি যেন মানুষের অন্তরের দুর্নীতিগুলো ডি-কনট্রোল হয়ে পড়লো। যুদ্ধ অবশ্য মিটে গেছে এবং অনেক পণ্যও কনট্রোলমুক্ত হয়েছে, কিন্তু মানুষের ভিতরের দুর্নীতিগুলো আর কনট্রোলে এলো না। মাতালকে কখনো কখনো মদের নেশা ছাড়তে দেখা গেছে, কিন্তু এই অভিলাষের নেশা মানুষকে এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে, নাড়া দেখলেও যেন একটা দুর্নীতির ছাট বলে মনে হয়। আজ মানুষের প্রতি মানুষের ভদ্রতা বা সহানুভূতির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু কত ব্যবসাটাও কি সেদিন থেকে উধাও হয়ে গেলো? যুদ্ধের আগে কোনো দোকানে কিছু সওদা কিনতে ঢুকলে দোকানদারের নমস্কার, আসুন স্যার, বসুন স্যার, ঐই সব খাতির যত্নের অন্ত ছিল না। বিল পেটিন হুকুমের মালপত্র যেঁটে ঘুঁটে চক্ষুলজ্জার খাতিরে অন্তত কিছু না কিনে ঘরে ফিরবার উপায় ছিল না। আর এখন, সেই দোকানের মালিক, কর্মচারী সবই ঠিক আছে, শুধু মেজাজটা বদলে গেছে। আগে খদ্দেরই সদা ভয়ে দোকানে সওদা কিনতো, এখন দোকানদারই সদা ভয়ে খদ্দেরকে মাল গ্যাছেন। সে যুদ্ধের খাতির যত্ন লৌকিক ভদ্রতা সবই যেন লোপ পেয়ে গেছে। কোনো হুকুমে খদ্দেরের সামনে এক হুকুমের জিনিষ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, দামটা জানিয়ে দিয়ে বলে দেয়, এ ছাড়া আর কোনো হুকুম নেই, উল্লেছ হয় কিনুন, না হয় আর কোথায় দেখুন।

তারপর এখনো যে সব কনট্রোলের দোকানে 'কিউ'-এ দাঁড়িয়ে জিনিষ কিনতে হয়, মাথার উপর দিয়ে রোদ, বৃষ্টি, ঝড়, ঝাপ্টা চলে যাচ্ছে, পায়ে কেঁসে যাচ্ছে, তবুও কেউ ধৈর্য্য হারায় না এইটা আশ্চর্য্য। এই কনট্রোল ও 'কিউ'-এ আর কিছু উপকার হ'ক বা না হ'ক, লোকের যে ধৈর্য্য ও সহ-সহিষ্ণুতার গুণ বাড়িয়ে দেছে, তা স্বীকার করতেই হবে। অবশ্য এর জন্য কনট্রোলের দোকানদারগুলিই যে সম্পূর্ণ দায়ী, তা বলছি না। কারণ তাঁদের উপর ত আবার 'পারমিট' দেওয়ারা আছেন। সেখানে তাঁরা ষোড়শোপচারে পূজা দিয়েও, ঘটাও লব ঘটা ঘরনা দিয়ে পারমিট আদায় করতে যে ব্যবহার পেয়ে আসছেন, সেটা তো তাঁরা একদম হজম করতে পারেন না! কারণ তখন তাঁরা অন্ধের থাকেন, তাই দোকানদারের পর্য্যায়ে নেমে খদ্দেরের উপর কিছুটা ঝালের ঝাল মেটান।

আজকের দিনে লক্ষপতি, কোটিপতি, তাঁরাও অভিলাষের আঘাত মানুষের ঘাল আটা, ময়দা, চেঁড়সলাউ লাঙ্গীনাটি পাবার ক'ড়া, চা'লে কাঁকর পাবার, সবজের ছোলে ছোড়াইট অয়েল, ডিনিসে কাঁচের গুঁড়া, মিলাল্ দিয়ে মানুষ চড়্যাছ ব্যবস্থা করে পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করছেন। আবার কালড় কাচা সোডার সঙ্গে লাল মিশি লবণ, সিমেন্টের বস্তার পরিমাণটা মিলান অনেক কিছু ব্যাপার চলছে। কনট্রোলের আগে এসব ব্যাপারিক প্রক্রিয়া অবশ্য কারো জানা ছিল না। এখন এরূপ নব নূতন আবিষ্কার দেখে দেশের বৈজ্ঞানিকগণ হেরার হবার আশঙ্কা করছেন না তো!

আমেরিকানরা যখন আমাদের দেশে চলে যায়, তখন তাঁদের জীপগাড়ীগুলি এদেশে ছড়িয়ে রেখে গেছেন। এখন তার যারা মানুষ খুন, চুরি, ডাকাতি, ব্যাঙ্কলুট প্রভৃতি কাজ বেশ আনন্দেরই চলছে। এখন আর অতীতের মতো পায়ে হেঁটে এই চুরি ডাকাতি করবার দরকার হয় না। এতে যদি পড়বার বিশেষ ভয় নাই। কাটা করে সরকারকে একেবে দাওয়া চলছে। এজন্য অনেক ভদ্র লোকের

উৎসবে উপহারে

সহরের ব্যবসায়ে যুদ্ধোত্তর যে ব্যবসায়, বিভিন্নদিক দিয়া সেকালী সহরের যে ব্যবসায়ে মধ্যে আসল জিনিষের সর্বোত্তম ও বিশ্বাসের অভাবটি, যারা সহরের বিশ্বাসযোগ্যকে সার্থক ভাবে বুঝাতে চান তাঁরা কারোনেশনী ঘড়ির ব্যবসা যে শুধু ব্যবসায়ীদের এম, বি, সরকারের সন্স।

এম, বি, সরকার এণ্ড সন্স

প্রখ্যাত ঘিনি প্রবর্তক অলঙ্কার নির্মাতা ও হীরক ব্যবসায়ী

১২৪, ১২৪/১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন-বি, বি, ১৭৬১

শাখা— বা নি গ ঞ্জ • হি ন্দু স্থা ন বা ট

১৫৯-১ বি, রাসবিহারী এভিনিউ, পি, ও, ১৩১৯ কলিকাতা-২৯

লাভি এই ব্যবসায়ে লিপ্তযুক্ত হবে পড়েছেন।

যুদ্ধ বিরতিহলের পর পশ্চিমবঙ্গের সরকার সচিব বলেছিলেন, বাজারে যে কাপড় ছাড়া হচ্ছে, তাতে পশ্চিম হচ্ছে কাপড়ের বন্যা বয়ে যাবে। দেখা যাচ্ছে, সে বন্যা কালো-বাজারের ভিতর দিয়ে পাকিস্থানের দিকে যাওয়া করেছে। অন্যান্য গাড়ীর মধ্যে কাপড়ের গাঁইই, পাকিস্থানগামী সরকারী বেকর্ডের মধ্যে মিলের কাপড়। পাকিস্থানে পাঠানোর জন্য সরকার থেকে পারমিট, লওয়া হলো, টাকের গায়ে রাষ্ট্রীয়ত্ত সরকারের ছেলের লেবেল লাগিয়ে নৌকায় বোঝাই হয়ে গেলো। এমনোন কেউ তাকে খবর পেয়ে টাক খুলে দেখলেন যে, তার মধ্যে কাপড় ও সুতো আছে। খুশানযাত্রীরা মাটে ঢাকা দিয়ে বস্তা নিয়ে যাচ্ছে, খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, তার ভিতর বস্তা ঢাকা হয়ে গেছে, শুধু মিলের কাপড় বস্তা নেছে পাকিস্থানে চলেছে। হিন্দুস্থান থেকে ফুলঘড় পাচি চ'ড়ে পাকিস্থানে যতগুলি গাড়ী চলেছে, পাচি আটক ক'রে দেখা গেল, শুধু অপ্রত্ন, ভিতরে মিলের কাপড়। হিন্দুস্থান এলাকায় রিফলগঞ্জ বোঝাইয়ের নাম করে কলকাতা থেকে হাজার হাজার টাকার মাল খরিদ করে, নৌকায় বোঝাই হলো, যথাসময়ে নৌকাও রিফলগঞ্জে পৌঁছল। পরদিন ভোরবেলা দেখা গেল, সেই মাল সমেত নৌকা নদীর অপর পারে পাকিস্থানের সীমার মধ্যে চলে গেছে। তখন আর কে তাকে আটক করবে? অবশ্য রিফলগঞ্জে হিন্দুস্থানের একটি বড় শুল্ক ঘাটি। হিন্দুস্থান সীমান্তে সরকারী তরফে একটি বড় শুল্ক ঘাটি আছে, সেখানে প্রত্যেক গাড়ীতে মালপত্র তল্লাসী করা হয়, তার জন্য চোরাকারবারীরা এক সঙ্গে ১০।২০ জন জুটে, প্রত্যেক লোকটি ১০।১৫ জোড়া মিলের কাপড় সঙ্গে নিয়ে অন্ধকার পূর্বের ট্রেনে চাঁদপুরায় নেমে পড়ে। রাত্রির মধ্যে বন-জঙ্গলের পথে এগার মাইল হেঁটে, অন্ধকারেই শুল্ক ঘাটিকে অনেক পেছিয়ে রেলস্টেশন ট্রেনে হাজির হয়। তখন আর তাদের ধরে কে? তারপর পাকিস্থানের ভিতর দিয়ে একবার পড়তে পারলে, তখন তো তাদের সাধ্য অফুরন্ত। এইভাবে মাসের খুলনা হরিণাল অঞ্চলে বহু মিলের কাপড় প্রতিদিন যায়। যদি কখনো পথের মধ্যে চৌকিদার ধরতে পারে, তাহলে মাথাপিছু একটাকা হিসাবে জলপানি দিলেই খালাস। একজনে যদি কোনো রকমে ১০ জোড়া কাপড় নিয়ে পাকিস্থানের সীমার মধ্যে হাজির হতে পারে, তবে যেমন তেমন করে বিট মুনাফা একশ' টাকা। বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতির জনৈক সদস্যের হিসাবে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ থেকে এক কোটী ২০ লক্ষ টাকার কাপড় চোরাপথে পূর্ববঙ্গে পার হয়েছে। সেখানে কাপড়ের দর কিছু বেশী বটে, তবে এখন আর কাপড়ের অভাব নেই। এই সমস্ত চোরাকারবারীদের মালপত্র মাঝে মাঝে কিছু কিছু ধরাও পড়ছে, মাল বাজেয়াপ্ত এবং শাস্তিও হচ্ছে, আবার কেউ কেউ মালের মায়া না করে সরে পড়ছে। তবুও নূতন উদ্যমে নূতন কৌশল আবিষ্কারে চোরাকারবার ঠিকই চলেছে। দেশের সর্বত্রই যে লাভ ও লোভের লীলা দেখতে পাচ্ছি, তা শুধু শাস্তি দিয়ে কি মালপত্র বাজেয়াপ্ত করে কোনো সুফল হবে না। আজ যাঁরা দায়িত্বে কর্তৃপক্ষ, তাঁদের চিত্তশুদ্ধি বেশী দরকার। কর্তৃপক্ষ যদি চিত্তশুদ্ধির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তবে যারা দেশের শত্রু, সমাজের শত্রু, তাদেরও দুর্নীতির পরিবর্তন ঘটবে। 'ভুক্তে দান' অনুষ্ঠানের সুবিধার দেশে দুর্নীতির আবহাওয়া যে কতদূর পর্যন্ত ছেয়েছে, দোষ-গুণিলতার পতন থেকে অনুমান করতে মোটেই কষ্ট হয় না।

ভারতে বৎসরে ৫ লক্ষ টনের উপর তুলা উৎপন্ন হয়। টাকার হিসাবে উহার মূল্য ৭৭ কোটি টাকারও বেশী। উৎপন্ন তুলার শতকরা ৬২ ভাগ ভারতীয় প্রদেশসমূহে ও বাকী অংশ দেশীয় রাজ্যসমূহে উৎপন্ন হয়।

Phone : CALCUTTA 3453 Cable : ADJUST, CALCUTTA.

EAST INDIES
Trading Corporation

IMPORTERS OF MILL FURNISHING STORES AND MANUFACTURERS AND EXPORTERS OF TAMARIND SEED POWDER TO THE COTTON AND JUTE INDUSTRY.

12-B, Clive Row, Calcutta.

চিঠির সাদায় সৌজন্য ফুটে ওঠে তুলির রেখায়। আলেখ্যের সৌজন্য মনের তৃপ্তি। আমাদের গাঁথা সাদা রেখ মনে। চিঠির রেখায় চলাচিত্র প্রীতি-লিপি মন ও মন উভয়কেই করে মুগ্ধ।

আমাদের আলেখ্যলিপির বৈচিত্র্য আপনাকে বিস্মিত করবে।

পি, সি, কুণ্ডু এণ্ড কোং
৫৩ হ্যারিসন রোড • কলিকাতা

১২১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে শ্রীসতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আমাদের অগণিত পৃষ্ঠপোষক, অংশীদার ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের
৺শারদিয়ার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ---

• • • •

সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তি, সুপরিচিত পরিচালকবর্গ, পরামর্শদাতাগণ
ও ম্যানেজিং এজেন্টস দ্বারা পরিচালিত———

• • • •

আপনার নির্ভরযোগ্য জাতীয় চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান

ছায়া ও কায়া লিমিটেড

মেসার্স বেঙ্গল কনষ্ট্রাকসন্ কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ
আধুনিক ধরণে ইছাপুর (২৪ পরগণা) ও ইণ্টালী
(কলিকাতা) নিজস্ব চিত্রগৃহের ইমারত নির্মাণ-
কার্য্য দ্রুতগতিতে আরম্ভ হইয়াছে

★

সমমূল্যে এখনও কিছু শেয়ার পাওয়া যায়

—রেজিষ্টার্ড ও হেড অফিস—
১৬।১৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা (১২)
ব্রাঞ্চ—বর্দ্ধমান

ম্যানেজিং এজেন্টস :
মেসার্স বিল্লো ব্রাদার্স (ইণ্ডিয়া) লিঃ

Regd. No. C2506

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

মূল্য দেড় টাকা